উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ'-গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল—'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল' / 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সামনে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যান্মাষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুবিধা। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস. পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক—উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই নতুন শিক্ষাক্রম এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে নির্বাচনভিত্তিক এই পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি. কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস. পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন—যদিও পূর্বের পরম্পরা অনুযায়ী অন্যান্য বিদ্যায়তনিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। এই নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। একথা বলা বাহুল্য যে, এ বিষয়ে উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির এই বিদ্যায়তনিক উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। মুক্তশিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Under Graduate Degree Programme

Choice Based Credit System (CBCS)

Generic Elective (History)

Course Code : GE-HI-41

Making of Contemporary India

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, 2022

First Print : August, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Under Graduate Degree Programme

Choice Based Credit System (CBCS)

নির্বাচনভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা

Generic Elective (History)

Course Code : GE-HI-41

Making of Contemporary India

: বিষয় সমিতি :

সদস্যবৃন্দ

চন্দন বসু
Professor of History
NSOU and Chairperson, BoS

বলাইচন্দ্র বাড়ুই
Professor (Former) of History
University of Kalyani

অমল দাস
Professor (Former) of History
University of Kalyani

রূপ কুমার বর্মণ
Professor of History
Jadavpur University

মনোশান্ত বিশ্বাস
Professor of History
Sidho-Kanho-Birsha University

বিশ্বজিৎ ব্রহ্মচারী
Associate Professor of History
Shyamsundar College

ঋতু মাথুর (মিত্র)
Associate Professor of History
School of Social Sciences, NSOU

: রচনা :

অশোক কুমার চক্রবর্ত্তী
Registrar (Former),
Institute of Historical Studies, Kolkata

: সম্পাদনা :

রূপ কুমার বর্মণ
Professor of History
Jadavpur University

: বিন্যাস সম্পাদনা :

চন্দন বসু
Professor of History
Netaji Subhas Open University

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কিশোর সেনগুপ্ত
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ
মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Generic Elective
(History)

Making of Contemporary India
Course Code : GE-HI-41

পর্যায় ১ : স্বাধীনতার দিকে যাত্রা এবং নতুন রাষ্ট্রের উদয়

একক ১ ❑ ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন এবং এই আইনের কার্যকারিতা 7–14

একক ২ ❑ স্বাধীনতার লক্ষ্যে আলোচনা ও গণ-আন্দোলন 15–23

একক ৩ ❑ দেশভাগ : দাঙ্গা ও পুনর্বাসন 24–33

পর্যায় ২ : প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা : গণপরিষদ

একক ৪ ❑ ভারতীয় সংবিধান : সংবিধান সভা গঠন, সংবিধানের বিভিন্ন অংশ ও বৈশিষ্ট্য 34–42

একক ৫ ❑ জাতীয় সংহতি এবং দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তি 43–48

পর্যায় ৩ : ভারতীয় গণতন্ত্রের কার্যক্রম (১৯৫০-১৯৭০ এর দশক)

একক ৬ ❑ ভাষা সমস্যা ও ভাষাগত প্রদেশ গঠন 49–54

একক ৭ ❑ গণতান্ত্রিক আন্দোলন 55–64

একক ৮ ❑ অঞ্চল এবং আঞ্চলিক সত্ত্বার গঠন 65–73

একক ৯ ❑ ভারতীয় গণতন্ত্রে জাতি 74–80

একক ১০ ❑ ভারতীয় গণতন্ত্রে ধর্ম: স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক 81–88

একক ১১ ❑ নির্বাচনী রাজনীতি এবং পরিবর্তিত দল ব্যবস্থা 89–96

একক ১২ ❑ জাতীয় সংকট : জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং এর পরিণতি 97–105

একক ১৩ ❑ ভারত এবং বিশ্ব 106–115

পর্যায় ৪ : অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি (১৯৫০-১৯৭০ এর দশক)

একক ১৪ ❑ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের কৃষিকাঠামো 116–124

একক ১৫ ❑ কৃষি-সম্পর্ক এবং কৃষক সংগ্রাম 125–133

একক ১৬ ❑ উন্নয়নের পথে ভারত : অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 134–141

একক ১৭ ❑ শিল্পায়ন এবং শ্রমিক : পুঁজি, শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন 142–151

একক ১৮ ❑ বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা 152–161

একক ১৯ ❑ নারী আন্দোলন ও সংস্কার আইন 162–168

একক ২০ ❑ পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান সম্বন্ধীয় সংকট এবং প্রান্তিক মানুষের প্রতিবাদ 169–175

পর্যায় ১ : স্বাধীনতার দিকে যাত্রা এবং নতুন রাষ্ট্রের উদয়

একক ১ ❑ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন এবং এই আইনের কার্যকারিতা

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ ভূমিকা

১.২ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন : বৈশিষ্ট্য

১.৩ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন ও ভারতীয় রাজনীতি

১.৪ প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীসভা গঠন (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ)

১.৫ কংগ্রেসি প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলির কার্যকলাপ

১.৬ উপসংহার : কংগ্রেসি সরকারগুলির মূল্যায়ন

১.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন—

- ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে ব্রিটিশ ভারতের ও রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠনের কথা বলা হয়।
- জওহরলাল নেহেরু, মহম্মদ আলী জিন্নাহ, মদনমোহন মালব্য প্রমুখ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের সমালোচনা করেন।
- ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রদেশগুলিতে নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন দলের জয়লাভের ভিত্তিতে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।
- প্রাদেশিক কংগ্রেস শাসিত সরকারগুলির সামনে জটিল সমস্যা ছিল ক্রমবর্দ্ধমান সাম্প্রদায়িক সংঘাত।

- নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি তাদের ২৭ মাসের সংক্ষিপ্ত শাসনকালে জনগণকে মোটামুটি পরিচ্ছন্ন ও জনহিতকর প্রশাসনের আস্বাদ দিয়েছিল।

১.১ ভূমিকা

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের অন্যতম শর্ত ছিল যে দশ বছর পর এই আইনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে প্রয়োজনবোধে এর সংস্কার করা। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতে সাংবিধানিক অগ্রগতির বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সাইমন কমিশন গঠিত হয়, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে সাইমন কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সাইমন কমিশনের প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ সরকার এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে লন্ডনে ১৯৩০-৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনটি গোলটেবিল বৈঠক আহুত হয়। এই বৈঠকে সাংবিধানিক অগ্রগতি নিয়ে কোনো ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণা করেন। এর পর ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকার একটি শ্বেতপত্র (White Paper) প্রকাশ করেন। যার ভিত্তিতে একটি নতুন সংস্কার কার্যকরী করার জন্য ব্রিটিশ সংসদের উভয় সভার সদস্যদের নিয়ে একটি যৌথ কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে ভারতীয়দের সঙ্গে পরামর্শ করার একটা সুযোগ দেওয়া হলেও আসলে এই আইনের খসড়া নিয়ে ব্রিটিশ সংসদে যে উত্তপ্ত বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল, তারই ফলশ্রুতি ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন।

১.২ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন : বৈশিষ্ট্য

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে ব্রিটিশ ভারতের ও রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠনের কথা বলা হয়। কেন্দ্রে দ্বৈত শাসনের প্রচলন ঘটল। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবেই ভাইসরয়ের তত্ত্বাবধানে থাকবে বলা হল। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভায় মোট সদস্যদের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ হবেন দেশীয় রাজন্যবর্গ কর্তৃক মনোনীত। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ ও অন্যান্য বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীর জন্যও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হল। তত্ত্বগতভাবে প্রদেশগুলির সমস্ত বিভাগেই দ্বৈত শাসনের পরিবর্তে এল দায়িত্বশীল সরকার। ভারতে প্রদেশের সংখ্যা দাঁড়ালো ১১টি। এগুলি হল মাদ্রাজ, বোম্বে, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, ওড়িশা ও সিন্ধু। প্রদেশগুলিকে কাগজে কলমে স্বায়ত্ত্বশাসন দেওয়া হলেও গভর্নরের হাতে বিশেষ দায়িত্ব (Special responsibility) দিয়ে যে কোনো সময় মন্ত্রীসভা বাতিল করে গভর্নর নিজের হাতে ক্ষমতা নিতে পারতেন। পরবর্তীকালে মন্ত্রীসভা গঠনের সময় এ নিয়ে কংগ্রেসের সাথে বিতর্ক বাধে এবং মন্ত্রীসভা গঠনের দেরি হয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, সংযুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসামে

আইনসভাগুলিতে দুই কক্ষের সুযোগ দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট প্রদেশগুলিতে এক কক্ষ রাখা হয়। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা (Communal Award) ও পুনা চুক্তি (Poona Pact) অনুযায়ী বিভিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন সত্ত্বেও কেন্দ্রের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা থেকে গেল। R. J. Moore তাঁর *The Crisis of Indian Unity* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—ভারতে ব্রিটিশ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদেই এই আইনটি প্রণীত হয়েছে। জওহরলাল নেহেরু, মহম্মদ আলী জিন্নাহ, মদনমোহন মালব্য প্রমুখ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন।

১.৩ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন ও ভারতীয় রাজনীতি

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি হিসাবে নেহেরু তাঁর ভাষণে এই আইনকে তীব্রভাবে সমালোচনা করে বলেন—১৯৩৫-এর আইনের আপোষহীন বিরোধিতাই আমাদের লক্ষ্য। তবে এরূপ উক্তি বা মনোভাব সত্ত্বেও তিনি প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচনে কংগ্রেসের অংশ নেওয়া উচিত বলেই মত প্রকাশ করেন। এর কারণ হিসাবে তিনি এর যা ব্যাখ্যা দেন তা হল প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে কংগ্রেস সদস্যরা দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবে এবং দেশের জন্য এক সাংবিধানিক সভার (Constituent Assembly) গঠনের দাবি জানাতে পারবেন। মুসলিম লিগ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কারণ প্রাদেশিক ব্যবস্থায় তাদের সুবিধা ছিল। কংগ্রেস এবং লিগের নির্বাচনী ইস্তাহারে বেশ কিছু বিষয় প্রায় একই ধরনের ছিল, তবে লিগ পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা ও সেই সঙ্গে উর্দূ ভাষার সংরক্ষণ দাবি করেছিল।

১.৪ প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীসভা গঠন (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ)

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়। নির্বাচনী ফল প্রকাশের পর দেখা যায় যে প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য ছিল চোখে পড়ার মতো। এগারটি প্রদেশের মধ্যে কংগ্রেস পাঁচটি, প্রদেশে (মাদ্রাজ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বোম্বাইতে ১৭৫টির মধ্যে ৮৬টি আসন লাভ করে কংগ্রেস বৃহত্তম দলে পরিণত হয়। আসামে ১০৮টি আসনের মধ্যে ৩৩টি এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৫০টির মধ্যে ১৯টি আসন পায়। মোট ১৫৮৫টি প্রাদেশিক আসনের মধ্যে ১১৬১টি আসনে লড়াই করে কংগ্রেস ৭১৬টি আসন লাভ করে। অমলেশ ত্রিপাঠী মন্তব্য করেন যে আইন অমান্য আন্দোলন বহু স্থানে তৃণমূলস্তর স্পর্শ করেছিল বলে কংগ্রেস বৃহত্তম সর্বভারতীয় দলে পরিণত হয়েছিল এবং ভোটদাতাদের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। হরিজন আন্দোলন বা গ্রামীণ পুনর্গঠন কর্মসূচিরও প্রভাব পড়েছিল।

অপরদিকে মুসলিম লিগ মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট আসনগুলিতে প্রত্যাশা অনুযায়ী সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ৪৮২টি আসনের মধ্যে মুসলিম লিগ পায় মাত্র ১০৩টি আসন। পাঞ্জাবে ও বাংলায় মুসলমান আসনগুলিতে মুসলিম লিগ বিরোধী দলগুলির সাফল্য ছিল অভাবনীয়। বাংলায় স্বতন্ত্র মুসলমান দল ৮২টি ও কৃষক প্রজা পার্টি ৩৫টি আসন লাভ করে। মুসলিম লিগ পায় ৩৯টি আসন। পাঞ্জাবে ইউনিয়ানিস্ট পার্টির দাপটে ৮৬টি মুসলমান আসনের মধ্যে লিগ পায় মাত্র ১টি আসন। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও লিগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। মুসলমান আসনগুলিতে কংগ্রেসের ফল খারাপ হলেও ৫৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কংগ্রেস ২৬টি আসনে জয়লাভ করে।

নির্বাচন ও বিভিন্ন দলের জয়লাভের পরের বিষয় ছিল প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীসভা গঠন। বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠনের প্রশ্নে কংগ্রেসে মতবিরোধ দেখা দেয়। বামপন্থী এবং সমাজতন্ত্রীরা মন্ত্রীসভা গঠনের বিপক্ষে ছিলেন কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের নেতৃত্বে কংগ্রেসের অধিকাংশই ছিলেন সরকার গঠনের পক্ষে। ৫ই জুলাই ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মন্ত্রীসভার স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত নিলে ৭ই জুলাই সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা কার্যভার গ্রহণ করে।

নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর অপর যে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তা হল পাঞ্জাব, সিন্ধু, বাংলা ও আসাম—এই চারটি প্রদেশে কংগ্রেসের ভূমিকা কী হবে? বাংলায় কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় কৃষক প্রজাদলের নেতা ফজলুল হক কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিতভাবে মন্ত্রীসভা গঠনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে হক লিগের সঙ্গে যৌথ মন্ত্রীসভা গঠনে বাধ্য হন। এতে লিগের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। জিন্নার এ সময় নীতি ছিল সারা ভারতে সমগ্র মুসলমানদের একটি মাত্র রাজনৈতিক দলভুক্ত করা। সিন্ধু প্রদেশে কোনো দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় এখানে স্যার গুলাম হুসেন হিদয়াতুল্লা কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। একইভাবে আসামে স্যার মহম্মদ সাদুল্লা কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসই ছিল মূলত প্রধান দল, ফলে এই সব প্রদেশে কংগ্রেসের পক্ষে একাই মন্ত্রীসভা গঠন করার কোনো অসুবিধা ছিল না। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট জওহরলাল নেহেরু মন্ত্রীত্ব গ্রহণে অসম্মত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটিতে দীর্ঘ বিতর্কের পর (মার্চ ১৯৩৭) মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার সর্বসম্মত এক বোঝাপড়া হয়। জুলাই মাসে কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশে—মাদ্রাজ, বোম্বাই, সংযুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা—মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে।

১.৫ কংগ্রেসি প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলির কার্যকলাপ

কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলিকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের কাঠামোর মধ্যেই কাজ করতে হয়েছিল, যেখানে গভর্ণরদের 'বিশেষ ক্ষমতা', সীমিত অর্থনৈতিক সামর্থ এবং কংগ্রেসের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র ও পুলিশের ওপর নির্ভরশীলতা স্ব-শাসনের প্রতিবন্ধক ছিল। ভারতের রাজস্ব

সম্পদের অধিকাংশই ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ন্যস্ত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য জনকল্যাণকর কর্মসূচির রূপায়ণ এই সীমিত অর্থনৈতিক ক্ষমতায় প্রাদেশিক সরকারগুলির সাধ্যের বাইরে ছিল। কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলির স্বাধীন কার্যকলাপে ছিল বাধাস্বরূপ। এছাড়া কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি যে সব জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল সেগুলি হল— রাজবন্দিদের মুক্তি, ভূমি-রাজস্ব সমস্যা, কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন এবং সাম্প্রদায়িক সংঘাত।

দমনমূলক আইন প্রত্যাহার ও রাজবন্দিদের মুক্তিদান ছিল কংগ্রেসি সরকারগুলির অন্যতম লক্ষ্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মতপার্থক্য থাকলেও বোম্বাই সরকার Special Emergency Power Act, বিহার সরকার Public Safety Act, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ Public Tranquility Act-এর মতো দমনমূলক আইনগুলি প্রত্যাহার করে। প্রায় সকল কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে রাজবন্দিরা মুক্তি পেলেও উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে বন্দিমুক্তি বিষয়ে জটিলতা দেখা দেয়। তবে শেষ পর্যন্ত ঐ দুই প্রদেশে রাজবন্দিরা মুক্তি পায়।

প্রাদেশিক কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি জনকল্যাণমূলক ও সামাজিক সংস্কারমূলক কর্মসূচি রূপায়ণে সচেষ্ট হয়। এগুলির মধ্যে ছিল গ্রামোন্নয়ন, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট তৈরি ইত্যাদি। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে বিশেষতঃ বিহার, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বোম্বাই-এ বয়স্ক শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়। বিহারের সব মিউনিসিপ্যালিটি, স্থানীয় ও জেলা বোর্ড স্ত্রী-শিক্ষা ও হরিজন শিক্ষায় অর্থবরাদ্দ করেছিল।

মাদক দ্রব্য বর্জনের লক্ষ্যে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়। বোম্বাই-এ তিন বছরের জন্য মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ-এ মাদক দ্রব্য বর্জন সফল হয়। উড়িষ্যায় আফিম ও দিশি মদের বিরুদ্ধে আইন করা হয়।

গান্ধিজির অনুপ্রেরণায় হরিজনদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটানোর প্রচেষ্টা হয়। হরিজনদের মন্দির প্রবেশের অধিকার কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক সরকারগুলি আইন পাশ করে। চাকরীর ক্ষেত্রে মাদ্রাজ সরকার Removal of Civil Disabilities Bill (1938), সরকারি সম্পত্তির ব্যবহারে হরিজনদের ওপর বাধানিষেধ লোপ করে। এই আইনের বলেই মালাবারে অস্পৃশ্যরা মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি পায়। এর ফলে সামাজিক ন্যায় সম্পন্ন হয়।

শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে মাদ্রাজে খাদি ও কুটির শিল্পের প্রসারে তিনটি আইন পাশ হয়। মধ্যপ্রদেশে শিল্প প্রশিক্ষণের জন্য দুটি পলিটেকনিক স্থাপন করা হয়। বিহারে কাগজ, রেশম, চর্মশিল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়। কৃষি, পরিবহন, শিল্প, জনসংখ্যা, বাণিজ্য ও লগ্নি, জনকল্যাণ ও শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে নেহেরুর নেতৃত্বে পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়।

প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারগুলির নিকট গুরুত্বপূর্ণ ছিল ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক অসন্তোষ ও সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। এই সময় অগণিত শ্রমিক ধর্মঘটের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাংলায় পাটকল ধর্মঘট, আমেদাবাদ ও মাদ্রাজে সূতাকল ধর্মঘট, কুলটি ও হিরাপুরে লৌহ-ইস্পাত কারখানায় ধর্মঘট, ডিগবয় তেলক্ষেত্রে ধর্মঘট, কানপুরে ও বোম্বাই শিল্পাঞ্চলে ধর্মঘট। নেহেরুর পরামর্শে কংগ্রেস শ্রমিকশ্রেণির মঙ্গলবিধানে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে। Textile Enquiry Committee গঠন করে সূতাকল শ্রমিকদের বেতন হার ও উন্নততর বাসস্থানের দাবি কিছুটা মেনে নেওয়া হয়। কংগ্রেস মন্ত্রীরা সাধারণভাবে শ্রমিকদের দাবিদাওয়া ও স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তবে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে যাতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেদিকেও তাঁদের নজর ছিল। ঘন ঘন ধর্মঘট এড়াতে তাঁরা পছন্দ করতেন বাধ্যতামূলক সালিশি ব্যবস্থা। বাংলার পাটকল শ্রমিক ও পাঞ্জাবে শ্রমিক আন্দোলনের ওপর সরকারি দমননীতির নিন্দা করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। তবে প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারগুলির এই শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতির নীতি ভারতীয় বণিক ও শিল্পপতিদের বিরক্তির ও আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে।

১৯৩০-এর দশকে সহজানন্দ, নরেন্দ্র দেব, মোহনলাল গৌতম, ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ প্রমুখ নেতার উদ্যোগে বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ ইত্যাদি প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যগুলিতে কৃষক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং সারা ভারত কিষাণ সভার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আন্দোলনগুলি সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ২৩শে মে যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটি *On the Congress Attitude Towards the Kishan Sabha* নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। নেহেরু রচিত এই প্রতিবেদনে বলা হয়—'আমরা কৃষকদের কিষাণ সভা গঠনের অধিকারকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দিই, কিন্তু কংগ্রেসের মতাদর্শ এবং নীতির পরিপন্থী কোনো কিছু কৃষকরা করলে কংগ্রেস তা মেনে নিতে পারে না।' নেহেরু স্বীকার করেছিলেন—জাতীয় ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য কংগ্রেস সমস্ত গোষ্ঠী ও শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করতে আগ্রহী। যুক্তপ্রদেশের প্রজাস্বত্ব আইন কৃষকদের নিরাপত্তা কিছুটা বৃদ্ধি করেছিল এবং খাজনার হারও কমিয়েছিল। কিন্তু এই আইনে এমন কিছু ধারা ছিল যার সাহায্যে জমিদাররা তখনও চাষিদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারতেন। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিষ্ট মন্ত্রীসভা ছিল জমিদারদের সমর্থনপুষ্ট এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের একান্ত অনুগত। প্রজাস্বত্ব রক্ষার জন্য বম্বের কংগ্রেস মন্ত্রীসভা কতকগুলি আইন পাশ করে কিন্তু এই আইনগুলি কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যথেষ্ট ছিল না। মাদ্রাজের কংগ্রেস মন্ত্রীসভা কৃষকদের স্বার্থে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়নি। কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ উত্তেজনা হ্রাস করে শ্রেণি সংঘর্ষের পথ এড়িয়ে চলা। জমিদারি প্রথার অবসান তারা চায়নি। কৃষিঋণ সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, সীমান্ত প্রদেশে মহাজনি আইন সংশোধন করা হয়। কোথাও কোথাও সুদের উর্দ্ধতম হার স্থির করা হয়। তবে মাদ্রাজ, বিহার ও উড়িষ্যায় ঋণের দায়ে দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কৃষিস্বার্থে কংগ্রেস সরকারগুলির সংস্কার কর্মসূচি ছিল কৃষকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে একান্তই হতাশাব্যঞ্জক।

প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারগুলির সামনে জটিল সমস্যা ছিল ক্রমবর্দ্ধমান সাম্প্রদায়িক সংঘাত। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুকে পূর্ণ প্রদেশ হিসাবে ঘোষণা করা, বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের রাজনৈতিক আধিপত্য ইত্যাদি লিগের দাবিগুলি ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেস উভয়েই মেনে নিয়েছিল। এসত্ত্বেও নির্বাচনে লিগের শোচনীয় ফল, যুক্তপ্রদেশে লিগের সঙ্গে মোর্চা গঠনে কংগ্রেসি অনীহা, লিগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠন হিসাবে লিগের অযৌক্তিক দাবি কংগ্রেসের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে ১৯৩৭-এর অক্টোবর থেকে ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত ৫৭টি দাঙ্গা প্রমাণ করে সাম্প্রদায়িক পরিবেশ কলুষিত হয়ে উঠেছিল।

১.৬ উপসংহার : কংগ্রেসি সরকারগুলির মূল্যায়ন

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে গভর্নরদের বিশেষ ক্ষমতা, সীমিত অর্থনৈতিক সামর্থ, শত্রুভাবাপন্ন আমলাতন্ত্র এবং পুলিশের ওপর নির্ভরশীলতা প্রকৃত স্ব-শাসনের পথে ছিল প্রতিবন্ধক। কংগ্রেসি মন্ত্রীসভাগুলি শ্রমিক, কৃষক এবং বামপন্থী কংগ্রেসিদের থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ভূস্বামী বা বণিক-শিল্পপতিরা খুশি হতে পারেনি।

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি তাদের ২৭ মাসের সংক্ষিপ্ত শাসনকালে জনগণকে মোটামুটি পরিচ্ছন্ন ও জনহিতকর প্রশাসনের আস্বাদ দিয়েছিল। কাজের পরিমাণ ও সমস্যা এত জটিল ছিল যে কংগ্রেসি সরকারের চেষ্টা বা অর্থব্যয় আশানুরূপ হয়নি। সততার অভাব ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী লেখকও সরকারগুলির নিষ্ঠা, সদিচ্ছা ও দক্ষতার প্রশংসা করেছেন। একথা ঠিক কংগ্রেসি মন্ত্রীদের সকলে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক ছিলেন না। এদের মধ্যে উপদলীয় কোন্দল ও দলাদলি ছিল। মধ্যপ্রদেশে মারাঠিভাষী ও হিন্দিভাষী মন্ত্রীদের মধ্যে বিরোধ ছিল। এইসব মন্ত্রীসভার অর্থের অভাব ছিল, কিন্তু সততার অভাব ছিল না। এদের গঠনমূলক কাজকর্ম বড়লাটের প্রশংসা অর্জন করেছিল। সরকারগুলি মোটামুটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছিল।

১.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।

২। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৩। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রদেশগুলিতে কীভাবে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল?

৪। প্রাদেশিক কংগ্রেসি মন্ত্রীসভার কার্যকলাপ বর্ণনা করুন।

৫। প্রাদেশিক কংগ্রেসি সরকারগুলির শাসনের মূল্যায়ন করুন।

১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। Sumit Sarkar—*Modern India, 1885-1947*, New Delhi, 1983.

১। Sekhar Bandopadhyay—*From Plassey to Partition : A History of Modern India*, New Delhi, 2004.

৩। অমলেশ ত্রিপাঠী—*স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ১৮৮৫-১৯৪৭*, কলকাতা, ১৩৯৭।

একক ২ ❑ স্বাধীনতার লক্ষ্যে আলোচনা ও গণ-আন্দোলন

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য
২.১ ভূমিকা
২.২ ওয়াভেল পরিকল্পনা
২.৩ ক্যাবিনেট মিশন (১৯৪৬)
২.৩.১ মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা
২.৩.২ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন : ক্ষমতা হস্তান্তর
২.৪ গণ-আন্দোলন
২.৪.১ আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দি বিচারকে কেন্দ্র করে গণ-আন্দোলন
২.৪.২ নৌ-বিদ্রোহ
২.৫ কৃষক বিদ্রোহ ও গণ-অভ্যুত্থান
২.৫.১ তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭)
২.৫.২ তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলন
২.৬ উপসংহার
২.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী
২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন—

- ভারতের স্বাধীনতালাভ খুব সহজ পথে হয়নি। ভারতের শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে বড় বাধা ছিল হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য।
- ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৮ জুলাই ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী ভারত বিভক্ত হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।
- স্বাধীনতার প্রাক্কালে কয়েকটি বৃহৎ আকারের গুরুত্বপূর্ণ গণআন্দোলন শুরু হয়েছিল।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরগুলিতে এবং তার অব্যবহিত পরে বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ভারতের অবস্থা যেভাবে পরিবর্তিত হয় তার ফলশ্রুতিতে ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে।

২.১ ভূমিকা

ভারতের স্বাধীনতালাভ খুব সহজ সরল পথে হয়নি। ইংরেজ সরকারকে কংগ্রেস এবং লিগের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয়টির নিস্পত্তি করতে হয়েছিল। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের ইতিহাস যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা যে প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আলোচনা করেন তা হল ভারতীয়রা কি স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছিল, নাকি ইতিবাচক বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের দায়িত্ব পালন হিসাবে ব্রিটিশ স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল। ভারতের শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য। ইংরেজ সরকার উপলব্ধি করে ঐক্যবদ্ধ ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা কার্যত অসম্ভব। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৮ই জুলাই ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুমোদিত হয়। এই আইন অনুযায়ী ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ভারত বিভক্ত হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে কয়েকটি বৃহৎ-আকারের গুরুত্বপূর্ণ গণআন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই গণঅভ্যুত্থান ব্রিটিশ সরকারকে আতঙ্কিত করেছিল। এইসব আন্দোলনের সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন আন্দোলনগুলি ব্রিটিশ শাসকদের সামনে নতুন সমস্যা তৈরি করেছিল।

২.২ ওয়াভেল পরিকল্পনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন মধ্যপ্রাচ্যে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার দিক থেকে ভারতবর্ষ ছিল সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে। ভারতীয় কৃষি, শিল্প ও মানবসম্পদ সমূহকে যুদ্ধ সংক্রান্ত উদ্যোগে ব্যবহার করা লন্ডনের ভাবনার বিষয় ছিল। ইউরোপে জার্মানদের দ্রুত অগ্রগতির ফলে যুদ্ধে ভারতীয়দের সহযোগিতা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে উইনস্টন চার্চিল যুদ্ধ সংক্রান্ত জোট মন্ত্রীসভার কোয়ালিশন ওয়ার ক্যাবিনেটের প্রধানমন্ত্রী হন এবং তিনি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যপ্রেমিক। অন্যদিকে যুদ্ধ সংক্রান্ত মন্ত্রীসভায় ব্রিটেনের লেবার পার্টির প্রতিনিধি ছিলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস। লেবার পার্টি অনেক দিন ধরেই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে ক্রিপস মিশন ভারতে এসে প্রতিশ্রুতি দেয় যে যুদ্ধের পর ভারতকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরগুলিতে এবং তার অব্যবহিত পরেই বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ভারতবর্ষের বাস্তবিক অবস্থা এত নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় যে প্রায় অনিবার্যভাবেই ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অনুকূল অবস্থা দেখা দেয়। ভারতবর্ষে ভারত-ছাড়ো আন্দোলন ও তার নিষ্ঠুর দমনের

পরিণামে ব্রিটিশের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্কের আরও অবনতি হয় এবং জাতীয়তাবাদী চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা উপলব্ধি করেন যে উপনিবেশ হিসাবে ভারতবর্ষকে সামলানো কঠিন হয়ে উঠেছে। আর্থিক ও সামরিক খাতে বিপুল খরচ করে তবেই ভারতবর্ষকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা যেতে পারে। সরাসরি নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা ভারতকে স্বাধীন জাতি হিসাবে গণ্য করে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ স্বার্থকে সব চেয়ে ভালভাবে সুরক্ষিত রাখা যাবে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে লন্ডনে লেবার পার্টি বিপুল ভোটে জয়ী হয় এবং তার ফলে এই জাতীয় রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের অনুকূল বাতাবরণের সৃষ্টি হয়।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের বড়লাট বা ভাইসরয় ছিলেন লর্ড ওয়াভেল (Lord Wavell)। সে সময় বাংলার দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩-৪৪) ও সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন দারুণ জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। ভারতের শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য। চার্চিল ওয়াভেলকে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে বলেন। এই অবস্থায় লর্ড ওয়াভেল ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটি পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। এটিই 'ওয়াভেল পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান করাই ছিল এই পরিকল্পনার লক্ষ্য।

পরিকল্পনার ধারাগুলি ঘোষণা করে লর্ড ওয়াভেলের আমন্ত্রণে সিমলায় একটি সর্বদলীয় বৈঠক বসে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে। উদ্দেশ্য ছিল, ব্রিটিশ সদস্য হিসাবে একমাত্র ভাইসরয় ও কমান্ডার-ইন-চিফ ছাড়া পুরোপুরি ভারতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করা। এতে বর্ণহিন্দু ও মুসলমানরা সমান প্রতিনিধিত্ব পাবে, তপশিলি জাতিরা আলাদা করে প্রতিনিধিত্ব দিতে পারবে, এবং নতুন সংবিধান নিয়ে আলোচনা করার দরজাও খোলা থাকবে। কিন্তু সমতার দাবিতে জিন্না অনড় থাকায় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জুন থেকে ১৪ই জুলাই পর্যন্ত চলা সিমলা বৈঠক ব্যর্থ হয়। মুসলিম লিগের হয়ে জিন্না দাবি করেন যে মন্ত্রীসভার সমস্ত মুসলিম সদস্যদের মনোনীত করার একচেটিয়া অধিকার লিগের থাকবে। কংগ্রেস এই দাবি মানতে অস্বীকার করে। কারণ তাতে এটিই স্বীকৃত হবে যে কংগ্রেস শুধু বর্ণহিন্দুদের দল। উভয় দলের মধ্যে সমঝোতা না হওয়ায় সিমলা বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ওয়াভেল বৈঠক বন্ধ করে দেন যেহেতু লিগকে বাদ দিয়ে যৌথ সরকার কাজ করতে পারবে না।

২.৩ ক্যাবিনেট মিশন (১৯৪৬)

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী ভারতীয় রাজনীতির বাস্তব রূপ উপলব্ধি করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। ভারতের সমস্যা সমাধানকল্পে ইংল্যান্ড থেকে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চে ক্যাবিনেট মিশন পাঠানোর প্রস্তাব নেওয়া হয়। ক্যাবিনেট মিশন বা মন্ত্রী মিশনের সদস্য ছিলেন ভারত সচিব পেথিক লরেন্স, স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ এবং এ. ভি. আলেকজান্ডার।

২.৩.১ মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা

ভারতের সাংবিধানিক সমস্যার একটি সর্বজনগ্রাহ্য সমাধানে আসার উদ্দেশ্যে মন্ত্রী মিশন তিন মাস ধরে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চালায়। মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলি ছিল—

(১) ব্রিটিশ শাসিত ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হবে।

(২) হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিকে 'ক', মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলিকে 'খ' এবং বাংলা ও আসামকে 'গ' শ্রেণিতে বিভক্ত করে এই তিন অঞ্চল থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংবিধান গঠন করা হবে। 'ক' পর্যায়ভুক্ত প্রদেশগুলি হবে মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা। 'খ' পর্যায়ভুক্ত প্রদেশগুলি হবে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু। 'গ' পর্যায়ভুক্ত প্রদেশগুলি হবে বাংলা ও আসাম।

(৩) এই তিনটি শ্রেণিভুক্ত প্রদেশ নিজ নিজ এলাকার জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করবে।

(৪) প্রত্যেকটি শ্রেণিভুক্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনা করবে।

(৫) নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে।

মন্ত্রী মিশন জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতার মধ্যে এক সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছিল। মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবি সরাসরি স্বীকার না করলেও সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তির উপর প্রদেশগুলিকে ভাগ করার পরিকল্পনা করে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম লিগের দুই-জাতি মতবাদ স্বীকার করেছিল। 'পাকিস্তান' গঠনের সহায়ক বিবেচনা করে মুসলিম লিগ মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবে সম্মত হলেও সাম্প্রদায়িক নীতি অনুসারে প্রদেশগুলিকে ভাগ করার পরিকল্পনা কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। অবশ্য কংগ্রেস স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য সংবিধান সভায় যোগ দিতে সম্মত হলেও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান করতে অসম্মত হয়। অপরদিকে মুসলিম লিগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য লর্ড ওয়াভেলকে চাপ দিতে থাকে। মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে, প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সর্বাত্মক ক্ষমতা এবং সংবিধান সভাকে সার্বভৌম ক্ষমতা দেওয়ার কথা এতে ছিল না। মন্ত্রী মিশন এর প্রত্যুত্তরে ইস্তাহার প্রকাশ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও সংবিধান সভাকে যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হবে বলা হলে মন্ত্রী মিশনের এই আশ্বাসে কংগ্রেস পরিকল্পনাটি গ্রহণ করে।

২.৩.২ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন : ক্ষমতা হস্তান্তর

মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আসফ আলী, রাজাগোপালাচারী, শরৎচন্দ্র বসু, জগজ্জীবন রাম প্রমুখ নতুন সরকারের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন। কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী

মুসলমানদের সরকারে মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করায় মুসলিম লিগ ক্ষুব্ধ হয় এবং সরকারে যোগদান করা থেকে কিছু দিন বিরত থাকে। কিন্তু কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখতে লর্ড ওয়াভেলের অনুরোধে মুসলিম লিগ শেষ পর্যন্ত সরকারে যোগদান করে। মুসলিম লিগ জওহরলালের নেতৃত্ব মানতে অসম্মত হয় এবং লিগের মন্ত্রীরা পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করতে থাকেন। কিন্তু সকল বিষয়ে মুসলিম লিগ কংগ্রেসের বিরোধীতা করায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে উঠে। এছাড়া মুসলিম লিগ সংবিধান পরিষদে যোগদান করতে অসম্মত হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়।

২.৪ গণআন্দোলন

২.৪.১ আজাদ-হিন্দ-ফৌজের বন্দি বিচারকে কেন্দ্র করে গণআন্দোলন

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের মধ্যেই ছিল মুক্তি সম্পর্কিত নানা প্রতিদ্বন্দ্বী দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যসূচির সমান্তরাল অবস্থান। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ বন্দি ক্যাপ্টেন রশিদ আলীর বিচার করে আদালত সাত বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল। এই ঘটনায় কলকাতায় ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি আবার গণ-আন্দোলন হয়, মুসলিম লিগের ছাত্র সংগঠন, ছাত্র ফেডারেশন ও শ্রমিকরা এতে যোগ দিয়েছিল। রশিদ আলী দিবস পালিত হয়। গণবিক্ষোভ উত্তাল হয়ে উঠেছিল, ব্রিটিশ বিরোধীতা ছিল সর্বত্র, ধর্মঘট শহরকে অচল করে দিয়েছিল। পূর্ব বাংলা সহ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়া এই আন্দোলনকে 'প্রায় বিপ্লব' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সরকার বিক্ষোভকারীদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালায়। কলকাতায় এই অভ্যুত্থান চলে ছিল ১৪ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এরপরই শুরু হয় নৌ-বিদ্রোহ।

২.৪.২ নৌ-বিদ্রোহ

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি বম্বেতে রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভির নাবিকরা ধর্মঘটে সামিল হন। কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতা, করাচি ও মাদ্রাজের নাবিকরা ধর্মঘটে যোগ দেন। খারাপ খাবার, বৈষম্যমূলক আচরণ, উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ অফিসারদের দুর্ব্যবহার ইত্যাদি নানা বিষয় জাহাজের নিম্নশ্রেণির মাল্লাদের (রেটিং) বিদ্রোহে ইন্ধন যুগিয়েছিল। ভালো খাবার, শেতাঙ্গ ও ভারতীয় নাবিকদের বেতনের সমতা ইত্যাদি অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার সঙ্গে স্থান করে নিয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ তথা সমস্ত রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি ; ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের মতো রাজনৈতিক দাবি। কিন্তু ভারতীয় নৌ-বিদ্রোহ সাফল্য অর্জন করেনি। কারণ সুনীতি কুমার ঘোষের মতন গবেষকরা মনে করেন, বিপ্লব ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন অপেক্ষা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে স্বরাজ ভিক্ষা করে নেওয়ার কাপুরুষোচিত লালসাই ছিল ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য। স্বরাজ, স্বায়ত্তশাসন এবং জাতীয় স্বাধীনতা যাতে বুর্জোয়া ধনীক শ্রেণির হস্তচ্যুত হয়ে দেশের শ্রমজীবী মানুষ, জনসাধারণ এবং বিপ্লবী শক্তির হাতে না এসে পড়ে তার জন্য নেতৃবৃন্দ ছিলেন সদাসতর্ক। বিদ্রোহ সফল না হলেও ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির নৌ-বিদ্রোহ ক্ষমতা হস্তান্তর কালপর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আশঙ্কার কারণ হয়েছিল।

২.৫ কৃষক বিদ্রোহ ও গণ-অভ্যুত্থান

২.৫.১ তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট মতাদর্শ বা সাম্যবাদ একটি তাৎপর্যপূর্ণ শক্তি হিসাবে উঠে এসেছিল। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গণআন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই গণঅভ্যুত্থান ব্রিটিশ সরকারকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল।

বাংলার জোতদার ও জমিদাররা ভাগচাষি বা বর্গাদারদের উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক বা তারও কম দিতেন। কিন্তু ফ্লাউড কমিশন সুপারিশ করে যে, বর্গাদাররা উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ঘরে তুলতে পারে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে বাংলার প্রাদেশিক কৃষকসভা ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করার দাবি তুললে বর্গাদাররা তাদের উৎপাদিত ফসলের তিনভাগের দুইভাগ আদায় করার জন্য জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে যে কৃষক-সংগ্রাম সংগঠিত করেছিলেন তা 'তেভাগা আন্দোলন' নামে পরিচিত। সুমিত সরকার মন্তব্য করেছেন—কোনো কোনো এলাকায় গ্রামবাসীদের মধ্যে ৬০ শতাংশই ছিলেন বর্গাদার, এবং সেইসব অঞ্চলই তেভাগা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস এর মধ্যে বাংলার উনিশটি জেলায় বিশেষভাবে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। সাংগঠনিক বিস্তার আর ব্যাপকতায় এবং সুদৃঢ় রাজনৈতিক চেতনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক ধরনের শ্রেণি সচেতন কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলনের চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল, যদিও বর্গাদার বা ভাগচাষীদের স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বকীয়তাকে অস্বীকার করা চলে না। প্রায় নিঃস্ব বর্গাদার বা ভাগচাষীরা, যারা নিজেদের প্রাপ্য ফসলের মূল্যের সবটুকু ভোগ করতে পারত না, কারণ এগারো রকমের আবওয়াব বা বাজে আদায় এবং ঋণের সুদ দিতেই তাদের প্রাপ্য বেরিয়ে যেত, তারা নিজেদের অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের স্বার্থেই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন করতে বাধ্য। কৃষকসভার নেতৃত্বও এই স্বতঃস্ফূর্ততার কথা স্বীকার করেছেন। কৃষক নেতা আবদুল্লা রসুল তাঁর *কৃষকসভার ইতিহাস*-এ স্বীকার করেছেন কৃষকসভা বহু ক্ষেত্রেই কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং অনেক সময় কৃষকরা তেভাগার দাবিতে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন শুরু করার পর কৃষকসভার নেতৃত্ব সেখানে গিয়েছিল।

সুনীল সেন তাঁর *Peasant Movements in India* গ্রন্থে বলেছেন—তেভাগা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলার মুসলিম লিগ মন্ত্রীসভা আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল, কারণ পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ বর্গাদারই ছিলেন মুসলমান। কিন্তু মন্ত্রীসভার সমর্থন প্রত্যাহারের পর এবং সরকারি নিপীড়ন শুরু করার পর অনেক মুসলমান বর্গাদারই আন্দোলন থেকে সরে আসেন। সাম্প্রদায়িক টানাপোড়েন অনেক সময় প্রাদেশিক কৃষকসভাকে শক্তিশালী করেছিল এবং কখনও বা দুর্বল করেছিল।

তেভাগার লড়াই সাময়িকভাবে পরাজিত হলেও তা যে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ হল ১৯৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দের হাসনাবাদ-সন্দেশখালি-কাকদ্বীপের এবং অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহ থেকে ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে বাংলায় বামপন্থী আন্দোলনের শক্তিশালী বিকাশ।

২.৫.২ তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলন

নিজাম-শাসিত দেশীয় রাজ্য হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা কৃষক অভ্যুত্থান নানা দিক দিয়েই তার সমকালীন আন্দোলনগুলিকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন পি. সুন্দরাইয়া। তাঁর *Telengana Peoples Armed Struggle, 1946-1951* গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—৩০০০ গ্রামের প্রায় ৩০ লক্ষ কৃষক ১৬,০০০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র ছিল ওয়ারঙ্গল, নালগোণ্ডা ও খাম্মাম জেলা। এই গ্রামগুলিতে কৃষকরা নিজামের স্বৈরতন্ত্রের স্তম্ভ ঘৃণ্য ভূস্বামীদের বিতাড়িত করে তাদের জমিগুলি দখল করে নিয়েছিল। কৃষকরা গ্রাম-রাজ গঠন করে সামন্ততন্ত্র বিরোধী লড়াই-এ সামিল হয়েছিল। ১০ লক্ষ একর জমি গণ-কমিটি ও গ্রাম-রাজের উদ্যোগে কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছিল।

নিজামের শাসনাধীন হায়দ্রাবাদ রাজ্য ছিল এক জনবিরোধী সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরশাসনের শিকার। আইনের শাসন ও নাগরিক অধিকার ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মুসলমান ভূস্বামী এবং উচ্চবর্ণের হিন্দু দেশমুখরা কৃষকদের নিকট থেকে বাধ্যতামূলক শ্রম এবং ইচ্ছামত খাজনা আদায় করতেন। কমিউনিস্টরা 'অন্ধ্র মহাসভা' নামে গণসংগঠনের মাধ্যমে তেলেঙ্গানা অঞ্চলের কৃষকদের সংগঠিত করেন। তাদের উদ্যোগে তেলেঙ্গানা আন্দোলন জমি ও ক্ষমতা দখলের লড়াইতে পরিণত হয়। এটি ছিল প্রকৃত অর্থে একটি মুক্তি সংগ্রাম।

তেলেঙ্গানা আন্দোলনের তীব্রতা যখন নিজাম সরকারকে বিব্রত করে তুলেছিল, তখন নিজাম সরকার ভারতের কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে একটি চুক্তি করে। এই চুক্তিতে আরও এক বছর হায়দ্রাবাদ নিজাম-শাসিত রাজ্য হিসাবে থাকবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী তেলেঙ্গানা কৃষক অভ্যুত্থান দমন করার জন্য ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে কমিউনিস্ট পার্টি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়।

তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান শুরু হয়েছিল ঔপনিবেশিক ভারতের রাজন্যশাসিত রাজ্য হায়দ্রাবাদে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর স্বাধীন ভারতেও এই আন্দোলন অব্যাহত ছিল। সামরিক বাহিনীর দমন নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়। কেউ কেউ মন্তব্য করেন আন্দোলন প্রত্যাহার ছিল তেলেঙ্গানার প্রতিবাদী মানুষের সঙ্গে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা। এ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে তেলেঙ্গানার কৃষক অভ্যুত্থান অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে স্বীকৃত।

২.৬ উপসংহার

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পূর্ববর্তী বছরগুলোতে—বিশেষ করে চল্লিশের দশকে—ভারতবর্ষ গণআন্দোলনের এক নতুন এবং অভূতপূর্ব পর্যায় প্রত্যক্ষ করেছিল। এই সময়কালের গণআন্দোলনের তীব্রতা মৌলিকভাবে ব্রিটিশ শাসনের ভিত নাড়িয়ে দেয়। ব্রিটিশ সরকার অনুধাবন করে যে পদ্ধতিতে এতদিন ভারত শাসন তারা করেছে, তা চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয়। শাসন ও শোষণের পুরোনো কায়দা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যে বাতিল হয়ে গেছে তা চল্লিশের দশকের গণআন্দোলনের চরিত্রগত ব্যাপকতা, গভীরতা ও তীব্রতা থেকে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে এই গণআন্দোলনগুলো চরিত্রগত ভাবে শুধু যে ব্রিটিশ বিরোধী ছিল তাই নয়, বরং এই আন্দোলনগুলো ভারতীয় শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধেও বহুলাংশে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের লক্ষ্য ছিল যথাসম্ভব আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দরকষাকষি করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা। মুসলিম লিগের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান গঠন। এর ফলে ভারতে এক সঙ্কটময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যাত্রা ১৯৪৭ এর দিকে এগিয়ে চলে। গণআন্দোলন এই অভূতপূর্ব সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে নতুন রাজনৈতিক মাত্রা যোগ করে। এর ফলে শুধু ব্রিটিশ শাসক শ্রেণি-ই নয়, একই সঙ্গে ভারতীয় শোষক শ্রেণির প্রতিভূরা, যেমন জমিদার, জোতদার, কারখানা-মালিক, পুঁজিপতি শ্রেণি, মহাজন, দালাল—সকলের মনে ভীতি সৃষ্টি করে। আজাদ হিন্দু ফৌজের বিচারকে কেন্দ্র করে ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাব তুঙ্গে ওঠে। নৌ-বিদ্রোহ প্রমাণ করে সেনাবাহিনীর ভারতীয় সদস্যদের উপর ঔপনিবেশিক সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তেভাগা ও তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলন প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে কৃষক শ্রেণির বিপ্লবী চেতনার বহমানতার পরিচয়। চল্লিশের দশকের গণআন্দোলনসমূহ স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের জটিলতা ও বহুমুখীনতার সঙ্গে অনেকাংশে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত।

২.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অনুকূল পরিবেশ কীভাবে গড়ে উঠেছিল?

২। ওয়াভেল পরিকল্পনার লক্ষ্য কি ছিল? এটি কি সফল হয়েছিল?

৩। মন্ত্রী মিশনের উদ্দেশ্য কী ছিল? কীভাবে মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা কার্যকর করার চেষ্টা হয়েছিল?

৪। টীকা লিখুন—(ক) সিমলা বৈঠক (১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ), (খ) অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন।

৫। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের কৃষক সংগ্রামগুলির মূল্যায়ন করুন।

৬। নৌ-বিদ্রোহের কারণ কী ছিল? এই বিদ্রোহের ফল কী হয়েছিল?

৭। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত কৃষক আন্দোলনগুলির পরিচয় দিন।

২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। Sumit Sarkar — *Modern India, 1885-1947*, New Delhi, 1983.

২। Sunil Sen — *Peasant Movements in India*, Calcutta, 1958.

৩। অমলেশ ত্রিপাঠী—*স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ১৮৮৫-১৯৪৭*, কলকাতা, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।

৪। সিদ্ধার্থ গুহ রায় — *আধুনিক ভারতের ইতিহাস, ১৭০৭-১৯৬৪*, কলকাতা, ২০১২।

একক ৩ ❑ দেশভাগ : দাঙ্গা ও পুনর্বাসন

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ ভূমিকা

৩.২ দেশভাগের প্রক্রিয়া : মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা

৩.৩ ভারত-বিভাজন

৩.৪ দেশভাগ : দাঙ্গা ও পুনর্বাসন

৩.৪.১ বাংলা ও পাঞ্জাবে দেশভাগের প্রতিক্রিয়া

৩.৫ পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের আগমন

৩.৫.১ উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসন

৩.৬ উপসংহার

৩.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন—

- ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতার অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র স্থাপিত হয়।
- রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশভাগের বিনিময়ে ভারত স্বাধীন হয়।
- দেশভাগ থেকে উদ্ভূত হয় শরণার্থী সমস্যা এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল। উদ্‌বাস্তুদের ত্রাণের ব্যবস্থা, নতুন করে বসবাস ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সহজ ছিল না।

৩.১ ভূমিকা

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু হয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ বিয়োগান্ত অধ্যায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের শেষ ভাইসরয় হিসাবে কার্যভার গ্রহণ

করেন। আইন-শৃঙ্খলা সহ সমসাময়িক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তিনি উপলব্ধি করেন ভারত বিভাগ অনিবার্য। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতার অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র স্থাপিত হয়।

আধুনিক ভারতের ইতিহাসে বৃহত্তম এবং বেদনাদায়ক ঘটনাটি হল দেশভাগ এবং তার থেকে উদ্ভূত শরণার্থী সমস্যা। দেশভাগের আগে থেকেই এই দেশে শুরু হয়েছিল দাঙ্গা যার জন্য ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষ তার সর্বস্ব হারিয়ে অন্য রাষ্ট্রে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। নেহেরু সরকার উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে তার সমাধানের প্রয়াস চালিয়েছিল। উদ্‌বাস্তুদের ত্রাণের ব্যবস্থা, নতুন করে বসবাস ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সহজ ছিল না।

৩.২ দেশভাগের প্রক্রিয়া : মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেট অ্যাটলি সংসদে ঘোষণা করেছিলেন যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। ভারতকে কীভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় তা নিয়ে ব্রিটিশ সরকার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। সমস্যার সমাধানের জন্য ব্রিটিশ সরকার দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রথমত, ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি সময়সীমা ধার্য করা এবং দ্বিতীয়ত, হস্তান্তরের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পাদনের জন্য একজন ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন বড়লাট নিয়োগ করা।

এক অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ সর্বশেষ ভাইসরয় হিসাবে ভারতে এসে উপস্থিত হন লর্ড মাউন্টব্যাটন। মার্চ-এপ্রিল মাস ধরে মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে উপলব্ধি করেন পাকিস্তান না মেনে নিয়ে কোনো উপায় নেই। কংগ্রেস নেতৃত্ব এ-বিষয়ে মনস্থির করায় তাঁর এক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গৃহীত হয়। গান্ধিজিও শেষ পর্যন্ত কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে নেন।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' (Indian Independence Act) পাশ করে। এই আইন অনুসারে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক ডমিনিয়ন গঠিত হয়। সিন্ধু, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব বাংলা নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। দেশীয় রাজন্য-শাসিত রাজ্যগুলিকে অর্থাৎ Princely States গুলিকে স্বাধীন থাকার অথবা ভারত বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। কাশ্মীর, জুনাগড় ও

হায়দ্রাবাদ ছাড়া প্রায় ৬০০টি দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ব্রিটিশ ডমিনিয়ন হিসাবে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন ভারতের গভর্নর জেনারেল হন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। জওহরলাল নেহেরু হন প্রধানমন্ত্রী। রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশভাগের বিনিময়ে ভারত স্বাধীন হয়।

৩.৩ ভারত বিভাজন

ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে ব্রিটিশ সরকার দ্রুততার সঙ্গে ভারত বিভাজনের দিকে অগ্রসর হয়। আয়েশা জালাল তাঁর *The Sole Spokesman : Jinnah, the Muslim League and the Demand for Pakistan* গ্রন্থে কংগ্রেসকে দেশ ভাগের জন্য দায়ী করেছেন। তাঁর অভিমত হল কংগ্রেস নেতৃত্ব ঔপনিবেশিক সরকারের কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্র নিজেদের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন এবং সর্বভারতীয় স্তরে মুসলিম লিগকে ক্ষমতা ভাগ করে দিতে রাজি ছিলেন না। ভারতীয় জাতি সংক্রান্ত ধারণা হিন্দু ধর্মের আত্মিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল। জয়া চ্যাটার্জী তাঁর *Bengal Divided : Hindu Communalism and Partition* গ্রন্থেও প্রায় একই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে পড়েছিল। এর একটি বড় কারণ ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে না ওঠা। বিরাট সংখ্যক মুসলমান লিগের সমর্থকে পরিণত হয়। জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা মুসলমান জনগণের উপর কার্যকরী প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়। ফলে জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লিগ জাতীয় রাজনীতিকে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে যায়, যার ফলে ভারত বিভাগ ছাড়া ভারতের জাতীয় রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল না বলে অনেকে মনে করেন।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকেই কংগ্রেস নেতৃত্ব ভারত বিভাজনের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। তাঁদের মনে হয়েছিল যে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য ভারত বিভাজন ও পাকিস্তান গঠন মেনে নেওয়া প্রয়োজন। এস.আর.মেহেরোত্রা তাঁর *Towards India's Freedom and Partition* গ্রন্থে বলেন যে ভারত বিভাজনে রাজি হয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব কম ক্ষতিকারক বিকল্পটি গ্রহণ করেছিলেন। তা না হলে ভারত গৃহযুদ্ধ, বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের কেন্দ্রে পরিণত হত। তাই আপাতভাবে মনে হতে পারে ভারত বিভাগ ছিল অনিবার্য একটি ঘটনা।

সুনীতি কুমার ঘোষ তাঁর *India and the Raj* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ভারত ভাগের ব্যাপারে মুৎসুদ্ধি পুঁজিপতিদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। সম্পন্ন ও সফল মুসলমান বণিক ইস্পাহানি এবং আব্দুল রহমান সিদ্দিকি ছিলেন জিন্নার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও মুসলিম লিগ নেতা। এরা বলতেন—হিন্দু মাড়োয়ারি বানিয়াদের প্রভাবাধীন ভারতে মুসলমানরা আর্থিক সমৃদ্ধি লাভে ব্যর্থ হবেন। গান্ধির ঘনিষ্ঠ পুঁজিপতি

বিড়লাও ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের কথা বলেছিলেন। প্রতিযোগিতা এড়ানোর প্রয়োজন দুই সম্প্রদায়ের পুঁজিপতিরা ভারত বিভাজন চেয়েছিলেন।

সুনীতিকুমার ঘোষের মতন ঐতিহাসিকরা মনে করেন গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীন হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে যোগদান করেনি। কংগ্রেস আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যেভাবেই হোক স্বাধীনতা চেয়েছিল। মুসলিম লিগ চেয়েছিল পাকিস্তান। এই পরিস্থিতিতে গৃহযুদ্ধ বন্ধের অজুহাতে মাউন্টব্যাটেন তাঁর ভারত বিভাজনের পরিকল্পনা পেশ করেন। হিন্দু ও মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইকে নেতৃত্ব দিয়ে জাতীয় নেতারা যদি স্বাধীনতা অর্জন করতেন, তাহলে সম্ভবত ভারত বিভাজন এড়ানো যেত।

৩.৪ দেশভাগ : দাঙ্গা ও পুনর্বাসন

দেশভাগের এক বছর আগে থেকেই এই দেশে দাঙ্গা শুরু হয়েছিল, মৃত্যু হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের। বহু মানুষ এই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল এক কোটিরও বেশি নরনারী। তারাশংকরের *বিপাশা*-য়, খুশবন্ত সিং-এর *A Train to Pakistan* উপন্যাসে মানব ইতিহাসের এই বৃহত্তম ট্র্যাজেডি-র কিছু পরিচয় আছে। এই ট্র্যাজেডি-র কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বীভৎস দাঙ্গা, এই দাঙ্গার কারণে ভীত, সন্ত্রস্ত মানুষ তাদের সর্বস্ব হারিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অন্য রাষ্ট্রে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। শরণার্থী শিবিরের জঘন্য ও বিবর্ণ পরিবেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বাধীনতার তিক্ত স্বাদ অনুভব করেন।

৩.৪.১ বাংলা ও পাঞ্জাবে দেশভাগের প্রতিক্রিয়া

ভারত বিভাজনের মারাত্মক প্রভাব পড়েছিল বাংলায় ও পাঞ্জাবে, কারণ এই দুটি প্রদেশকে বিভক্ত করা হয়েছিল। দেশ ভাগের পরই দুটি অঞ্চলেই সাম্প্রদায়িক হিংসা তীব্র রূপ নিয়েছিল। অকল্পনীয় সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন ঘর ছেড়ে চলে আসা বা ঘর ফেলে চলে যাওয়া হতভাগ্য মানুষের দল। দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসতা বাংলা ও পাঞ্জাবের মানুষের জীবন অভিশপ্ত করে তুলেছিল।

পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাজনের ক্ষেত্রে এই দুটি প্রদেশের অধিবাসীদের মতামত নেওয়া হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহযোগিতায় ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিজেদের সিদ্ধান্ত বাংলা ও পাঞ্জাবের মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। এই বিভাজনের ফলশ্রুতি হিসাবে বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয় বাংলা ও পাঞ্জাবের উদ্‌বাস্তুদের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি।

উদ্‌বাস্তুদের আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলা ও পাঞ্জাবের মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পাঞ্জাবে দেশত্যাগের বিষয়টি ছিল দ্বিপাক্ষিক ব্যাপার। পূর্ব পাঞ্জাব থেকে হিংসার শিকার হয়ে বহু মুসলমান

শরণার্থী পশ্চিম পাঞ্জাবে চলে আসে। আবার একইরকম নৃশংসতার বলি হয়ে অসংখ্য হিন্দু ও শিখ পশ্চিম পাঞ্জাব ত্যাগ করে পূর্ব পাঞ্জাবে চলে আসেন। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে বিষয়টি ছিল কিছুটা পৃথক। ওপার বাংলা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে পরিমাণ হিন্দু এদেশে এসেছিলেন, এপার বাংলা বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমান শরণার্থীর সংখ্যা ছিল অনেকটা কম। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ৫ জুন পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিশনার-এর দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়—১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ ১০ হাজার শরণার্থী পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল। এদের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ ছিলেন শহুরে মধ্যবিত্ত, প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, ১ লক্ষের কিছু বেশি কৃষিজীবী এবং ১ লক্ষের কিছু কম কারিগর। বিভিন্ন জেলা থেকে আসা শরণার্থীর সংখ্যার তারতম্য ছিল। ওপার বাংলা থেকে আসা ক্রমবর্দ্ধমান উদ্‌বাস্তুর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

দেশভাগের পর পাঞ্জাব হয়ে ওঠে এক ধ্বংসলীলার পীঠস্থান। পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর অত্যাচার নেমে আসে। পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দুরা একইরকম নৃশংসতার শিকার হন। পূর্ব পাঞ্জাব থেকে যে সমস্ত মুসলমান উদ্‌বাস্তুকে পাকিস্তানে পাঠানো হয়, তারা সেখানে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হয়। এই উদ্‌বাস্তুদের রক্ষণাবেক্ষণের কোনো ব্যবস্থা পশ্চিম পাঞ্জাব বা পাকিস্তান সরকার নেয়নি। পশ্চিম পাঞ্জাব সরকার এই সমস্ত উদ্‌বাস্তুদের মধ্যে জমি বন্টন করার প্রতিশ্রুতি দিলেও সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি।

যে সমস্ত হিন্দু ও শিখ পশ্চিম পাঞ্জাব পরিত্যাগ করে ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবে এসেছিলেন তাদের অবস্থা যে সমস্ত মুসলমানেরা ভারত থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে যান তাদের চেয়ে অনেক ভাল ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দু ও শিখরা ছিলেন জমিদার অথবা বড় ও ছোট পুঁজি বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ী। আর এদেশ থেকে যাওয়া মুসলমানেরা ছিলেন অধিকাংশই শ্রমিক, কৃষক ও কারিগর। পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দুরা ও শিখরা যে জমি পরিত্যাগ করে ভারতে এসেছিলেন, সেই জমির পরিমাণ পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানরা যে জমি পরিত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন, তার থেকে বেশি ছিল। ফলে সীমান্তের ওপার থেকে আসা হিন্দু ও শিখরা জমির ঘাটতি অনুভব করেছিলেন। জমির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে জটিল করে তুলেছিল। যে সমস্ত সম্পন্ন মুসলমানরা পূর্ব পাঞ্জাব ত্যাগ করে পাকিস্তান যেতে কিছুটা কুণ্ঠিত ছিলেন তারা কিছুটা ভীতির পরিবেশ অনুভব করে।

পেন্ডেরেল মুন জানিয়েছেন যে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রায় ৪৫ লক্ষ হিন্দু ও শিখ উদ্‌বাস্তু পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পূর্ব পাঞ্জাবে আসেন। একই সময়ে প্রায় ৬০ লক্ষ মুসলমান পূর্ব পাঞ্জাব ছেড়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। এই যাতায়াতের প্রক্রিয়া সহজ ছিল না। উভয় পক্ষের অভিভাসনকারীরাই সাম্প্রদায়িক হিংসার লক্ষ্য হয়েছিলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে পূর্ব পাঞ্জাবে উদ্‌বাস্তু পরিপূর্ণ একটি ট্রেন আক্রান্ত হয়। সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী এই জঘন্য আক্রমণের শিকার হন ২৭০০ জন মুসলমান। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সিন্ধু অঞ্চলের

উত্তরাংশ থেকে ১৮৪ জন শিখ উদ্‌বাস্তুকে নিয়ে আসা হচ্ছিল। আসার পথে তাদের করাচির একটি গুরদোয়ারা রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু মধ্যরাত্রে তাঁরা আক্রান্ত হন এবং বহু শিখ নিহত হন। দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পাঞ্জাবের ওপর কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় কিষাণ চন্দর ও সাদাত হাসান মান্টোর সাহিত্যে। পশ্চিম পাঞ্জাবের সমসাময়িক গভর্নর স্যার ফ্রান্সিস মুডির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পেন্ডেরেল মুন লিখেছেন পূর্ব পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা ছিল পশ্চিম পাঞ্জাবের দ্বিগুণ। দেশভাগ ভারতীয়দের জীবনে, বিশেষত বাংলা ও পাঞ্জাবের মানুষের জীবনে এক ভয়াবহ অভিশাপ নিয়ে এসেছিল।

৩.৫ পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের আগমন

১৯৫০-এর দশকের অন্তিমলগ্নে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল শরণার্থীদের আগমন এবং শরণার্থীজনিত সমস্যা। দেশভাগ নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছিল কিন্তু সমাধান সহজ ছিল না। যে সব ছিন্নমূল মানুষ চরম দুঃখ, দারিদ্র ও হতাশাগ্রস্ত জীবনকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার জন্য তাঁরা দায়ী ছিলেন না। পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে এরা পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন তাদের সব কিছু পেছনে ফেলে। এই সমস্ত মানুষের পশ্চিমবঙ্গে কোনো অধিকার ছিল না, থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে নিম্নস্তরের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সহায়কে সম্বল করে।

যে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী এদেশে এসেছিলেন, তাদের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির কথা স্থান পেয়েছে বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে। হিরন্ময় ব্যানার্জী *উদ্বাস্তু* গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের আগমন এবং ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক এদের পুনর্বাসনের বর্ণনা দিয়েছেন। কান্তি পাকড়াসী (Kanti Pakrasi) *The Uprooted* গ্রন্থে উদ্‌বাস্তুদের ব্যবহারিক জীবনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। অনিল সিনহা *পশ্চিম বাংলার জবরদখল উদ্‌বাস্তু উপনিবেশ*-এ পশ্চিমবাংলায় গড়ে ওঠা এই সমস্ত উপনিবেশ প্রসঙ্গে বর্ণনা দিয়েছেন। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্ত্তী *The Marginal Men* গ্রন্থে দেশভাগের পর ছিন্নমূল মানুষের দুঃখ, দারিদ্র ও হতাশাগ্রস্ত জীবনের পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের *কলকাতা-নোয়াখালি-বিহার*, অমিয় ভূষণ মজুমদারের *গড় শ্রীখণ্ড*, সতীনাথ ভাদুড়ীর *গণনায়ক*, জ্যোতির্ময়ী দেবীর *এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা*, অতীন বন্দোপাধ্যায়ের *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে*, শঙ্খ ঘোষের *সুপুরিবনের সারি* এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-এর *খোয়াবনামা*। বুদ্ধদেব বসুর *একটি জীবন* এক ভাষাপ্রেমির সংগ্রাম ও সাধনার কাহিনী।

পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হিসাবে এই migration বা অভিপ্রয়ানের সূচনা। দেশভাগের অব্যবহিত পরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে হিন্দুদের আগমনের কারণ সাম্প্রদায়িক

সংঘর্ষ নয় বরং এর বিশেষ কারণ ছিল মানসিক পীড়ন যা সংখ্যালঘু হিন্দুদের ভোগ করতে হয়েছিল। হিরন্ময় ব্যানার্জী তাঁর *উদ্বাস্তু* গ্রন্থে এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এই সময় নারী নির্যাতনের ঘটনাও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্বাধীনোত্তরকালে গোড়ার দিকে যারা এসেছিলেন, তাদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে হিন্দু মেয়েদের অত্যাচারিত হতে হয়েছে বা হিন্দুদের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সংখ্যালঘুদের কল্যাণ, তাদের সুরক্ষার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেও এই প্রতিশ্রুতি ছিল ভিত্তিহীন। এই অবস্থায় সরকারের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস হারিয়ে, সম্পূর্ণ অসহায়তাকে সম্বল করে অজানা ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছিল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, যাদের বেশির ভাগ ছিল হিন্দু। গোড়ার দিকে যারা এদেশে এসেছিলেন, তাদের বেশির ভাগই ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপন্ন হওয়ায় এরা চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। একটি বৃহৎ সংখ্যক শরণার্থী ছিলেন দোকানদার, শিক্ষক—এরা অমৃতবাজার পত্রিকার এক প্রতিবেদককে জানিয়েছিলেন হিন্দুদের দোকানগুলিতে জিনিসপত্র ক্রয় বন্ধ হয়েছিল, হিন্দু শিক্ষকগণ ছাত্রদের দ্বারা অপমানিত হয়েছিলেন। তাই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনার চেয়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া, সামাজিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হওয়ার আতঙ্ক গোড়ার দিকে শরণার্থীদের আগমনের প্রাথমিক কারণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরিস্থিতি এতটাই প্রতিকূল ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের পক্ষে সসম্মানে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তাদের ধর্মীয় জীবন বিপন্ন হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে সরকার মৌখিক ছাড়া তেমন কোনো সদর্থক ভূমিকা নেয়নি। সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক জীবন উৎপীড়িত হওয়া ছাড়া ক্রমশ তাদের জীবনে সন্ত্রাস নেমে আসে। তাদের চোখের সামনে বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করা, জিনিসপত্র লুণ্ঠন করা অসহনীয় হয়ে ওঠে এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজনে জন্মভূমি ত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

৩.৫১ উদ্‌বাস্তু পুনর্বাসন

দেশভাগের অব্যবহিত পরে শরণার্থীদের ক্রমাগত আগমনের সমস্যা সমাধানে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার কোনো উদ্যোগ নেয়নি এই আশা নিয়ে যে এই সমস্যা তাৎক্ষণিক; পরিবর্তন হলে এরা আবার নিজেদের জায়গায় ফিরে যাবে। জওহরলাল নেহেরুকে লেখা একটি প্রতিবেদনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ পি. সি. ঘোষ জানান, "The refugees would go back to their homes as soon as the situation calmed down to a bit". কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন না হওয়ায় এবং শরণার্থীদের আগমন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়। দুর্দশাগ্রস্ত শরণার্থীদের জন্য সরকারি ত্রাণ শিবির খোলা হয়। নেহেরু শরণার্থীদের আগমনের কারণ, তাদের সমস্যা বিষয়ে অবগত ছিলেন। শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য ৮ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে রাজ্য সরকারকে দিতে সম্মত হয়েছিলেন। তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল, Inter-Dominion Conference-এর মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবেন। সম্মেলন আহুত হয়েছিল, সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানের বিষয়ে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভারত-পাকিস্তান চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

ভারত-পাকিস্তান চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর সাময়িকভাবে শরণার্থীদের আগমনে ভাটা পড়লেও আবার তা বৃদ্ধি পায়। সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে তাদের পক্ষে স্থায়ীভাবে বসবাস করা অসম্ভব হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে শরণার্থীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের শাসনব্যবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সরকারের পক্ষে এত পরিমাণ লোকের সুবন্দোবস্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। সরকার সিদ্ধান্ত নেয় সেই সব শরণার্থীদের শিবিরে আশ্রয় দেওয়া হবে যারা প্রকৃতপক্ষে সরকারের ওপর নির্ভরশীল।

সরকারি শিবিরগুলিতে একটি বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিল। বেশ কিছু শরণার্থী পরিত্যক্ত কোনো বাড়ীতে বা সামরিক ছাউনিতে আশ্রয় নিয়ে পতিত জমি অবৈধভাবে অধিকার করেছিল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বৃহৎসংখ্যক শরণার্থী শিয়ালদহ স্টেশনে অসহনীয় কষ্ট ভোগ করার পর যোধপুর সামরিক ছাউনি, মহীশুর হাউস, শাহাপুর, দুর্গাপুর, বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, ধর্মতলায় অবৈধভাবে আশ্রয় নেয়। জোরপূর্বক বা বেআইনীভাবে জমি অধিগ্রহণ করে কলোনি গড়ে তুলেছিল। সরকার যাতে উচ্ছেদ করতে না পারে, সেজন্য তারা সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের সংগঠন The United Central Refugee Council গড়ে তোলে।

শরণার্থীরা এক অর্থে বিদেশি ছিল না। বাংলাভাষী এবং একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, একই সংস্কৃতির ধারক বাহক হওয়ায় স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। এ সত্ত্বেও শরণার্থীরা খুব সহজে গ্রহণীয় হয়নি। যে পরিবার, যে সমাজের মধ্যে, যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে তাদের বসবাস ছিল, জীবিকা অর্জনের যে উপায় ছিল, তা হারিয়ে নতুন পরিবেশে মানসিক, অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে থাকতে হয়েছিল। শরণার্থীরা শুধুমাত্র ভৌগোলিক দিক থেকে নয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকার, রুচি, আচার ব্যবহার, সামাজিক, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। শরণার্থীদের দুর্দশার প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বামপন্থী আন্দোলন জনসমর্থন লাভ করেছিল।

৩.৬ উপসংহার

ভারতীয় ইতিহাসের যাত্রাপথ অত্যন্ত গভীর ও জটিল। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের বসান ঘটে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সর্বাপেক্ষা বিয়োগান্ত দিক হল এই যে ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করে দেশভাগের মধ্য দিয়ে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে নিরন্তর দুটো ফ্রন্টে লড়াই করতে হয়েছে : সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ। মনে রাখা দরকার ঔপনিবেশিক ভারতে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাবাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে সাম্প্রদায়িক শক্তির

উত্থানের পিছনে কাজ করেছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদত। দেশভাগ এই রাজনৈতিক সমীকরণের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়া। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি এই দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার ফল। দেশভাগের ইতিহাস দাঙ্গার ইতিহাসের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। হিন্দু ও মুসলমান—উভয় গোষ্ঠীর একাংশ দাঙ্গা নামক দুঃখজনক ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যেই অধিকাংশ মানুষ ছিলেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্বার্থান্বেষী অংশ, সমাজবিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন মানুষ দাঙ্গায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অংশ নেয়। এরফলে ভারতের স্বাধীনতা আসে রক্তস্নাত পথে। দেশভাগের ফলে তৈরি হয় একটি নতুন শব্দ : উদ্‌বাস্তু। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু মানুষকে তাঁদের শিকড়-স্বদেশ-স্বজন ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে চলে যেতে হয় বা বলা ভালো যে তাঁরা যেতে বাধ্য হন। যে সংখ্যায় মানুষ পাকিস্তান থেকে ভারতে এসেছিল, তত সংখ্যক মানুষ কিন্তু ভারত থেকে পাকিস্তানে যায়নি। অধিকাংশ মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে ভারত ছিল একান্ত আশ্রয়স্থল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্‌বাস্তু জনগণকে অবর্ণনীয় কষ্টে পড়তে হয়েছিল। উত্তর-ঔপনিবেশিক সরকার বহুক্ষেত্রে এই বাস্তুহারা অসহায় মানুষগুলোর প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়। ভারতীয় সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির উপর এই ঘটনা পরম্পরার গভীর ছায়াপাত দেখতে পাওয়া যায়।

৩.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। আপনি কি মনে করেন ভারত বিভাগ অনিবার্য ছিল?

৩। বাংলা ও পাঞ্জাবে দেশভাগের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন।

৪। পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের আগমন এবং তাদের পুনর্বাসন বিশ্লেষণ করুন। শরণার্থীদের পুনর্বাসনে সরকারের ভূমিকা কী ছিল?

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। Mushirul Hasan — *India's Partition : Process, Strategy and Mobilization*, Delhi, 1993.

২। Suranjan Das — *Communal Riots in Bengal, 1905-1947*, New Delhi, 1993.

৩। Bass P. A. — *The Politics of India since Independence*, New Delhi, 1992.

৪। S. K. Ghosh — *India and the Raj, 1919-1947*, Vol. 2, Bombay, 1995.

৫। Ayesha Jalal — *The Sole Spokesman : Jinnah, the Muslim League and the Demand for Pakistan,* Cambridge, 1985.

৬। সিদ্ধার্থ গুহ রায় — *আধুনিক ভারতের ইতিহাস,* ১৭০৭-১৯৬৪, কলকাতা, ২০১২।

৭। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় — *আধুনিক ভারত, ব্রিটিশরাজ থেকে পূর্ণ স্বরাজ,* ১৮১৮-১৯৬৪, কলকাতা-২০০৯।

পর্যায় ২ : প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা : গণপরিষদ

একক ৪ ❑ ভারতীয় সংবিধান : সংবিধান সভা গঠন, সংবিধানের বিভিন্ন অংশ ও বৈশিষ্ট্য

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য
৪.১ ভূমিকা
৪.২ সংবিধান সভা গঠন
৪.৩ খসড়া কমিটি
৪.৪ সংবিধানের বিভিন্ন অংশ
৪.৪.১ মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতি
৪.৪.২ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো
৪.৪.৩ রাষ্ট্রপতি
৪.৪.৪ সংসদ (পার্লামেন্ট)
৪.৪.৫ বিধানসভা
৪.৪.৬ সুপ্রিম কোর্ট
৪.৪.৭ স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন
৪.৪.৮ সরকারি আমলাতন্ত্র
৪.৫ ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য
৪.৬ উপসংহার : সংবিধানের মূল্যায়ন
৪.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী
৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন—

- ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ২৬ জানুয়ারি ভারত একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় ও ভারতীয় সংবিধান ঘোষিত হয়।
- সংবিধান অনুসারে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারগুলির সহাবস্থান স্বীকৃত হয়।

- সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- ভারতীয় সংবিধান পৃথিবীর বৃহত্তম লিখিত সংবিধান, মূল সংবিধানে ৩৯৫টি ধারা ও ৮টি তপশিলি ধারা ছিল।
- সংবিধানের ১২ থেকে ৩৫নং ধারায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি স্থান পেয়েছে।
- সংবিধান সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত না হলেও সংবিধানে যেহেতু নমনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়েছে সেহেতু সংশোধনের মাধ্যমে ত্রুটি দূর করা সম্ভব।

৪.১ ভূমিকা

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ২৬ জানুয়ারি ভারত একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় ও ভারতীয় সংবিধান ঘোষিত হয়। সংবিধান রচনার ভার দেওয়া হয়েছিল সংবিধান সভাকে, যা ছিল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন অনুযায়ী গঠিত প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত। তবে সংবিধান সভায় কংগ্রেসের প্রাধান্য থাকলেও সংবিধান রচনার খসড়া কমিটিতে অকংগ্রেসি ড: আম্বেদকরকে প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হয়। ড: আম্বেদকর ছিলেন সংবিধান রচনা পরিষদের সভাপতি। সংবিধানের প্রস্তাবনায় নতুন ভারতরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের কথা বলা হয়েছে, সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকার উল্লেখিত হয়েছে, নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে বাধ্যবাধকতা না থাকলেও আদর্শের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার কার্যকলাপ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের গঠন, সুপ্রিম কোর্ট, সরকারি আমলাতন্ত্র সহ পুলিশ ও সামরিক বাহিনী ইত্যাদি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। জনগণের মৌলিক অধিকার ভারতীয় সংবিধানে স্থান পেয়েছে। সংবিধানের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও সংসদীয় গণতন্ত্র ভারতে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে।

৪.২ সংবিধান সভা গঠন

স্বাধীনতার পূর্বে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য সাংবিধানিক সভার মাধ্যমে একটি সংবিধান দাবি করেছিলেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ২৪ মার্চ মন্ত্রী মিশন এই উদ্দেশ্যে ভারতে আসে। প্রথমে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদাতাদের নির্বাচনের ভিত্তিতে সংবিধান সভা গঠনের পরিকল্পনা করা হলেও বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে মন্ত্রীমিশন তা পরিত্যাগ করে। স্থির হয়, প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচিত সদস্যগণ সংবিধান সভার প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। যে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংবিধান সভার সদস্যরা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাতে ৯০ শতাংশ বিত্তহীন সাধারণ মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। সীমিত সংখ্যক নির্বাচক পরোক্ষভাবে সংবিধান সভার সদস্যদের নির্বাচিত করেছিল। সংবিধান সভার কিছু সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। সংবিধান সভার সদস্যসংখ্যা ছিল ৩৮৯। এদের মধ্যে ২৯৬ জন ব্রিটিশ ভারত থেকে এবং ৯৩

জন দেশীয় রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলি থেকে আসেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর সংবিধান সভা সংবিধান রচনার কাজ শুরু করে। মুসলিম লিগ সংবিধান সভার আলোচনায় অংশ নিতে অস্বীকার করেছিল, ফলে সভায় প্রথম থেকে কোনো বিরোধী পক্ষ ছিল না। ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংবিধান সভার স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন এবং এই সভা স্বাধীন ও সার্বভৌম বলে ঘোষিত হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর জওহরলাল নেহেরু সংবিধান সভার উদ্দেশ্য সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব ঘোষণা করে বলেন ভারত একটি স্বাধীন, সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে এবং জনগণ হবেন সেই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। ভারতের প্রতিটি মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সুবিচার পাওয়ার অধিকার থাকবে। আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান হবে এবং মানুষের নিজ ধর্মাচরণের ও স্বাধীন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে। মুসলিম লিগ সংবিধান সভায় যোগ না দেওয়ায় সংবিধান সভার ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ থেকে ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত অধিবেশনে নেহেরুর প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত স্বাধীন হবার পর সংবিধান সভা একই সঙ্গে ভারতের সংবিধান রচনা ও আইন প্রণয়নের অধিকার লাভ করে।

সংবিধান সভার অধিকাংশ সদস্য ছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামী। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সংবিধান সভায় ছিলেন। এদের মধ্যে জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ড: আম্বেদকার, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ-র নাম উল্লেখযোগ্য। তবে সংবিধান সভার সদস্যরা সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচিত না হওয়ায় এই সভা পরবর্তীকালে কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে। ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিরা ছিলেন প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত, আবার দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিরা ছিলেন মনোনীত। গণভোটের দ্বারা সংবিধান সম্পর্কে জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয়নি।

এ সত্ত্বেও বলা যায় যে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংবিধান গঠন করতে গেলে সংবিধান প্রণয়নে অনেক সময় লাগত, তাছাড়া গণভোটের দ্বারা সংবিধান সম্পর্কে জনমত যাচাই করা বাস্তবসম্মত হত না। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত আইনসভা এই সংবিধান অনুমোদন করেছিল। সুতরাং সংবিধানে জনমত প্রতিফলিত হয়নি এমন কথা বলা যায় না।

৪.৩ খসড়া কমিটি

সংবিধান সভা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট সংবিধানের খসড়া রচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। ড. বি. আর. আম্বেদকারের সভাপতিত্বে এই কমিটি সংবিধানের খসড়া রচনা করার কাজ শুরু করে। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন এম. গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, কে. এম. মুনশী, এন. মাধবরাও, ডি. পি. খৈতান, বি. এল. মিশ্র প্রমুখ। বিভিন্ন প্রশ্নে সংবিধান সভার সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা, কাশ্মীরের বিশেষ অবস্থান, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও তাঁর ক্ষমতা, জাতীয় ভাষা, পার্বত্য ও আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষা ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। সংবিধান সভার মোট ১১টি

অধিবেশনে ১৬৫ দিন বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। নেহেরু, মৌলানা আজাদ, সর্দার প্যাটেল প্রভৃতি রাষ্ট্রনেতারা এতে অংশ নেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর খসড়া কমিটি যে সংবিধান পেশ করেছিল, বহু আলোচনা, সংশোধন ও সংযোজনের পর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি তা আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এই সংবিধান অনুসারে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারগুলির সহাবস্থান স্বীকৃত হয়।

৪.৪ সংবিধানের বিভিন্ন অংশ

৪.৪.১ মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতি

সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এর প্রস্তাবনা। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে ভারত হল একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনী অনুসারে 'সমাজতান্ত্রিক' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ দুটি সংবিধানের প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রস্তাবনায় সংবিধান রচয়িতাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক মতাদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। প্রস্তাবনার মধ্যে একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রগঠন এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার এতে ঘোষিত হয়েছে এবং সবরকম বৈষম্যের অবসান ও জাতি-ধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেকের সমান অধিকারের কথাও বলা হয়েছে। প্রস্তাবনায় জাতীয় ঐক্যকে গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

সংবিধানের তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে রয়েছে মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি। সংবিধানের ১২ থেকে ৩৫নং ধারায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি স্থান পেয়েছে। আইনের চোখে সকল নাগরিকের সমান অধিকার, ধর্মীয়, জাতপাতভিত্তিক, জাতিগত বৈষম্যের হাত থেকে সুরক্ষিত হওয়ার অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা সুরক্ষিত হওয়ার অধিকার, স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার, সভাসমিতি গঠনের অধিকার, শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকার, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার অধিকার ইত্যাদি ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। এই অধিকারগুলির কোনোটি লঙ্ঘিত হলে নাগরিক আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন।

সংবিধানের ৩৬ থেকে ৫১ নং ধারায় নির্দেশমূলক নীতিগুলির তালিকা রাখা হয়েছে। দেশ শাসনের জন্য এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্দেশগুলি সরকারকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। তবে সরকার নির্দেশমূলক নীতি না মানলে নাগরিক আদালতের নিকট সুবিচার চাইতে পারেন না। উল্লেখযোগ্য নীতিগুলির মধ্যে রয়েছে শিক্ষা ও কর্মের অধিকার, মাদক বর্জন, সামাজিক অবিচার ও শোষণের হাত থেকে মুক্তি, বেকার, বৃদ্ধ ও অসুস্থদের জন্য সরকারি সহায়তা, নারী ও পুরুষের একই ধরনের কাজের জন্য সমহারে বেতন ইত্যাদি। গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, আদিবাসী তপশিলি ও

অনগ্রসরদের কল্যাণ বিধান, অরণ্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণরোধ ইত্যাদির উপরেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক না হলেও কোনো সরকারের পক্ষে এইসব নৈতিক অনুশাসনের উপেক্ষা সম্ভব নয় কারণ জনপ্রিয়তা হ্রাস পেলে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর সম্ভাবনা থাকে।

৪.৪.২ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো

ভারতীয় সংবিধানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বলতে রাজ্যসমূহের সংযুক্তকরণ বা Union of States কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র বা Federation of States কথাটি ব্যবহৃত হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় একটি দ্বৈত সত্তা থাকে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকারী রাজ্যসরকার। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এককেন্দ্রিক প্রবণতা স্পষ্ট। সংবিধানের ৩৫৫ ও ৩৬৫ ধারা প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে, এমনকি গণতান্ত্রিক উপায়ে রাজ্য সরকার ভেঙেও দিতে পারে। যুগ্ম তালিকাভুক্ত কোনো বিষয়ে রাজ্য সরকারের আইন কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধী হলে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ থাকে। ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্র (Federation of States) -এর পরিবর্তে রাজ্যের সংযুক্তিকরণ (Union of States) কথাটি কেন ব্যবহার করেছে, তার উত্তর দিতে গিয়ে আম্বেদকার বলেছেন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোনো রাজ্যের বেরিয়ে যাওয়ার অধিকার নেই।

৪.৪.৩ রাষ্ট্রপতি

ভারতীয় সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শাসনের সর্বোচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তি হলেন রাষ্ট্রপতি। সংসদ ও রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ কর্তৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে কাজ করেন। শাসন, আইন, কূটনৈতিক, সামরিক, বিচার ও জরুরি ঘোষণা সংক্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী হলেন রাষ্ট্রপতি। প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল, সুপ্রিম ও হাইকোর্টের বিচারক ও অন্যান্য উচ্চপদস্থদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। লোকসভার অধিবেশন ডাকা, মুলতুবি রাখা, বা ভেঙে দেওয়া রাষ্ট্রপতির অধিকারভুক্ত। ভারতীয় সংবিধানে উপরাষ্ট্রপতির পদ আছে। সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যরা তাঁকে নির্বাচিত করেন। তিনিও পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করেন।

৪.৪.৪ সংসদ (পার্লামেন্ট)

কেন্দ্রে ও রাজ্যে সংসদীয় রীতি অনুসারে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। সংসদ বা কেন্দ্রীয় আইনসভা লোকসভা ও রাজ্যসভা এই দুই কক্ষে বিভক্ত। পাঁচ বছরের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক জনগণের ভোটে লোকসভার সদস্যরা নির্বাচিত হন ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোট-সরকার গঠন করে। দেশ শাসনের মূল দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর। তিনি অন্য মন্ত্রীদের নির্বাচন করেন, সকলকেই নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি। মন্ত্রীসভা সংসদের

কাছে দায়বদ্ধ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন হারালে বা লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

রাজ্যসভা বা সংসদের উচ্চকক্ষ গঠিত হয় ২৫০ জন সদস্য নিয়ে। এর মধ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে অভিজ্ঞ ১২ জন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী মনোনীত করেন। অবশিষ্ট সদস্যরা প্রাদেশিক বিধানসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। রাজ্যসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন উপরাষ্ট্রপতি। আইন প্রণয়নের জন্য সংসদের যে কোনো কক্ষে খসড়া প্রস্তাব আনা যেতে পারে। উভয় কক্ষে আলোচনার পর তা গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি সাপেক্ষে তা আইনের মর্যাদা লাভ করে।

৪.৪.৫ বিধানসভা

সংসদ বা কেন্দ্রীয় আইনসভা আইন প্রণয়ন, শাসন, অর্থ ও দেশ বিদেশের সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে, প্রাদেশিক স্তরে বিধানসভা আইন প্রণয়ন, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতির মতো প্রাদেশিক স্তরে রাজ্যপাল বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং তাঁর ও তাঁর মন্ত্রীসভার পরামর্শক্রমে শাসন দায়িত্ব পালন করেন। রাজ্যপাল প্রদেশের সাংবিধানিক প্রধান। মন্ত্রীসভার পতন হলে অথবা আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়লে সংবিধানের ৩৫৬ ধারা জারি করে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ করা যায়, সেক্ষেত্রে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী হন এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত উপদেষ্টামণ্ডলীর সাহায্য নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

৪.৪.৬ সুপ্রিম কোর্ট

ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি স্তম্ভ হল স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা। বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছে সুপ্রিমকোর্ট, রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত হল হাইকোর্ট। সংসদে তৈরি আইনের সাংবিধানিক বৈধতা বিচারের দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি—অন্যান্য বিচারকরা প্রধান বিচারপতির সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। ভারতীয় সংবিধানের কোনো ধারা বা অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা, রাজ্য সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রের বিরোধ, এক রাজ্যের সঙ্গে অপর রাজ্যের বিরোধ ইত্যাদি নিষ্পত্তির দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের। সুপ্রিম কোর্ট যে কোনো মামলার বিচার করতে পারে, আপিল মামলা গ্রহণ করতে পারে আবার আইনি পরামর্শ দিতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট হল ভারতীয় সংবিধানের রক্ষাকর্তা।

৪.৪.৭ স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন

স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসনের বিষয়ে সংবিধানে স্পষ্ট কোনো নির্দেশ না থাকলেও সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিতে রাজ্যগুলিকে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গান্ধিজি দীর্ঘদিন ধরে গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার অব্যবহিত পরে এক্ষেত্রে কোনো

উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে একশোটি গ্রামকে একক হিসাবে ধরে গ্রামসেবক, কৃষি বিশেষজ্ঞ এবং সরকারি কর্মীদের নিয়ে গ্রামের উন্নতি কল্পে কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিল। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে বলবন্তরাই মেহতার সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। মেহতা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি ত্রি-স্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েতিরাজ গঠনের উদ্দ্যেগ নেওয়া হয়। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রদেশগুলি আইন করে পঞ্চায়েতি রাজ চালু করে।

৪.৪.৮ সরকারি আমলাতন্ত্র

স্বাধীন ভারতে যে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠে তাদের তিনশ্রেণির সরকারি কর্মচারীর কথা ভাবা হয়—কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও সর্বভারতীয়। কেন্দ্রস্তরে আয়কর, প্রতিরক্ষা, শুল্ক, রেল পরিবহন, পরিকল্পনা, ডাক ও তার, পররাষ্ট্র, হিসাব পরীক্ষা, এবং গণনা ইত্যাদির জন্য কর্মচারি, রাজ্যস্তরে পুলিশ, ভূমিরাজস্ব, কৃষি, অরণ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যস্তরে আমলা, সর্বভারতীয় কর্মচারিদের প্রশাসনের প্রয়োজন অনুযায়ী কখনো রাজ্য আবার কখনো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে নিয়োগ করা।

সংবিধানের চতুর্দশ অংশে কেন্দ্রে ও রাজ্যে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী সংক্রান্ত নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে যথেচ্ছভাবে যাতে চাকুরি থেকে কাউকে অপসারণ করা না হয় সেজন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাকে আইন প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ৩১৫নং ধারায় চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে সরকারি কৃত্যক কমিশন (Public Service Commission) গঠনের কথা বলা হয়েছে। কমিশনের সদস্যরা রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ্যস্তরে রাজ্যপাল দ্বারা ছয় বছরের জন্য নিযুক্ত হন। কমিশনের কাজ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরে সরকারি কর্মচারিদের নিয়োগ করা।

৪.৫ ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে ভারতীয় সংবিধানের উপর ভিত্তি করে ভারত শাসিত হয়ে আসছে। সংবিধানের প্রথম যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে তা হল এর বিপুল আয়তন। ভারতীয় সংবিধান পৃথিবীর বৃহত্তম লিখিত সংবিধান, মূল সংবিধানে ৩৯৫টি ধারা ও ৮টি তপশিলি ধারা ছিল।

ভারতীয় সংবিধান লিখিত হলেও দুষ্পরিবর্তনীয় নয়। সংবিধানের কাঠামো সহজে পরিবর্তনযোগ্য না হলেও দুই-তৃতীয়াংশ সংসদের সমর্থন পেলে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেলে সংবিধান পরিবর্তন ঘটানো যায়।

ভারতীয় সংবিধানে এদেশকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সার্বভৌম অর্থে দেশের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে ভারত সরকারের ক্ষমতাই চূড়ান্ত একথা বলা হয়েছে। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হিসাবে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান সাধ্যমত দূর করে

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা অনুসারে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ ধর্ম অনুসরণ করতে পারবে এবং কোনো রাষ্ট্রীয় ধর্ম থাকবে না। গণতন্ত্র বলতে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার এবং প্রজাতন্ত্রের অর্থ যেখানে জনগণের হাতেই রয়েছে সর্বোচ্চ ক্ষমতা।

সংবিধানের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল এখানে ক্ষমতা বিভাজন নীতি সর্বাংশে গৃহীত হয়নি। আইন প্রণয়ন, প্রশাসন ও বিচার বিভাগ এখানে একে অন্যের পরিপূরক।

৪.৬ উপসংহার : সংবিধানের মূল্যায়ন

ভারতের সংবিধানের একটি বড় সীমাবদ্ধতা হল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিপত্য। কেন্দ্রে ও রাজ্যের মধ্যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বিভক্ত হলেও বিরোধের ক্ষেত্রে কেন্দ্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আমলাতান্ত্রিক পরিষেবা ও অর্থের জন্যও প্রদেশগুলি কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল।

সংবিধানে মৌলিক অধিকার ঘোষণা করা হলেও সরকার প্রয়োজন মনে করলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে ব্যক্তি সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারে আবার নিরাপত্তার খাতিরে যে কাউকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার অধিকারও সরকারের রয়েছে।

সংবিধান সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত না হলেও সংবিধানে যেহেতু নমনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়েছে সেহেতু সংশোধনের মাধ্যমে ত্রুটি দূর করা সম্ভব। দেশভাগ ও দাঙ্গার ফলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে একটি শক্তিশালী এককেন্দ্রিক সরকার প্রতিষ্ঠাই তখন স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু সংবিধান প্রণেতারা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরি করে দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে সম্পত্তি ও শিক্ষার ভিত্তিতে খুবই সীমিত ভোটাধিকার ভারতবাসীকে দেওয়া হয়েছিল এবং সংবিধান সভার সদস্যরা ছিলেন জনসংখ্যার মাত্র বারো শতাংশ ভোটে নির্বাচিত। কিন্তু ভারতের সংবিধানে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নারীপুরুষকে ভোটাধিকার দান করা হয়েছে। দেশভাগের পূর্বে ও পরে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের প্রেক্ষাপটে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা সংবিধান প্রণেতাদের সাহসের নিদর্শন। রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত এবং সুপ্রিম কোর্ট সেই সংবিধানের অভিভাবক।

৪.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। সংবিধান সভার গঠন সম্পর্কে আলোচনা করুন। সংবিধান প্রণয়নে এই সভার ভূমিকা কী ছিল?

২। সংবিধানে মৌলিক অধিকার ও নির্দেশমূলক নীতির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

৩। ভারতীয় সংবিধান রচনার পটভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

৪। ভারতীয় সংবিধানের বিশেষ দিকগুলি বর্ণনা করুন।

৫। ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৬। ভারতীয় সংবিধানের মূল্যায়ন করুন।

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। Paul R. Brass — *The Politics of India Since Independence*, Cambridge University Press, 1997.

২। Sabyasachi Bhattacharyya and N. N. Vohra edited — *Looking Back : India in the 20th Century*, New Delhi, 2002.

৩। Bipan Chandra & Others — *India Since Independence, 1947-2000,* Penguin, 2000.

একক ৫ ❑ জাতীয় সংহতি এবং দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তি

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য

৫.১ ভূমিকা

৫.২ দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি

৫.২.১ জুনাগড়

৫.২.২ হায়দ্রাবাদ

৫.২.৩ কাশ্মীর : ভারতভুক্তি ও ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৪৮)

৫.৩ উপসংহার

৫.৪ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৫.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন—

- স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের অখণ্ডতা এবং জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার প্রয়োজনে দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি নতুন সরকারের নিকট জরুরি ছিল।
- প্রায় সমস্ত দেশীয় রাজ্য ভারতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলেও তিনটি দেশীয় রাজন্যশাসিত রাজকে নিয়ে সমস্যা দেখা যায়। এগুলি হল জুনাগড়, নিজাম-শাসিত হায়দ্রাবাদ ও জম্মু ও কাশ্মীর।
- সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দক্ষতায় দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতের অন্তর্ভুক্তি হয়। দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির ফলে ভারতের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঐক্য সম্পূর্ণ হয়।
- তবে কাশ্মীর সমস্যা ছিল জটিল এবং এখনও এই সমস্যা অমীমাংসিত।

৫.১ ভূমিকা

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের নানা সমস্যা—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অনগ্রসরতা, অন্ধ কুসংস্কার, অসাম্য, দারিদ্র ইত্যাদির সমাধান নূতন সরকারের নিকট জরুরি ছিল। ভারতের অখণ্ডতা ও ভৌগোলিক সংহতি রক্ষার

পক্ষে বিপজ্জনক ছিল দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীন অবস্থিতি। নেহেরু সরকার প্রথমে যে বিষয়টির ওপর নজর দিয়েছিল তা হল ভারতবর্ষের নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা। জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার প্রয়োজনে দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি ছাড়া সরকার যে সব বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছিল সেগুলির মধ্যে ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান, উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বাসন, আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং একটি বৈদেশিক নীতি উদ্ভাবন করা যা ভারতের স্বাধীনতা অটুট রেখে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ভারত সীমানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সকল দেশীয় রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উদ্যোগ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জাতীয়তাবাদী আবেগের কাছে আবেদন রেখে ভারত সীমানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সকল দেশীয় রাজ্যকে ভারতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।

৫.২ দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দেশের নিরাপত্তা এবং সংহতির প্রশ্ন নূতন সরকারের নিকট ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে নেহেরু ঘোষণা করেন 'first thing is the security and stability of India'। দেশীয় রাজ্যের স্বাধীন অবস্থিতি ভারতের অখণ্ডতা ও ভৌগলিক সংহতি রক্ষার পক্ষে ছিল বিপজ্জনক। দেশীয় রাজ্যের ভারতভুক্তি এ কারণে প্রয়োজনীয় ছিল।

ঔপনিবেশিক ভারতে প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীন এলাকার বাইরে ও দেশীয় রাজন্যবর্গ-শাসিত কতকগুলি রাজ্য ছিল। এরা ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্বশাসনের অধিকার ভোগ করত। এই সব রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ সরকার অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলির নিকট প্রস্তাব দেওয়া হয় যে তারা ভারত বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে বা নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে। মহম্মদ আলী জিন্না এ ব্যাপারে সম্মত ছিলেন। তিনি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুন ঘোষণা করেছিলেন 'The states would be independent sovereign states on the termination of paramountcy and were free to remain independent if they so desired'. ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অবশ্য আশা করেছিলেন যে দেশীয় রাজ্যগুলি দুটি ডোমিনিয়নের যে কোনো একটিতে যোগ দেবে।

দেশীয় রাজ্যের জনগণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিল এবং তারা গণতন্ত্র পেতে আগ্রহী ছিল। তারা দেশীয় রাজ্যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন, নাগরিক অধিকার ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার দাবি করেছিল। কংগ্রেস জাতীয় আন্দোলনের সময় ঘোষণা করেছিল যে রাজারা নন, জনগণই হলেন রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী, জনগণের মতামতকে দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তির ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রায় সমস্ত দেশীয় রাজ্যই

ভারতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাঁর সচিব ভি. পি. মেনন-এর সহায়তায় দেশীয় রাজ্যগুলিকে দক্ষতার সঙ্গে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেন। 'Instrument of Accession' নামে একটি দলিলের মাধ্যমে এই রাজ্যগুলিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারতভুক্তির বিনিময়ে দেশীয় রাজারা নিয়মিত ভাতা প্রদান ও খেতাব রক্ষার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন।

প্রায় সমস্ত দেশীয় রাজ্য ভারতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলেও সমস্যা দেখা দেয় তিনটি দেশীয় রাজন্যশাসিত রাজ্যকে নিয়ে। এগুলি হল জুনাগড়, নিজাম-শাসিত হায়দ্রাবাদ এবং জম্মু ও কাশ্মীর। প্যাটেল এ-বিষয়ে অবগত ছিলেন যে দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতা থাকলে ভারতের ঐক্য বিপন্ন হবে। তিনি এ-বিষয়ে সতর্ক করে ভি. পি. মেননকে বলেছিলেন 'The situation held dangerous potentialities and that if we did not handle it promptly and effectively, our hard earned freedom might disappear through the state's door'. তিনি প্রাথমিক ভাবে সমস্ত রাজাদের নিকট অনুরোধ করেন ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে অবস্থিত সকল রাজারা যেন বৈদেশিক সম্পর্ক নিরাপত্তা এবং যাতায়াত বা যোগাযোগ ইত্যাদির সুবিধার্থে রাজি হন। স্বেচ্ছায় রাজি না হলে তিনি অনিচ্ছুকদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেন।

৫.২.১ জুনাগড়

সৌরাষ্ট্র উপকূলে জুনাগড় ছিল একটি ছোট দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্যের প্রজারা অধিকাংশ হিন্দু হলেও শাসক ছিলেন মুসলিম। নিয়ম অনুসারে দেশীয় রাজারা ভারত বা পাকিস্তান যে কোনো রাষ্ট্রে যোগ দিতে পারতেন। জুনাগড়ের প্রজারা ভারতে থাকতে চাইলেও নবাব পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। নেহেরু ও প্যাটেল উভয়েই গণভোটের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান চেয়েছিলেন। প্রজাবিক্ষোভ এড়াতে জুনাগড়ের নবাব পাকিস্তানে পালিয়ে গেলে জুনাগড়ের দেওয়ান শাহ নওয়াজ ভুট্টো (Nawaz Bhutto) ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী জুনাগড়ে প্রবেশ করে এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গণভোটের সাহায্যে জুনাগড় ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৫.২.২ হায়দ্রাবাদ

জুনাগড়ের মতো হায়দ্রাবাদের অধিকাংশ প্রজা হিন্দু হওয়ায় তারা ভারতে যোগদান করতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু হায়দ্রাবাদের শাসক নিজাম ভারত বা পাকিস্তান কোনো পক্ষেই যোগ না দিয়ে স্বাধীন থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নিজামের অত্যাচারী শাসন হায়দ্রাবাদের জনগণের জীবন অতিষ্ট করে তুলেছিল। তার সঙ্গে শুরু হয়েছিল এক মৌলবাদী মুসলিম সংগঠনের উপদ্রব। সর্দার প্যাটেল হায়দ্রাবাদ সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। নেহেরু দ্বিধাকে অগ্রাহ্য করে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১৩ সেপ্টেম্বর হায়দ্রাবাদে সেনা প্রেরণ করেন। ভারত সরকার হায়দ্রাবাদকে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে।

৫.২.৩ কাশ্মীর : ভারতভুক্তি ও ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৪৮)

কাশ্মীর সমস্যা ছিল সর্বাপেক্ষা জটিল এবং এখনও এই সমস্যা অমীমাংসিত। কাশ্মীরের রাজা হরি সিং হিন্দু হলেও অধিকাংশ প্রজা ছিল মুসলমান। তবে জম্মুতে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল এবং লাদাখে বেশ কিছু বৌদ্ধ ছিলেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে এখানে শাসক বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সীমান্তবর্তী রাজ্য কাশ্মীরের ভৌগোলিক অবস্থা এবং আফগানিস্তান, রাশিয়া, চিন ও তিব্বতকে স্পর্শ করার কারণে ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের কাছে কাশ্মীরের দখল পাওয়া ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার প্রাক্কালে রাজা হরি সিং কোনো রাজ্যে যোগ দিতে রাজি ছিলেন না এবং কাশ্মীরের স্বাধীনতা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। অপরদিকে কাশ্মীর রাজ্য পরিষদ ও তার নেতা শেখ আবদুল্লাহ কাশ্মীরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে আগ্রহী ছিলেন।

ভারত স্বাধীন হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাক মদতপুষ্ট এক উপজাতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করে। এই সেনারা বারামূলা অধিকার করে নেয় এবং রাজধানী শ্রীনগরের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে। রাজা হরি সিং উপলব্ধি করেন যে জম্মু-কাশ্মীরের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব। রাজা হরি সিং জম্মুতে আশ্রয় নিয়ে ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্যাটেলের পরামর্শে হরি সিং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ২৬ অক্টোবর ভারত সরকার ও জম্মু-কাশ্মীর সরকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি দলিল স্বাক্ষর করেন। জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই দলিল অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীর সরকার প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ এই তিনটি বিষয়ে ভারতের কর্তৃত্ব মেনে চলতে স্বীকৃত হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২ নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ঘোষণা করেন—যে মুহূর্তে কাশ্মীরে আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং কাশ্মীরের ভূখণ্ড আক্রমণকারীদের হাত থেকে মুক্ত হবে, কাশ্মীরের ভারত অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি কাশ্মীরের মানুষের গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

পাকিস্তান মনে করে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পূর্ণ অবৈধ এবং তারা কাশ্মীরের কিছু অংশ দখল করে নেয়। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় বাহিনী হস্তক্ষেপ করে এবং পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ বাধে। ভারত পাকিস্তানকে শান্তিভঙ্গকারী সাব্যস্ত করে এবং জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কাশ্মীর কমিশন গঠন করে। পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী কাশ্মীরের অধিকৃত অঞ্চলে 'আজাদ কাশ্মীর' নামে পৃথক প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করে। শেষ পর্যন্ত জাতিপুঞ্জের মধ্যস্থতায় ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ১লা জানুয়ারি থেকে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে এবং এই সময় আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর কাশ্মীরকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে দেয়। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে পাকিস্তান তার অধিকৃত অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর

জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রত্যাহার না করায় গণভোট সম্ভবপর হয়নি।

৫.৩ উপসংহার

কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে মতপার্থক্যের কারণে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে পারেনি। কাশ্মীর সমস্যাকে নিরাপত্তা পরিষদে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না বলে অনেকে নেহেরুর সমালোচনা করেছেন। ভারত যুদ্ধে জয়লাভ করে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল, সেই সময় মাউন্টব্যাটেনের পরামর্শে নিরাপত্তা পরিষদে গিয়ে নেহেরু কাশ্মীরকে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত করেন। নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকায় নেহেরু হতাশ হয়েছিলেন।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দক্ষতায় দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতের অন্তর্ভুক্তি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু বিনিময়ে তাদের যে বিরাট অঙ্কের রাজন্যভাতা, উত্তরাধিকার, উপাধি, ব্যক্তিগত সম্মত্তির মালিকানা ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তার ফলে দরিদ্র ভারতের কাছে এক অর্থনৈতিক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং ভারতে এক বিশেষ সুবিধাভোগী অভিজাত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল যারা রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছিল। আবার একথাও ঠিক স্বাধীনতা-পরবর্তী উত্তেজনার মুহূর্তে কোনো সুযোগ-সুবিধা না দিয়ে বলপূর্বক দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করলে এক জটিল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারত। দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির ফলে একদিকে যেমন ভারতের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঐক্য সম্পূর্ণ হয়েছিল তেমনি দেশীয় রাজ্যের প্রজাসাধারণ স্বৈরতান্ত্রিক অত্যাচারী শাসনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

৫.৪ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি প্রশ্নে কোথায় কোথায় সমস্যা হয়েছিল এবং কীভাবে তার সমাধান করা হয়েছিল।

২। দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির ক্ষেত্রে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

৩। কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। আপনি কি মনে করেন দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি আবশ্যক ছিল? কীভাবে জুনাগড় এবং হায়দ্রাবাদকে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

৫.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১। Bipan Chandra & Others — *India Since Independence, 1947-2000,* Penguin, 2000.

২। সিদ্ধার্থ গুহ রায় — *আধুনিক ভারতের ইতিহাস,* ১৭০৭-১৯৬৪, কলকাতা, ২০১২।

৩। অলক কুমার ঘোষ — *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব (১৮৭০-২০০৬)*, কলকাতা, ২০০৭।

পর্যায় ৩ : ভারতীয় গণতন্ত্রের কার্যক্রম (১৯৫০-১৯৭০ এর দশক)

একক ৬ ❑ ভাষা সমস্যা ও ভাষাগত প্রদেশ গঠন

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য
৬.১ ভূমিকা
৬.২ ভাষা সমস্যা
৬.৩ ভাষাগত প্রদেশের পুনর্গঠন
৬.৪ উপসংহার
৬.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী
৬.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন—

- স্বাধীনোত্তর ভারতে ভাষা সমস্যা দেশের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যকে ব্যাহত করে।
- জাতীয় ভাষার প্রশ্নে বিরোধীতা এবং ভাষাকে কেন্দ্র করে রাজ্যগুলির পুনর্গঠনের দাবি জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করে তোলে।
- ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ১৬ ডিসেম্বর পার্লামেন্টে Official Language Act পাশ হয়। এই আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মে এবং রাজ্যগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে হিন্দি প্রধান রাষ্ট্রভাষা এবং ইংরেজিকে সহযোগী ভাষা হিসাবে ব্যবহারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে State Reorganization Commission গঠিত হয়। এই কমিশনের ওপর রাজ্যগুলির পুনর্গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

৬.১ ভূমিকা

স্বাধীনোত্তর ভারতে ভাষা সমস্যা দেশের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যকে ব্যাহত করেছিল। স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে ঐক্য ও সংহতির প্রতিমূর্তি ছিল ব্রিটিশ বিরোধীতা। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই

ভাষাকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে, অভিন্ন সংস্কৃতি গড়ার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হয়। জাতীয় ভাষার প্রশ্নে বিরোধীতা এবং ভাষাকে কেন্দ্র করে রাজ্যগুলির পুনর্গঠনের দাবি জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করে তোলে। এই পরিস্থিতিতে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যকে এবং বিভেদের মধ্যে সংহতিকে ধরে রাখার মূল সূত্রটির অনুসন্ধান বা এ-বিষয়ে সরকার ও সমসাময়িক নেতৃবৃন্দের প্রয়াস ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৬.২ ভাষা সমস্যা

স্বাধীনোত্তর ভারতে ভাষা সমস্যা দেশের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থায় ভাষাগত ঐক্য সংহতির পরিচায়ক। ভারতের মতো বহুভাষী দেশে সংহতির প্রশ্নে ভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রথম দুই দশকের মধ্যে ভাষা সমস্যা বা ভাষাগত বৈচিত্র জাতীয় সংহতিকে দুই দিক থেকে বিপন্ন করে তোলে। (ক) ভাষার প্রশ্নে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে বিরোধীতা এবং (খ) ভাষাকে কেন্দ্র করে রাজ্যগুলির পুনর্গঠন।

ভাষার প্রশ্নে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়টি দেশের দক্ষিণাংশের মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। বহু ভাষাভাষী এই দেশে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল ইংরেজি ভাষা, কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব অ-হিন্দিভাষীদের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব কোনো একটি বিশেষ ভাষাকে ভারতের জাতীয় সত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক বলে বিবেচনা করেননি। ভারত বহুভাষী দেশ হিসাবে প্রচলিত সকল ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে তাদের মত প্রকাশ করেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে জওহরলাল নেহেরু এই মর্মে মন্তব্য করে বলেন : *'Our great provincial languages ... are ancient languages with a rich inheritance, each spoken by many millions of persons, each tied up inextricably with the life and culture and ideas of the massess as well as of the upper classes. ... Therefore it is inevitable that we lay stress on the provincial languages and carry on most of our work through them'*. জাতীয় ভাষার বিষয়টি নিষ্পত্তি হয় যখন সংবিধান প্রণেতাগণ প্রধান ভাষাগুলিকে ভারতের ভাষা বা ভারতের জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকারি কাজকর্ম এতগুলি ভাষায় নির্বাহ করা সম্ভব নয় ভেবে কোন একটি ভাষাকে গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল যার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সক্ষম হয়।

১৯৫৬-৬০ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বিরোধ স্পষ্ট হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে Official Language Commission-এর প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয় ইংরেজির পরিবর্তে হিন্দি ভাষায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্ম ক্রমশ শুরু করা উচিত যাতে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে হিন্দি ভাষা রাষ্ট্রভাষার স্থান নিতে পারে। কমিশনের প্রতিবেদন পুনর্বিবেচিত হয় পার্লামেন্টের যৌথ কমিটির দ্বারা। যৌথ কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করে ১৯৬০

খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপতি এপ্রিল মাসে এই মর্মে নির্দেশ দেয় যে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের পর হিন্দি প্রধান রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হবে কিন্তু এই সঙ্গে ইংরেজি সহযোগী সরকারি ভাষা হিসেবে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়া কার্যকরী হবে। রাষ্ট্রপতির নির্দেশ বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এগুলির মধ্যে ছিল কেন্দ্রীয় হিন্দি পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা (Central Hindi Directorate), গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের হিন্দি প্রকাশনা, অথবা হিন্দি ভাষায় অনুবাদ, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের হিন্দি ভাষায় দক্ষ করে তোলা, আইন ও বিচার ব্যবস্থায় হিন্দি ভাষার প্রয়োগ ইত্যাদি।

হিন্দি ভাষার স্বপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সমস্ত উদ্দ্যোগের প্রতিবাদে মুখর হয় অ-হিন্দিভাষী এলাকার জনগণ। এমন কি হিন্দি ভাষার পৃষ্ঠপোষক নেতৃবৃন্দও সন্তুষ্ট ছিলেন না। সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী, চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী প্রমুখ ভাষা কমিশনের প্রতিবেদনের সমালোচনা করেন। হিন্দি ভাষার পৃষ্ঠপোষক পুরুষোত্তম টন্ডন, গোবিন্দ দাস পার্লামেন্টের যৌথ কমিটির ইংরেজি ভাষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেন।

বহু বিতর্ক, আলোচনার পর ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ১৬ ডিসেম্বর পার্লামেন্টে Official Language Act পাশ হয়। এই আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মে এবং রাজ্যগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে হিন্দি প্রধান রাষ্ট্রভাষা এবং ইংরেজিকে সহযোগী ভাষা হিসাবে ব্যবহারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অ-হিন্দিভাষী জনগণের ওপর হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া হবে না বলে অঙ্গীকার করা হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভাষা সমস্যার ক্রমশ সমাধান হতে শুরু করে। গণতান্ত্রিক উপায়ে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হওয়ায় জাতীয় সংহতি গড়ে ওঠার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সমস্যা সম্পূর্ণভাবে সমাধান সম্ভব না হলেও এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে শিক্ষা, বাণিজ্য, পর্যটন, দূরদর্শন প্রভৃতির সুবাদে হিন্দি ভাষা অ-হিন্দিভাষা এলাকার জনগণকে ক্রমশ আকৃষ্ট করে তোলে। একইভাবে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি হিন্দি-ভাষী এলাকায়ও প্রসার লাভ করে।

৬.৩ ভাষাগত প্রদেশের পুনর্গঠন

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির লক্ষ্যে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ভারতের রাজ্যগুলির সীমানা নির্ধারণে ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক সংহতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, ফলে প্রদেশগুলি ছিল বহুভাষী এবং বহু সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র।

ভাষা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। শিক্ষার প্রসার, গণ স্বাক্ষরতা মাতৃভাষাকে আশ্রয় করে সম্ভব হয়। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, শাসনব্যবস্থা সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষার মাধ্যম পরিচালিত হলে গণতন্ত্র বাস্তবায়িত হয়। এই ভাষা বা মাতৃভাষার উপর ভিত্তি করে রাজ্যগুলি পুনর্গঠিত হলে তবেই শিক্ষা, শাসনতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ, বিচারব্যবস্থা মাতৃভাষার মাধ্যমে বা জনগণের বোধগম্য ভাষায় পরিচালিত হতে পারে।

ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের বিষয়টি সংবিধান সভায় উত্থাপিত হয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান সভা এস. কে. ধর এর নেতৃত্বে The Linguistic Provinces Commission নিয়োগ করে। উদ্দেশ্য ছিল ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিচার করা। ধর কমিশন এই ধরনের প্রদেশ গঠন জাতীয় ঐক্যের পক্ষে বিপজ্জনক এবং শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা এর ফলে সৃষ্টি হতে পারে বলে আশঙ্কা করলে সংবিধান সভা সংবিধানে ভাষা নীতি অন্তর্ভুক্ত না করার সিদ্ধান্ত নেয়। সংবিধান সভার এই সিদ্ধান্ত বিশেষত দক্ষিণ ভারতের জনগণকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর জওহরলাল নেহেরু, সর্দার প্যাটেল এবং পট্টভি সীতারামাইয়ার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটিও ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের বিষয়টি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয় যে বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐক্য, জাতীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন জরুরি কিন্তু ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন কাম্য বিবেচিত হয়নি। কমিটি ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব স্থগিত রাখার পরামর্শ দেয়।

এই কমিটির সুপারিশের প্রতিবাদে সারা দেশে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ১৯ অক্টোবর জনপ্রিয় স্বাধীনতা-সংগ্রামী পট্টি সিরামালু (Patti Siramalu) স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করেন এবং আঠান্ন দিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। সরকার শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের দাবি স্বীকার করে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। একই সঙ্গে তামিলভাষী রাজ্য হিসেবে তামিলনাড়ু স্বীকৃতি পায়।

অন্ধ্রপ্রদেশের জনগণের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর জনগণ নিজ নিজ রাজ্য গঠনের জন্য আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু নেহেরু এই সময় ভারতের অভ্যন্তরীণ শাসনতান্ত্রিক সীমানা পুনর্গঠনের পক্ষে ছিলেন না। নীতিগতভাবে বিরোধী না হলেও জাতীয় ঐক্য ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় তিনি এ ব্যাপারে নিরুৎসাহী ছিলেন। নেহেরুর জীবনীকার এস. গোপাল (S. Gopal) এ-বিষয়ে নেহেরুর অভিমত জানিয়ে লেখেন *'He (Nehru) felt that it would be undemocratic to smother this sentiment which, on general grounds, he did not find objectionable. Indeed, a linguistic mosaic might well provide a firmer base for national unity. What concerned him were the timing, the agitation and violence with which linguistic provinces were being demanded and the harsh antagonism between various sections of the Indian people which underlay these demands'.*

নেহেরু ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে বিচারক ফজল আলী, কে. এম. পানিক্কর এবং হৃদয়নাথ কুঞ্জরু-র নেতৃত্বে State Reorganization Commission (SRC) গঠন করে রাজ্যগুলির পুনর্গঠন বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে এই কমিশন তার সুপারিশ পেশ করে। এর ভিত্তিতে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বরে The State Reorganization Act পার্লামেন্টে পাশ হয়। এই আইনে ১৪টি রাজ্য এবং ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত তেলেঙ্গানা

অন্ধ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত মালাবার জেলা সহ ট্রাভাঙ্কুর-কোচিন নিয়ে কেরালা গঠিত হয়। মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ এবং কুর্গ নিয়ে মহীশুর রাজ্য গড়ে ওঠে। কুচ, সৌরাষ্ট্র এবং হায়দ্রাবাদের মারাঠীভাষী এলাকা বোম্বের সঙ্গে যুক্ত হয়।

SRC-র প্রতিবেদনে এবং State Reorganization Act-এর প্রতিবাদে বোম্বাই শহরে বিক্ষোভ আন্দোলন গড়ে ওঠে। ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, শিল্পী এবং ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এই বিক্ষোভে অংশ নেয়। পরিস্থিতির চাপে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে সরকার বোম্বাই প্রদেশকে বিভক্ত করলে দুটি ভাষাভিত্তিক রাজ্য—মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট গড়ে ওঠে। বোম্বাই শহর একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রশাসিত রাজ্য হিসাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বোম্বাই, গুজরাট এবং আমেদাবাদে বিক্ষোভ হয়। বোম্বাই শহর মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে। আমেদাবাদ গুজরাটের রাজধানীতে পরিণত হয়। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্দিরা গান্ধি পাঞ্জাবের বিভাজন ঘটান। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে চণ্ডীগড় পাঞ্জাব ও হরিয়ানার রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়।

State Reorganizion Commission গঠিত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাব ছিল বিহারের কিছু অঞ্চলকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার। এই দাবির বিপক্ষে বিহার থেকে প্রতিবাদ আসে। পরিস্থিতি জটিল হয় যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিং বিহার এবং বাংলা প্রদেশকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। বাংলা এবং বিহারের সংযুক্তিকরণের প্রস্তাবের বিরোধীতা করে উভয় প্রদেশেই আন্দোলন গড়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে মূলত বামপন্থীরা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। পশ্চিম দিনাজপুর সহ অন্যান্য জেলায় এই আন্দোলন বৃহৎ আকার ধারণ করে। এই পরিস্থিতিতে বিধানচন্দ্র রায় সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব ফিরিয়ে নেন তবে বিহারের কিছু অংশ দাবি করেন। কিন্তু বিহারের পক্ষ থেকে এই দাবিও প্রত্যাখান করা হয়। বহু বিতর্কের পর State Reorganization Commission মহানন্দা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত বিহারের পাটনা জেলার কিছু অঞ্চল অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করে। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে The Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act অনুযায়ী বিহারের চোপরা, করণদিঘি, ইসলামপুর, গোপালপোখর (Chopra, Karandighi, Inlampur, Gopalpokhar) থানার অন্তর্গত অঞ্চলসমূহ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়। পশ্চিম দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমা অঞ্চলের অধিবাসীরা সন্তুষ্ট হয়নি কারণ তারা স্বতন্ত্র জেলা দাবি করেছিল তাদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন, রাজনীতি, স্বাস্থ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে। এই পুনর্গঠন তাদের প্রত্যাশা পূরণ করেনি।

সামগ্রিকভাবে রাজ্যগুলির পুনর্গঠন প্রক্রিয়া দেশের ঐক্য, সংহতিকে দুর্বল করেনি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Rajni Kothari এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেন : *'Inspite of leadership's earlier reservations and ominous forebodings by sympathetic observers, the reorganization resulted in rationalizing the political map of India without seriously weakening its unity'.*

৬.৪ উপসংহার

স্বাধীন ভারতবর্ষে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যা দেশের অভ্যন্তরীণ মানচিত্রকে, জনবসতির বিন্যাসকে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চালচিত্রকে এবং সর্বোপরি নির্বাচনী সমীকরণকে বিবিধ ভাবে প্রভাবিত করেছে। বস্তুত ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন প্রক্রিয়া বহুভাষাভাষী দেশের জনগণের আত্মপরিচিত এ আত্মমর্যাদার প্রশ্নের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত। ভারতবর্ষের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল 'বিবিধ' ও 'মিলন'—উভয়কে শ্রদ্ধা ও সম্মান সহকারে স্বীকার করা। ভাষার প্রশ্নে রাজ্যগঠন এই প্রক্রিয়াকে আরও বলিষ্ঠ করে তোলে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনকে স্বীকার করে নিয়ে সরকার প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক সত্তাসমূহকে স্বীকার করে। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে ভারতীয় গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়। এর পাশাপাশি, সরকারি স্তরে স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। ভাষার বিকাশ জাতির বিকাশে সহায়ক ছিল। স্বাধীনতা-উত্তর ভারত যে কত ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ ভাষা সমস্যা সমাধানে সরকারি নীতি প্রণয়ন ও ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠন।

৬.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। স্বাধীনোত্তর ভারতে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বিরোধ এবং এর সমাধান সূত্র কীভাবে বের করা হয়েছিল—আলোচনা করুন।

২। স্বাধীনোত্তর ভারতে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের বিষয় সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখুন।

৩। টীকা লিখুন—

(ক) Official Language Act (1967)

(খ) State Reorganization Act (1956)

৬.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। Judith Brown — *Nehru : Profiles in Power,* Routledge, 2014.

২। Bipan Chandra & Others — *India Since Independence*, 1947-2000, Penguin, 2000.

একক ৭ ❑ গণতান্ত্রিক আন্দোলন

গঠন

৭.০ উদ্দেশ্য

৭.১ ভূমিকা

৭.২ খাদ্য আন্দোলন (১৯৫৯-১৯৬৬)

৭.২.১ খাদ্য আন্দোলন (১৯৫৯)

৭.২.২ খাদ্য আন্দোলন (১৯৬৬)

৭.২.৩ ফলাফল

৭.৩ কৃষক অসন্তোষ এবং নকশাল আন্দোলন (১৯৬৭)

৭.৪ রেল ধর্মঘট (১৯৭৪)

৭.৫ নাগরিক অধিকার আন্দোলন (১৯৭৪-৭৫)

৭.৬ উপসংহার

৭.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৭.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে কিভাবে প্রায় দুই দশক ধরে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলি সক্রিয়ভাবে সরকারের বিরোধীতা করেছিল।
- ১৯৫৯, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের খাদ্য আন্দোলনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পরিবর্তন আসে।
- ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে গড়ে ওঠা নকশাল আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল শোষণ এবং অত্যাচারের বিরোধীতা করে একটি শ্রেণিহীন সমাজ গড়ে তোলা।
- ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে রেল ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে রেল শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছিল।
- ১৯৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণের মুক্তির চেতনা সুনির্দিষ্ট আকার নিয়েছিল।

৭.১ ভূমিকা

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে প্রায় দুই দশক ধরে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনগুলির লক্ষ্য ছিল জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করা এবং এই লক্ষ্যে অবিচল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন গড়ে তুলে এবং সংগঠন তৈরি করে সক্রিয়ভাবে সরকারের বিরোধীতা করে দাবিগুলি আদায় করা এবং সরকারের নীতির পরিবর্তন ঘটানো। কয়েকটি সংগঠনের মধ্যে দিয়ে জনগণের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রসার ঘটেছিল এবং শোষণ, নিপীড়ন, বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ একটা সুনির্দিষ্ট মাত্রা পেয়েছিল। ১৯৫৯, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের খাদ্য আন্দোলনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পরিবর্তন আসে এবং অনেক নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে গড়ে ওঠা নকশাল আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল শোষণ এবং অত্যাচারের বিরোধীতা করে একটি শ্রেণিহীন সমাজ গড়ে তোলা যাতে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা লাভ করা সম্ভব হয়। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে রেল ধর্মঘট গণআন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে রেল শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জনগণের মুক্তির চেতনা সুনির্দিষ্ট আকার নেয়। জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে কয়েকটি সংগঠন গড়ে ওঠে যেগুলি সরকারের গণতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। নাগরিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন ভারতীয় সমাজে স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

৭.২ খাদ্য আন্দোলন (১৯৫৯-১৯৬৬)

প্রায় দুই দশক ধরে যে সমস্ত গণআন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নির্দ্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, ১৯৫৯ এবং ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের খাদ্য আন্দোলন এদের অন্যতম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলা গণআন্দোলনের জোয়ার প্রত্যক্ষ করেছিল। প্রাথমিকভাবে এই আন্দোলনগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত হলেও এই আন্দোলনগুলি স্বতস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল। সাধারণ মানুষ দলের বিধি-নিষেধের ওপর নির্ভর না করেই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল।

৭.২.১ খাদ্য আন্দোলন (১৯৫৯)

তীব্রতার বিচারে খাদ্য আন্দোলনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট হিসাবে ব্রিটিশ শাসনের শেষ পর্বে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ, তেভাগা আন্দোলন এবং চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকে ত্রুটিপূর্ণ গণবণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে গড়ে ওঠা খাদ্য আন্দোলন ১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝি বিশেষ করে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। শহর থেকে গ্রামে সারা রাজ্যব্যাপী এই আন্দোলনের প্রভাব অনুভূত হয়েছিল।

স্বাধীনোত্তর পর্বে ভারত বিভাজন এবং জনসংখ্যার ক্রমাগত চাপের ফলে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে পড়েছিল। ১৯৫২-৫৩ খ্রিস্টাব্দে ফসলের উৎপাদন সন্তোষজনক হওয়া সত্ত্বেও ভবিষ্যতে খাদ্যশস্যের চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্যশস্য মজুত করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এ-বিষয়ে কোনো উদ্যোগ না নেওয়ার ফলে মজুতদাররা কালোবাজারির আশ্রয় নেয়। ফলে খাদ্যশস্যের কৃত্রিম সংকট দেখা দেয় এবং খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে চালের মূল্য ছিল টন প্রতি ৩৮২ টাকা। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৩২ টাকায়। খাদ্যশস্যের কৃত্রিম সংকট এবং ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি দুর্ভিক্ষের চেহারা নেয়।

বামপন্থী নেতৃত্ব পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য দুটি পন্থা অবলম্বন করেন। একদিকে তাঁরা রাজ্য বিধানসভায় খাদ্য সংকটের বিষয়টি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাতে বিষয়টি জনগণের দৃষ্টিগোচর হয়, অন্যদিকে মূল্যবৃদ্ধি এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি (Price Increase and Famine Resistance Committee (PIFRC) গঠন করে সরকার বিরোধী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। এই কমিটি খাদ্য আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকেই সরকার এবং বিরোধী পক্ষের কার্যকলাপ আগস্ট-সেপ্টেম্বরে আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ৩১ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর আন্দোলন ভয়াবহ আকার নেয়। আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে। পুলিশী নির্যাতন এবং গণহত্যার জন্য PIFRC মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় পরিচালিত সরকারকে দায়ী করে। শেষ পর্যন্ত PIFRC ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ২৬ সেপ্টেম্বর খাদ্য আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণা করে। কলকাতায় মৌন মিছিল করা হয়। দাবি ছিল পুলিশী নির্যাতনের প্রতিকার, শহীদদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ এবং খাদ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ।

৭.২.২ খাদ্য আন্দোলন (১৯৬৬)

PIFRC ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর আন্দোলন সাময়িকভাবে তুলে নিলেও আন্দোলনের বিলুপ্তি ঘটেনি। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ পশ্চিমবঙ্গ এই আন্দোলনের আরও ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করে। এই সময় আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা থেকে জেলাগুলিতে স্থানান্তরিত হয়। স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের এই আন্দোলন ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের আন্দোলনের থেকে আরও বেশি গণমুখী এবং স্বতস্ফূর্ততার পরিচয় দেয়।

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে চালের দাম কেজি প্রতি ৫ টাকায় পৌঁছায়। গ্রামীণ জনগণের অপরিহার্য কেরোসিন তেলের তীব্র সংকট অনুভূত হয়। শহুরে দরিদ্র জনগণের নিকট ও কেরোসিন তেল ছিল অপরিহার্য। এই সময় বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর নূতন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন তাঁর এক বক্তৃতায় জনগণকে ব্যতিক্রমী পরামর্শ দেন। চালের ক্রমাগত সংকটের মোকাবিলা করার লক্ষ্যে তিনি জনগণকে খাদ্যাভাসের পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। তিনি জনগণকে চালের পরিবর্তে আটা বা ময়দা খাওয়ার কথা বলেন। আলুর চেয়ে কাঁচাকলা শরীরের পক্ষে বেশি উপকারী বলেন। ১৬ জুন স্বরূপনগরে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ গুলি চালায়।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং কেরোসিন-এর সংকট-এর প্রতিবাদে আন্দোলনকারীদের মধ্যে নূরুল ইসলাম এবং তাঁর সহপাঠী মনীন্দ্র বিশ্বাস পুলিশের গুলিতে মারা যায়। এই ঘটনা শুধুমাত্র কলকাতায় নয়, জেলা এবং গ্রাম স্তরে জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পুলিশ এবং প্রশাসন তাদের ক্ষোভের মুখে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের শহর এবং গ্রামগুলি বিশেষত বসিরহাট, স্বরূপনগর, হাবড়া, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, চাকদা, হিন্দমোটর, উত্তরপাড়া, আসানসোল, ধূবুলিয়া, পলাশী, বেলডাঙ্গা, বহরমপুর সহ অন্যান্য স্থান আন্দোলনে মুখর হয়। মিছিল, রাস্তা অবরোধ, রেল অবরোধ, বিদ্যালয় বয়কট ইত্যাদি কর্মসূচির সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ চলে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত।

৭.৩.৩ ফলাফল

খাদ্য আন্দোলনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতিতে পরিবর্তন আসে। শুধুমাত্র রাজ্যে কংগ্রেসের প্রতি জনসমর্থন হ্রাস পায় তাই নয়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিভাজন ঘটে। ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থী প্রভাবিত দল ক্ষমতায় আসে এবং রাজনীতিতে অনেক নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এর প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও অনুভূত হয়।

৭.৩ কৃষক অসন্তোষ এবং নকশাল আন্দোলন (১৯৬৭)

পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ী গ্রামের নাম অনুসরণে নকশাল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। নকশাল বলতে বোঝায় আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী। অনেকাংশে চরমপন্থায় বিশ্বাসী একটি বিপ্লবী সাম্যবাদী গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে, যারা প্রাথমিকভাবে স্থানীয় জোতদারদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ কৃষক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তাদের এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল 'Rightful redistribution of land to the working peasants'.

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম নকশালবাড়ীতে এই আন্দোলনের সূচনা হয়। জনৈক আদিবাসী যুবক বিমল কিসান তাঁর নিজের জমিতে চাষ করার আইনত অধিকার পেলে স্থানীয় জোতদারের গুণ্ডারা তাকে আক্রমণ করে। এই ঘটনা স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে উত্তেজিত করে তোলে এবং তারা নিজেদের জমি পুনরুদ্ধার করার জন্য সহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। নকশালবাড়ীর এই আন্দোলন দ্রুতগতিতে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির (মার্ক্সবাদী) একটি গোষ্ঠী চারু মজুমদার এবং কানু সান্যাল-এর নেতৃত্বে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে সহিংস আন্দোলনের আকার নেয়। অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেঙ্গানার অন্তর্ভুক্ত শ্রীকাকুলাম অঞ্চলে চন্দ্রপুল্লা রেড্ডীর নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে। দুটি আন্দোলনই ছিল সহিংস। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীগণ ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে All India Coordination Committee of Communist Revolutionaries (AICCCR) গঠন করেন। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি আনুগত্য এবং নির্বাচনে অংশ না

নেওয়া (Allegiance to armed struggle and non-participation in the elections) ছিল এই সংগঠনের লক্ষ্য। আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী এই বিপ্লবী গোষ্ঠী সমসাময়িক ভারতীয় পরিস্থিতিকে প্রাক্-১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে চিনের অবস্থার সমতুল্য মনে করে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে চিনের অনুকরণে ভারতে জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লব (People's Democratic Revolution) সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঘটানো প্রয়োজন। নকশালপন্থীরা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরোধী ছিল। তাদের আদর্শ ছিল শোষণ এবং অত্যাচারের বিরোধীতা করে একটি শ্রেণিহীন সমাজ গঠন করা। বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা পুরণের প্রত্যাশা তাদের ছিল।

নকশাল আন্দোলন গড়ে ওঠার পেছনে মূলত দায়ী ছিল অসাম্য এবং শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসী জনগোষ্ঠী এই অসাম্য ও শোষণের শিকার হয়েছিল। ব্রিটিশ আমলের জমিদারি ব্যবস্থার অধীনে দরিদ্র কৃষক বা আদিবাসী জনগণ প্রতিনিয়ত শোষণের কবলে পড়ে তাদের জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু মেটাতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। সরকার কিছু কিছু বনাঞ্চল সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করায় পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। দীর্ঘকাল ধরে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠী সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা নানাভাবে শোষিত হয়, জমির ওপর অধিকার হারায়, এবং অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত হয়। সরকার বিভিন্ন কারণে এই সমস্ত জমি অধিগ্রহণ করেছিল। এদের মধ্যে ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, রাস্তা তৈরি এবং শিল্প গড়ে তোলা প্রভৃতি। এই সমস্ত কারণে জমি অধিগ্রহণের পরিবর্তে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ থেকে কৃষকরা বঞ্চিত হয়েছিল। শিল্প গড়ে ওঠার পর যে সব নূতন সুযোগ-সুবিধার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তা থেকেও বঞ্চিত ছিল এই সব জনগোষ্ঠী। স্বাধীনোত্তর কালে এই সব অঞ্চলে কৃষি সংস্কার-এর প্রকল্প গৃহীত হয়নি। এই পরিস্থিতিতে নকশাল নেতৃত্ব সাধারণ মানুষের মর্যাদা এবং অধিকারের দাবিতে সাধারণ মানুষকে সংঘবদ্ধ করে আন্দোলন গড়ে তোলে। শ্রেণিহীন সমাজ গঠনে তৎপর হয়ে পুঁজিবাদী এবং শিল্পপতিদের তারা শত্রু মনে করে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্ত ঘটিয়ে এই সব অঞ্চলে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করা লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের নকশাল আন্দোলনের প্রকাশ ঘটলে ভারত সরকার একে আইন-শৃঙ্খলা জনিত সমস্যা বলে মনে করে। সংঘবদ্ধ জনতার বিক্ষোভের কারণ সরকার বিশ্লেষণ করেনি। সরকারের বিশ্বাস ছিল অল্প সময়ের মধ্যেই এই আন্দোলন দমন করা সম্ভব হবে। নকশালবাড়ীতে সশস্ত্র সংঘর্ষ দেখা দিলে সমসাময়িক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ওয়াই বি চবন ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ১৩ জুন লোকসভায় এক ভাষণে এই ঘটনাকে নিছক 'আইন-শৃঙ্খলার অবনতি' বলে মন্তব্য করে অনতিবিলম্বে এটিকে দমন করা হবে বলেন। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারও একইভাবে এই আন্দোলন দমন করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করে। আন্দোলন শুরু হওয়ার চার মাসের মধ্যে অধিকাংশ নেতাকে গ্রেপ্তার করে। নকশাল বাহিনীকে দমন করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে Prevention of Violent Activities Act পাশ করে। সরকারি দমন নীতি

নকশাল আন্দোলনকে সম্পূর্ণ দমন করতে পারেনি। আন্দোলন প্রশমিত করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সামাজিক-অর্থনৈতিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক ছিল।

৭.৪ রেল ধর্মঘট (১৯৭৪)

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে গণআন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ২০ দিন ব্যাপী (৮ মে—২৭ মে) রেল শ্রমিকদের বিক্ষোভ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় সতের লক্ষ রেল শ্রমিক এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। All India Railway Mens Federation লোকোমোটিভ কর্মীদের আট ঘন্টা কাজের দাবি এবং বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেয়। সরকারের অন্যান্য বিভাগে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি হলেও দীর্ঘদিন এই রেল শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি হয়নি। ব্রিটিশ সরকার লোকোমোটিভ কর্মীদের কাজ 'continuous' বা একটানা বলে অভিহিত করে। অর্থাৎ এই শ্রমিকদের দীর্ঘসময় একটানা কাজ করতে হত। স্বাধীন ভারতে এর ব্যতিক্রম হয়নি। রেল বোর্ড দিনে আট ঘণ্টা কাজের সময় বাস্তবায়ন করেনি। ফলে রেল কর্মচারীরা বিশেষত লোকোমোটিভ পাইলটরা অসন্তুষ্ট হয়।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ডিজেলে ইঞ্জিনের ব্যবহার এবং কাজের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকদের কাজের সময় দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। রেল শ্রমিকরা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ১৯৬৭, ১৯৬৮, ১৯৭০, ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ধর্মঘটে সামিল হয়। প্রায় ৭০ শতাংশ স্থায়ী কর্মচারী ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ধর্মঘটে যোগ দেয়।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে এই ধর্মঘট শুরু হয় এবং ২৭ মে এই ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। সরকার নির্মমভাবে এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারীদের দমন করে। হাজার হাজার শ্রমিককে জেলে পাঠানো হয়, এরা কর্মচ্যুত হয়। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের এই রেল ধর্মঘট আপাত ব্যর্থ হলেও পরবর্তীকালে শ্রমিকদের দাবি পুরণের ক্ষেত্রে এই ধর্মঘটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৭.৫ নাগরিক অধিকার আন্দোলন (১৯৭৪-৭৫)

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক আমলে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সূচনা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এই আন্দোলনের কোনো সাংগঠনিক রূপ প্রত্যক্ষ করা না গেলেও উনিশ শতকের গোড়া থেকেই এই আন্দোলনের উৎপত্তির সন্ধান করা যায়। জনগণের মুক্তির চেতনা কতকগুলি দাবি যেমন বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আইনের সমতা, বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। নাগরিক মুক্তি আন্দোলন কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়ে ক্রমশ সাংগঠনিক রূপ পায়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে নাগরিক অধিকারের ঘোষণা। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে স্বতস্ফূর্ত

বিক্ষোভ, হিজলী কারাগারে রাজনৈতিক বন্দিদের পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে কলকাতায় আয়োজিত এক সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ অন্যান্যদের বক্তৃতা (১৯৩১), যার উদ্দেশ্য ছিল নাগরিক কমিটি গঠন করে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্ত করা এবং জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করা ইত্যাদি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশক ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই পর্বে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত গণআন্দোলনের প্রকাশ ঘটে। অল-ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, অল-ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট ফেডারেশন, অল ইন্ডিয়া কিষাণ সভা, প্রগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশন প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয়। সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে শক্তি সঞ্চয় করে। এই সমস্ত সংগঠন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রচনা করে।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ২৪ আগস্ট অল ইন্ডিয়া সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন (All India Civil Liberties Union) জওহরলাল নেহেরুর উদ্যোগে বোম্বাই-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই সংগঠনের সভাপতি। সংগঠনের উদ্বোধনী সভায় নেহেরু নাগরিক অধিকার প্রসঙ্গে বলেন : 'The idea of civil liberty is to have the right to oppose the government'। নাগরিক-স্বাধীনতার চেতনা ভারতবর্ষে নাগরিক স্বাধীনতা আন্দোলনে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছে বলে নেহেরু মন্তব্য করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের সময় এই সংগঠন (ICLU) খুবই সক্রিয় ছিল। আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশী নির্যাতন, গ্রেপ্তার, হয়রানি সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ এবং সরকারের নিকট দাবি পেশ করেছিল। কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই সংগঠন জনগণের মুক্তি চেতনার উন্মেষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

স্বাধীনোত্তরকালে ভারতবর্ষের সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকার ঘোষণা করা হলেও সরকার প্রয়োজন মনে করলে কয়েকটি ক্ষেত্রে যেমন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে ব্যক্তি সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারে আবার নিরাপত্তার খাতিরে যে কাউকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার অধিকারও সরকারের আছে। নাগরিক অধিকার রক্ষার্থে গড়ে ওঠা সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে দাবি করা হলেও বা জনগণের দাবি উপেক্ষা করে সংবিধানে কাজের অধিকার এবং আশ্রয়ের অধিকার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। স্বাভাবিকভাবে জনগণ চাকুরী বা অন্যান্য জীবিকা নির্বাহ করার ক্ষেত্রে মজুরি বৃদ্ধি, কৃষির জন্য জমি, বাড়ী-ঘর নির্মাণ ইত্যাদির জন্য স্বাধীনোত্তর পর্বে সোচ্চার হয়েছে। কিন্তু সরকার এই সমস্ত দাবি পূরণে অনীহা দেখিয়ে জনগণের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার অস্বীকার করেছে।

স্বাধীনতার অব্যহতি পরে নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য কয়েকটি সংগঠন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে গড়ে ওঠে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে Madras Civil Liberties Union গঠিত হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ১-২ জানুয়ারি Bombay Civil Liberties Conference আহুত হয়। একই বছর ১৬-১৭ জুলাই All India Civil Liberties Conference মাদ্রাজে বসে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে একটি Civil Liberties Committee গঠিত হয়। বৈজ্ঞানিক, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী যেমন মেঘনাদ সাহা, শরৎ চন্দ্র বোস, এন. সি. চ্যাটার্জী, ক্ষিতিশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ জনগণের বিশেষত রাজনৈতিক কর্মীদের নাগরিক এবং গণতান্ত্রিক অধিকার অস্বীকার করার জন্য সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেন।

১৯৭০-এর দশকে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে Association for the Protection of Democratic Rights (APDR) এবং ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্রপ্রদেশে Andhra Pradesh Civil Liberties Committee (APCLC) গঠিত হয়। এই আন্দোলন ক্রমে দিল্লী, মহারাষ্ট্র, আসাম, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, ছত্তিশগড়, তামিলনাড়ুতে ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে APDR প্রতিষ্ঠিত হয় এমন এক সময়ে যখন সন্ত্রাস রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েছিল। বন্দিদের ওপর নৃশংস অত্যাচার, গণহত্যা এবং শ্রমিকদের আন্দোলন সারা রাজ্যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। স্বাভাবিকভাবে এই সময় গড়ে ওঠা আন্দোলনের দাবিগুলি ছিল সব ধরনের অমানবিক নিপীড়ন থেকে মুক্তি, অবৈধ এবং অগণতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের অবসান ঘটানো এবং রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্ত করা। এই আন্দোলনের পেছনে গণসমর্থন ছিল। কিন্তু ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে ভারতীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি সাময়িক ভাবে বিলুপ্ত হয়।

জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার APDR-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করে। এই পর্বে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে জয়প্রকাশ নারায়ণের উৎসাহে People's Union for Civil Liberties and Democratic Rights (PUCLDR) সুনির্দিষ্ট আকার নেয়। এই সংগঠন সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে জনগণকে সংঘবদ্ধ করে। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের পর সব রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে গণআন্দোলন বলিষ্ঠ আকার ধারণ করে।

পশ্চিমবঙ্গে নব-নির্বাচিত বামফ্রন্ট সরকার সব রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেয় এবং APDR-এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। জাতীয় এবং রাজ্য স্তরে কয়েকটি নাগরিক অধিকার সংগঠন গড়ে ওঠে। নাগরিক রক্ষার আন্দোলন ভারতীয় সমাজে স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। হাজার হাজার জনতা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে এবং সরকারের সমস্ত রকম গণতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে। জাতীয়স্তরে কয়েকটি সংগঠন যেমন Citizens for Democracy, People's Union for Civil Liberties (PUCL), People's Union for Civil Liberties and Democratic Rights (PUCLDR) এবং Chhatra Yuba Sangharsh Vahini মানব অধিকার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। রাজ্য স্তরেও এই ধরনের কয়েকটি সংগঠন যেমন—Committee for Protection for Democratic Rights (মুম্বাই), Association for Protection of Democratic Rights (APDR) এবং Andhra Pradesh Civil Liberties Committee (হায়দ্রাবাদ) একইভাবে মানব-অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হয়।

৭.৬ উপসংহার

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশ। যেহেতু ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, তাই যে-কোনো ভারতীয় নাগরিক শান্তিপূর্ণ ভাবে সরকার-বিরোধী

আন্দোলন করতে পারে। কিন্তু এটাও মনে রাখার দরকার স্বাধীন ভারতে সমস্ত গণআন্দোলন শান্তিপূর্ণ পথে হয়নি। আমরা এই আলোচনায় দেখিয়েছি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পিছনে কাজ কাজ করেছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক, বর্ণগত এবং লিঙ্গগত বৈষম্য। সরকারি নীতি অনেক সময় বৈষম্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হয়। সরকার-বিরোধী মনোভাবকে সংহত আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহ (যারা সরকারি ক্ষমতায় নেই), সংবাদপত্র, শ্রেণি, বর্ণ ও লিঙ্গগত সাযুজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোর পিছনে যেমন কাজ করেছিল তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক কারণ বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, খাদ্যশস্যের যোগান না থাকা, অভাব এর তাড়না (যেমন খাদ্য আন্দোলনের পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল খাদ্যের, বিশেষত চালের অভাব), তেমন কাজ করেছিল রাজনৈতিক মতাদর্শ, জমির জন্য লড়াই ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের স্বপ্ন (নকশালবাড়ি আন্দোলন যে-ধরনের আন্দোলনের সব চাইতে বড় নজির)। রাষ্ট্র তার নিজের মতন করে এই সকল আন্দোলনগুলিকে দমন করার চেষ্টা করেছে; নিজের শাসনের সপক্ষে বৈধতা স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাস এই টানাপোড়েনর মধ্যে দিয়ে. এগিয়েছে।

৭.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন। ১৯৫৯ এবং ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে এই আন্দোলন কীভাবে গড়ে উঠেছিল।

২। নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৩। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে রেল ধর্মঘটের বিবরণ দিন।

৪। ১৯৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন। এই আন্দোলন গড়ে তোলার পেছনে সংগঠনগুলির ভূমিকা কী ছিল?

৭.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। Suranjan Das and Premansukumar Bondyopadhyay — *Food Movement of 1959 : A comprehensive collection of documents*, K. P. Bagchi & Company, Kolkata.

২। Sunil Kumar Sen — *Peasant Movements in India : Mid-nineteenth and Twentieth centuries,* K. P. Bagchi & Company, Kolkata.

৩। Prakash Singh — *The Naxalite Movement in India*, Rupa & Co., New Delhi, 1999.

৪। Stephen Sherlock — *The Indian Railway Strike of 1974 : A study of Power and Organised Labour,* Rupa & Co., Mumbai, 2001.

৫। Christopher M. Richardson ed. — *Historical Dictionary of the Civil Rights Movement,* 2nd edition, Rowman & Littlefield, 2014.

একক ৮ ❑ অঞ্চল এবং আঞ্চলিক সত্তার গঠন

গঠন

৮.০ উদ্দেশ্য

৮.১ ভূমিকা

৮.২ স্বশাসন ও স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবিতে আন্দোলন

৮.৩ ঝাড়খণ্ড আন্দোলন

৮.৪ উত্তরাখণ্ড আন্দোলন

৮.৫ ছত্তিশগড় আন্দোলন

৮.৬ নাগা আন্দোলন

৮.৭ উপসংহার : আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির উদ্ভব

৮.৮ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৮.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- স্বাধীনোত্তর ভারত উন্নয়নের প্রশ্নে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে ছিল ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি এবং আঞ্চলিক অসন্তোষ তথা আঞ্চলিকতাবাদ।
- ১৯৫০-এর দশক থেকে স্বশাসন এবং স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন হয়েছে। এদের মধ্যে ছিল ঝাড়খণ্ড আন্দোলন, উত্তরাখণ্ড আন্দোলন, ছত্তিশগড় আন্দোলন এবং নাগা আন্দোলন প্রভৃতি।
- স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় সেখানে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে দল ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে।
- আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি শুধুমাত্র আঞ্চলিক রাজনীতির ওপর নয়, জাতীয় রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

৮.১ ভূমিকা

স্বাধীনোত্তর ভারত উন্নয়নের প্রশ্নে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে ছিল ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি, এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে শুরু করে নানা ক্ষেত্রে অসাম্য ও বঞ্চনার অনুভূতিকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক অসন্তোষ তথা আঞ্চলিকতাবাদ। অসাম্য ও বঞ্চনার অনুভূতি কোনো কোনো অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি জানাতে উৎসাহিত করে। সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে পৃথক রাজ্য গঠিত হলে সুশাসন এবং উন্নয়ন সম্ভব সুনিশ্চিত হবে—এই বিশ্বাস ছিল। ১৯৫০ এর দশক থেকে স্বশাসন এবং স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন হয়েছে। এদের মধ্যে ছিল ঝাড়খণ্ড আন্দোলন, উত্তরাখণ্ড আন্দোলন, ছত্তিশগড় আন্দোলন এবং নাগা আন্দোলন প্রভৃতি।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়, যেখানে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে দলব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে। ভারতীয় দল ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অনেক সংখ্যক আঞ্চলিক দলের অস্তিত্ব। আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি শুধুমাত্র আঞ্চলিক রাজনীতির ওপর নয়, জাতীয় রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

৮.২ স্বশাসন ও স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবিতে আন্দোলন

স্বাধীনতার পর ভারত নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল যেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল রাষ্ট্রভাষা সমস্যা এবং ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি, অর্থনৈতিক দিক থেকে শুরু করে নানা ক্ষেত্রে অসাম্য এবং বঞ্চনার অনুভূতিকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক অসন্তোষ তথা আঞ্চলিকতাবাদ। ভারত বহুভাষাভাষী মানুষ ও সংস্কৃতির দেশ হওয়ায় স্বাধীনতার আগে থেকে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি ওঠে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য ছিল। অসাম্য ও বঞ্চনার অনুভূতি কোনো কোনো অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি জানাতে উৎসাহিত করে। আন্দোলনকারীদের বিশ্বাস ছিল যে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে পৃথক রাজ্য গঠিত হলে সুশাসন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত হবে। আঞ্চলিক অসাম্য তথা আঞ্চলিকতাবাদ ভারতীয় জাতি গঠনের পক্ষে ছিল এক বড়ো প্রতিবন্ধক। সরকারের পক্ষ থেকে অসম উন্নতি বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য জনিত সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে উদাসীনতা আন্দোলনকারীদের পৃথক রাজ্য গঠনের দাবিকে উৎসাহিত করে। ১৯৫০-এর দশক থেকে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবিতে আন্দোলন হয়েছে। A. K. Singh তাঁর *Federal Perspective, Constitutional Logic and Reorganisation of States' (2009) গ্রন্থে লেখেন, 'There are more than thirty statehood and autonomy movements in India.*

এক বা একাধিক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিশেষ অঞ্চলে স্বশাসন ও স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজ্য গঠনের আন্দোলনের দাবির ক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল। স্বশাসনের দাবিতে আন্দোলন বলতে বোঝায় যখন কোনো বিশেষ অঞ্চলের জনগণ নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রত্যাশায় আন্দোলন পরিচালনা করে। আন্দোলনগুলি ঐতিহ্য, স্থানীয় বা আঞ্চলিক সত্তা টিকিয়ে রাখার জন্য সচেষ্ট হয় এবং এই কারণে স্থানীয় এবং আঞ্চলিক নেতৃত্ব প্রশাসনের নিকট এই মর্মে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, সংরক্ষণ এবং অধিকার দাবি করে। স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ধারণা এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। স্বশাসন এবং স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের আন্দোলনের বিভিন্ন দিক উপলব্ধির জন্য কয়েকটি আন্দোলন যেমন ঝাড়খণ্ড আন্দোলন, উত্তরাখণ্ড আন্দোলন, ছত্তিশগড় আন্দোলন এবং নাগা আন্দোলনের প্রকৃতি আলোচনা করা যেতে পারে।

৮.৩ ঝাড়খণ্ড আন্দোলন

দক্ষিণ বিহারের জেলাগুলি নিয়ে ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হয়েছে। দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে এই রাজ্যের গঠন সম্ভব হয়েছে। এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠী, প্রধানত আদিবাসী, যারা বঞ্চনার শিকার হয়ে নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন করেছে। তাদের বিশ্বাস ছিল নূতন রাজ্য গঠিত হলে তারা তাদের প্রাপ্য মর্যাদা লাভ করবে। স্বশাসন তাদের ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ দেবে।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ছোটনাগপুর 'উন্নতি সমাজ' নামে একটি সংগঠন ছোটনাগপুর অঞ্চলের অবহেলিত জনগণের উন্নয়নের জন্য গড়ে ওঠে। এই সংগঠনের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের সূচনা এই সময় থেকেই শুরু হয়। ঝাড়খণ্ড আন্দোলন জয়পাল সিং-এর নেতৃত্বে শক্তি সঞ্চয় করে। জয়পাল সিং ছিলেন নিজে একজন আদিবাসী। তিনি ছিলেন দক্ষিণ বিহারের ছোটোনাগপুরে মুণ্ডা উপজাতির মানুষ। তিনি আদিবাসীদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলি ভারতীয় উপমহাদেশের আদিমতম বাসিন্দা ; সে কারণেই তারা আদিবাসী—এ ধরনের প্রচার করেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'আদিবাসী মহাসভা' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠন বিহারের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে বিহার থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের দাবি তোলে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর সংবিধান সভায় জয়পাল সিং বলেন 'বিগত ৬০০০ বছর ধরে আদিবাসীরা এখানে অবহেলিত, 'একজন জংলি' হিসাবে, 'একজন আদিবাসী' হিসাবে। তিনি আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার বিষয়ে সংবিধান সভায় সদস্যদের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন।

ভারতীয় সংবিধানের ৪৬নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল যে রাষ্ট্র আদিবাসীদের অর্থনৈতিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখবে, তাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেবে এবং আদিবাসীরা যাতে সামাজিক ন্যায় বিচার পায় সে বিষয়ে

নজর দেবে। কিন্তু স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের মূল স্রোত থেকে আদিবাসী সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর পরিণতি হিসাবে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি বলিষ্ঠ আকার ধারণ করে। জয়পাল সিং-এর নেতৃত্বাধীন 'আদিবাসী মহাসভা' ঝাড়খণ্ড দল হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। ঝাড়খণ্ড দলের দাবি ছিল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেই স্বশাসন প্রতিষ্ঠা। এই দল চেয়েছিল যে সব অঞ্চলে আদিবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে সব অঞ্চল নিয়ে আদিবাসীদের জন্য পৃথক একটি রাজ্য গঠন। এই রাজ্যের জন্য বিশেষ আইন এবং প্রচলিত নিয়মকানুন রাজ্যের আদিবাসীদের অধিকার সুরক্ষিত রাখবে। ১৯৫০ এর দশকে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার দাবিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে জয়পাল সিং নিজেকে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কংগ্রেসে যোগ দিলে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

১৯৭০-এর দশকে এই আন্দোলন নতুন উদ্যমে শুরু হয়। এই সময় শিবু সোরেন নামে এক যুবক ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। শিবু সোরেন-এর নেতৃত্বে গঠিত হয় 'ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা'। এই সংগঠন আদিবাসীদের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে যেখানে আদিবাসী সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক ঐক্য সম্পূর্ণভাবে বজায় থাকবে। ঝাড়খাণ্ড মুক্তি মোর্চা ভূমি সংস্কারের দাবিতেও আন্দোলন করে। শিবু সোরেন তাঁর অনুগামীদের বোঝান যে দিকু বা বিদেশিরা কৃষিক্ষেত্রে তাদের ফলানো ফসল আত্মসাৎ করে। এটা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। এই সংগঠন আদিবাসীদের অরণ্যের ওপর অধিকার বজায় রাখার বিষয়েও তৎপর ছিল। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কমপক্ষে ১৫ জন আদিবাসী নিজেদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা গেলে এই ঘটনা ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের দাবিকে আরও শক্তিশালী করে। শেষপর্যন্ত ২০০০ খ্রিস্টাব্দে পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য স্বীকৃতি পায় এবং বিহারের ১৮টি জেলা নিয়ে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হয়।

৮.৪ উত্তরাখণ্ড আন্দোলন

উত্তরাখণ্ড (পূর্বতন নাম উত্তরাঞ্চল) হল ভারতের উত্তরাঞ্চলের একটি রাজ্য। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের হিমালয় ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলি নিয়ে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ২৭তম রাজ্য হিসাবে উত্তরাখণ্ড রাজ্য সৃষ্টি হয়। উত্তরাখণ্ড রাজ্যটি দুটি বিভাগে বিভক্ত। এগুলি হল গাড়োয়াল ও কুমায়ূন বিভাগ। এই দুই বিভাগের অন্তর্গত মোট জেলার সংখ্যা ১০টি। প্রাচীনকাল থেকে এই দুই পার্বত্য এলাকার মধ্যে বিবাদ থাকলেও পৃথক রাজ্য গঠনের দাবিতে এই দুই অঞ্চল ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে যোগ দেয়।

উত্তরাখণ্ড রাজ্য গঠনের কারণ হিসাবে এই অঞ্চলের উন্নয়ন এবং বেকারি সমস্যা বা কাজের সুযোগের অভাবকে দায়ী করা হয়েছে। এছাড়া উত্তরপ্রদেশের এই অংশের জনগণকে রাজধানী শহরে

আসার জন্য অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হত, সমস্ত দিক থেকে তারা অবহেলিত, এই ধারণা তাদের ছিল। নূতন রাজ্য গঠিত হলে এই বনাঞ্চল পার্বত্য এলাকার অবহেলিত মানুষ উন্নয়নের সুযোগ পাবে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে এই এলাকার জনগণ স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় এই ভেবে যে নূতন রাজ্যে অনুন্নয়নের সমস্যা দূরীভূত হবে এবং এর ফলে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, দারিদ্রর অবসান ঘটবে। উত্তরাখণ্ড রাজ্য গঠনের আন্দোলন শুরু হয় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে 'উত্তরাখণ্ড রাজ্য পরিষদ' গঠনের পর এই অঞ্চলের জনগণ উত্তরাখণ্ড রাজ্য পরিষদের অধীনে স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবিতে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে জুলাই 'উত্তরাখণ্ড ক্রান্তি দলের' প্রতিষ্ঠা হলে এই আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ছাত্ররা অংশ নিলে স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবিতে এই আন্দোলন এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। উত্তরাখণ্ড ক্রান্তি দল আমরণ অনশন শুরু করে এবং সরকারি কর্মচারীরা ধর্মঘটে যোগ দেয়। তিন মাস ধরে একনাগাড়ে এই ধর্মঘট চলার ফলে শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। উত্তরপ্রদেশের সমসাময়িক মুখ্যমন্ত্রী মূলায়ম সিং যাদব স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের বিরোধী ছিলেন। রাজ্য সরকার এই আন্দোলন দমন করার জন্য সচেষ্ট হয়। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বরে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ খতিমা (Khatima) অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর গুলি বর্ষণ করে। নিরস্ত্র জনতার ওপর পুলিশের অত্যাচার এবং গুলি বর্ষণের ফলে আন্দোলনকারীদের মধ্যে অনেকেই নিহত হন। ফলে আন্দোলন আরও বলিষ্ঠ রূপ নেয়। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ২ অক্টোবর আন্দোলনকারীদের একটি সংগঠন 'সংযুক্ত মোর্চা' দিল্লীতে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার 'উত্তরাঞ্চল বিল' পাশ করে। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার নূতন রাজ্য হিসাবে উত্তরাঞ্চল রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে উত্তরাঞ্চলের নাম পরিবর্তিত হয়ে 'উত্তরাখণ্ড' নামকরণ করা হয়।

৮.৫ ছত্তিশগড় আন্দোলন

২০০০ খ্রিস্টাব্দে ১ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশের ১৬টি জেলা নিয়ে ছত্তিশগড় রাজ্য গঠিত হয়। মধ্যপ্রদেশের এই অঞ্চলটি ছিল অবহেলিত, মধ্যপ্রদেশের অপর অঞ্চলটির দ্বারা শুধু নয়, কেন্দ্র দ্বারাও শোষিত হত। এই অঞ্চলের অরণ্যভূমি, খনিজ সম্পদ, সবই ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে।

১৯২০-র দশক থেকেই এই অঞ্চলের জনগণ পৃথক রাজ্যের দাবি তোলে। তবে কিছু বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদ, মিছিল, আলোচনা ইত্যাদি ছাড়া ১৯৯০-এর দশকের আগে পর্যন্ত আন্দোলন সংগঠিত রূপ নেয়নি। এই পর্বে 'ছত্তিশগড় রাজ্য নির্মাণ মঞ্চ' ছত্তিশগড় আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। সমস্ত বর্ণ এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবিতে সোচ্চার হয়। শেষ পর্যন্ত ২০০০ খ্রিস্টাব্দে Madhya Pradesh Reorganization Act পাশের মধ্য দিয়ে নূতন রাজ্য হিসাবে ছত্তিশগড় রাজ্য স্বীকৃতি লাভ করে।

৮.৬ নাগা আন্দোলন

উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগা জনজাতির মানুষ দাবি করেছিলেন যে তাঁরা ভারতীয় মূলস্রোতের সম্পূর্ণ বাইরে গিয়ে একটি পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। উত্তর-পূর্ব ভারতে নাগারা ছাড়াও খাসি, গারো, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি জনজাতির বাস। অসমের সমতল প্রদেশে আছেন অসমিয়া ভাষাভাষী বেশ কিছু হিন্দু। ঔপনিবেশিক ভারতে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উন্নতির বিষয়ে শাসকরা ছিলেন উদাসীন।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে নাগাদের বিষয়টি ভারত ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হতে শুরু করে। একদল শিক্ষিত নাগা খ্রিস্টান 'Naga National Council' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন। এই সংগঠন *The Naga Nation* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। এই পত্রিকায় নাগা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি ঘোষিত হয়। নাগারা সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের দাবি করেন, যে রাষ্ট্রের সরকার নাগাদের দ্বারা নির্বাচিত হবে এবং তা নাগাদের দ্বারা পরিচালিত হবে। নাগা জাতীয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সাখরির দেওয়া একটি চিঠির উত্তরে জওহরলাল নেহেরু ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে লেখেন, নাগাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। তবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে তাদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রজন্মের র‍্যাডিকাল নেতারা স্বাধীন নাগাল্যাণ্ডের দাবিতে অনড় ছিলেন। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নাগা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে সোচ্চার প্রবক্তা ছিলেন খোনেমাহ্ গ্রামের অঙ্গামি নাগারা। এই অঞ্চলের মানুষের একটি সংগ্রামী ঐতিহ্য ছিল। ১৮৭৯-৮০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তাঁরা ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা 'জনগণের স্বাধীনতা লিগ' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন এবং এই সংগঠনের মাধ্যমে তাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে প্রচার চালায়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হলেও নাগাদের সমস্যার সমাধান হয়নি। নাগাদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন অঙ্গামি জাপু ফিজো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফিজো নাগা জাতীয় পরিষদে যোগ দেন। তিনি ও তাঁর সহযোগীরা নাগা স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হন। এক বিরাট সংখ্যক নাগা একটি স্বাধীন নাগা রাষ্ট্র গঠনের স্বপক্ষে ফিজোর নেতৃত্ব মেনে নেন। ভারত সরকার নাগাদের স্বাতন্ত্র রক্ষার বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দিলেও স্বাধীন নাগা রাষ্ট্রের দাবি স্বীকার করতে রাজি ছিল না। কিন্তু ফিজো ও তাঁর অনুগামীরা স্বাধীন নাগা রাষ্ট্রের দাবিতে অনড় ছিলেন।

নাগা স্বাধীনতার দাবিকে কেন্দ্র করে ভারত-রাষ্ট্র ও নাগাদের মধ্যে এক যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হয়। ঐ বছরে এক সেনা অফিসারের মোটর সাইকেলের আঘাতে কোহিমাতে এক পথচারীর মৃত্যু হয়। জনতা প্রতিবাদ করলে বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর গুলি বর্ষণের ফলে বেশ কয়েকজন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে একজন সম্মানিত বিচারপতি ও একজন নাগা জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই ঘটনা নাগাদের মধ্যে এতটাই ক্ষোভের সঞ্চার করে যে বিপুল সংখ্যক নাগা অধিবাসী

ভারত সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পথ খোলা রাখা অর্থহীন মনে করে। নাগা জাতীয় পরিষদের নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে চরমপন্থীদের হাতে চলে যায়। নাগারা সশস্ত্র আন্দোলনের পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বরে কয়েকজন নাগা বিদ্রোহী 'নাগাল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার' (Federal Government of Nagaland) গঠনের কথা ঘোষণা করেন।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ জুড়ে নাগা জাতীয় পরিষদের অভ্যন্তরে নাগাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিতর্ক চলে। ফিজো স্বাধীন ও সার্বভৌম নাগা রাষ্ট্রের দাবিতে অনড় থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। অপরদিকে ফিজোর অন্যতম সহযোগী সাখরির বিশ্বাস ছিল ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে পরাস্ত করে স্বাধীন নাগা রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হবে না। সাখরি এই মর্মে নাগা অধ্যুষিত পার্বত্য গ্রামগুলিতে প্রচার শুরু করলেন যে নাগাদের হিংসার পথ পরিত্যাগ করে ভারত-রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে সাখরিকে হত্যা করা হয়।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সামরিক বাহিনী এবং নাগা গোরিলাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। নাগা বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার Assam Maintenance of Public Order Regulation Act নামে আইন প্রণয়ন করে। এই আইনের মাধ্যমে আসামের রাজ্যপাল যে কোনো সভা, সমিতি ও মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার অধিকার এবং কোনো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই কোনো ব্যক্তিকে আটক করার অধিকার লাভ করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সশস্ত্র সামরিক বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রণীত হয়। এই আইন নাগা বিদ্রোহী দমন করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এই পরিস্থিতিতে ফিজোর নেতৃত্বাধীন জঙ্গি নাগা গোষ্ঠীর জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী নাগা নেতাদের উদ্যোগে 'Naga People's Convention' নামে একটি সংগঠন তৈরি হয়। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে এই সংগঠন জওহরলাল নেহেরুর নিকট একটি আবেদন পত্র পাঠায়। এই আবেদনপত্রে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে একটি নাগা রাজ্য গঠনের দাবি জানানো হয়। শেষপর্যন্ত ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে নাগাল্যান্ড রাজ্য গঠিত হয়।

নেহেরু আদিবাসী সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করলেও সম্পূর্ণ সফল হননি। তবে স্বাধীন নাগা রাষ্ট্রের সম্ভাবনা বিনষ্ট করে ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে অসম সরকার অহমিয়া ভাষাকে সরকারি ভাষা ঘোষণা করায় পার্বত্য আদিবাসীরা ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়। পার্বত্য অঞ্চলের সমস্ত রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে সর্বদলীয় পার্বত্য নেতাদের সম্মেলন গঠন করে এবং ভারতের মধ্যে স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবিতে ধর্মঘট ও বিক্ষোভে সোচ্চার হয়। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনের পর বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আসাম বিধান সভা বয়কট করে এবং কালক্রমে মেঘালয়, মিজোরাম ইত্যাদি প্রদেশের আবির্ভাব ঘটে।

৮.৭ উপসংহার : আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির উদ্ভব

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় যেখানে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে দল ব্যবস্থার অংশগ্রহণ ঘটে। সমাজ ও গোষ্ঠীগুলির স্বার্থ রক্ষার্থে দলগুলি সক্রিয় ভূমিকা নেয়। ভারতীয় দল ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল অনেক সংখ্যক আঞ্চলিক দলের অস্তিত্ব। আঞ্চলিক দল বলতে বোঝায় যখন একটি দল সাধারণভাবে একটি সীমিত ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে তার কাজকর্ম পরিচালনা করে এবং তার ক্রিয়াকলাপ এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। জাতীয় দলগুলির বৃহৎ পরিসরে এবং নানা ক্ষেত্রে ক্রিয়াকলাপ সম্প্রসারিত হলেও আঞ্চলিক দলগুলির একটি নির্দিষ্ট এলাকায় ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ থাকে। এখানে এলাকার সমস্যাগুলি প্রাধান্য পায়। ভারতবর্ষে জাতীয় স্তরে দলগুলির থেকে আঞ্চলিক দলগুলির সংখ্যা অনেক বেশি এবং কয়েকটি রাজ্য আঞ্চলিক দলগুলির দ্বারা শাসিত।

তবে আঞ্চলিক দলগুলির ক্রিয়াকলাপ নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বা তাদের লক্ষ্য সীমিত পরিসরে আবদ্ধ থাকলেও দলগুলি রাজ্য এবং জাতীয় রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি অনেক রাজ্যে সরকার গঠন করেছে এবং তাদের নীতি ও পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হয়েছে। যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি কয়েকটি রাজ্যে সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়েছে তাদের মধ্যে ছিল তামিলনাড়ুতে DMK এবং ADMK, জম্মু এবং কাশ্মীরে National Conference, অন্ধ্রপ্রদেশে Telegu Desam, আসামে Asom Gana Parishad, গোয়ায় Maharashtrawadi Gomantak Party, মিজোরাম-এ Mizo National Front, সিকিমে Sikkim Sangram Parishad, মেঘালয়-এ All Party Hill Leaders Conference এবং হরিয়ানায় Indian National Lok Dal (INLD) প্রভৃতি। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর কয়েকটি রাজ্যে আঞ্চলিক দলের সহায়তায় জোট-সরকার ক্ষমতায় এসেছিল। একই ভাবে কেন্দ্রে ও পরবর্তীকালে আঞ্চলিক দলগুলি কংগ্রেস সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে আঞ্চলিক দল DMK ইন্দিরা গান্ধি সরকারকে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার জন্য সমর্থন করেছিল। আঞ্চলিক দলগুলির প্রতিনিধিরা তাদের নিজেদের এলাকার সমস্যাগুলির প্রতি পার্লামেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সরকারের নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে। সর্বোপরি আঞ্চলিক দলগুলি জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় ফলে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি আঞ্চলিক সমস্যার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করতে পারে না। আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান কল্পে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। এইভাবে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি শুধুমাত্র আঞ্চলিক রাজনীতির ওপর নয়, জাতীয় রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে

সক্ষম হয়। ভারতীয় গণতন্ত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দলগুলির অবদান অনস্বীকার্য।

৮.৮ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবিতে আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।

২। কীভাবে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হয়েছিল?

৩। কীভাবে উত্তরাখণ্ড রাজ্য গঠিত হয়েছিল?

৪। কীভাবে নাগাল্যান্ড রাজ্য গঠিত হয়েছিল? এই রাজ্য গঠনের পেছনে ফিজো-র ভূমিকা আলোচনা করুন।

৫। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির ওপর একটি টীকা লিখুন।

৮.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। Richard L. Park and Bueno De Mesquita — *Indian Political System*, Prentice Hall, 1979.

২। Ruchi Tyagi — 'Role of Regional Political Parties in India', *Journal South Asian Politics,* July, 2016.

৩। A. K. Sen — *Development as Freedom*, Oxford, New Delhi, 2001.

৪। Bombwall K. R. — *The Foundations of Indian Federation,* Bombay, 1967.

একক ৯ ❑ ভারতীয় গণতন্ত্রে জাতি

গঠন

৯.০ উদ্দেশ্য

৯.১ ভূমিকা

৯.২ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় জাতি-বর্ণ

৯.৩ ঔপনিবেশিক আমল : জাতি, বর্ণ ও রাজনীতি

৯.৪ ঔপনিবেশিক-পরবর্তী পর্যায় : জাতি-বর্ণ ও রাজনীতি

৯.৫ উপসংহার : দলিত পরিচিতি

৯.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় জাতি-বর্ণের অবস্থান কী ছিল।
- সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।
- ঔপনিবেশিক শাসকরা অস্পৃশ্যদের পক্ষে 'সুরক্ষামূলক বৈষম্যের' বিশেষ নীতি গ্রহণ করে।
- স্বাধীন ভারতে সাংবিধানিক আইনে জাতিভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ হয়েছে।
- ভারতীয় রাজনীতিতে বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে ১৯৮০-র দশক থেকে নিম্ন ও মধ্য জাতিগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।
- আধুনিক রাজনীতিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা জাতি বিলুপ্তির পরিবর্তে জাতিগত পরিচিতির উপর ক্রমবর্দ্ধমান নির্ভরতা সামাজিক বিভাজনকে টিকিয়ে রেখেছে কিনা এই প্রশ্ন।

৯.১ ভূমিকা

হিন্দু ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত জাতি ব্যবস্থা ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করে। স্তর বিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থায় জাতপাতের উচ্চ-নীচ সামাজিক অবস্থান সাম্য ও গণতান্ত্রিক চেতনার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতার ধারণা জাতি ব্যবস্থার আদর্শগত ভিত্তি। ভারতীয় সমাজে একেবারে নীচে অস্পৃশ্য জাতিরা অতিশূদ্র, দলিত এবং বর্তমানে আইনি পরিভাষায় তপশিলি জাতি হিসাবে পরিচিতি। আইনত নিষিদ্ধ হলেও তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিভুক্ত মানুষকে নানা ধরনের অমানবিক আচরণের শিকার হতে হয়। ঔপনিবেশিক সরকার নিপীড়িতদের পক্ষে 'সুরক্ষামূলক বৈষম্যের' বিশেষ নীতি গ্রহণ করেছে। স্বাধীন ভারতের সাংবিধানিক আইনে জাতিভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্র ভোটার তথা সংখ্যার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এবং জাতপাত পরিচিতি গোষ্ঠীগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নিজ নিজ জাতভিত্তিক ভোট ব্যাঙ্ক গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়। ১৯৭০-এর দশক থেকে অনেক পিছিয়ে পড়া জাতি শক্তিশালী ভোট ব্যাঙ্কের সুবাদে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অনেকাংশে সক্ষম হয়েছে। তবে জাতিভিত্তিক রাজনীতি বা জাতির সঙ্গে রাজনীতির ঘনিষ্ট সম্পর্কের বিষয়টি গণতন্ত্রের নিকট একটি বড় চ্যালেঞ্জ। রাজনীতি জাতির উর্দ্ধে থাকা সমীচীন এবং রাজনীতিবিদদের জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনে সংকীর্ণ স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে কাজ করা প্রয়োজন বলে সমাজবিজ্ঞানীদের একাংশ মনে করেন।

স্তরবিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থায় নিম্ন গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পেলেও আম্বেদকর যে আদর্শনিষ্ঠ সমাজের কথা ভেবেছিলেন সেখানে দলিতরা তাদের অবহেলিত অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে। আম্বেদকরের পরে কাঁসিরাম 'বহুজন সমাজ পার্টি' গঠন করে দলিতদের সামনের সারিতে এনেছিলেন এবং মানসিকভাবে কিছুটা হলেও দলিতরা হীনমন্যতা থেকে মুক্তির আস্বাদ লাভে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু নিম্নবর্গীয় এই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের আন্দোলন ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে নিজস্ব রাজনৈতিক সত্তা বা কোনো পৃথক রাজনৈতিক দর্শন গড়ে তুলতে পারেনি বলে কেউ কেউ মনে করেন। আধুনিক রাজনীতিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা জাতি বিলুপ্তির পরিবর্তে জাতিগত পরিচিতির ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা সামাজিক বিভাজনকে টিকিয়ে রেখেছে বলে গবেষকদের একাংশ মনে করেন।

৯.২ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় জাতি-বর্ণ

নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক ঐতিহাসিকদের মতে বর্ণ ও জাতি এই দুটি সমান্তরাল ধারণাই হল ভারতীয় সামাজিক সংগঠনের অভিনব বৈশিষ্ট্য। মূলত হিন্দু ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যবস্থা ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করে। জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা একটি বিচিত্র স্তর বিন্যাস যার উপর নির্ভর করে জাতপাতের গোষ্ঠীগুলির উচ্চ-নীচ সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হয়, সাম্য ও গণতান্ত্রিক চেতনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিভক্ত জাতি-আনুগত্য নেশন গঠনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পরিচিতি বলতে জাতি গোষ্ঠীর পরিচিতিকে প্রাধান্য পেতে দেখা যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজের অস্তিত্বকে বজায় রেখে চলেছে।

প্রথা অনুসারে ভারতীয় সমাজ চারটি বর্ণে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বিভক্ত হলেও চারটি বর্ণ নয়, বাস্তব ক্ষেত্রে কয়েক শত জাতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। বাস্তব ক্ষেত্রে জাতির অস্তিত্ব চোখে পড়ে,

চতুবর্ণের নয়। তবে, বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তত্ত্বগতভাবে অনেক সাদৃশ্য থাকায় জাতি ও বর্ণকে অনেকটা সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। জাতিসমূহের অস্তিত্ব অনেকটা আঞ্চলিকভাবে নির্দিষ্ট। একটি অঞ্চলে যে নামে একটি জাতিকে পাওয়া যায়, অন্য অঞ্চলে নাও পাওয়া যেতে পারে।

বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর ক্রমোচ্চ বিন্যাসে জাতপাত ব্যবস্থার গঠন। উচ্চতম জাতি ব্রাহ্মণের অবস্থান শীর্ষে এবং একেবারে নিচুতে আছে একাধিক তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতি। খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে কোনো এক সময়ে সমাজে অস্পৃশ্যতা বিকশিত হলে অস্পৃশ্যদের নানা নামে ডাকা হত : পঞ্চমজাতি, অতিশূদ্র, বা চণ্ডাল। এই দুই-জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে ধাপে ধাপে সাজানো আরও বহু জাতি গোষ্ঠী আছে। পেশাভিত্তিক গোষ্ঠী হিসাবে জাতির আবির্ভাব, বর্ণের পাশাপাশি ঘটেছিল। পেশাভিত্তিক বিশেষীকরণের ভিত্তিতে জাতির মধ্যে আবার উপবিভাগ সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো নৃতাত্ত্বিক এদেরকে বলেন উপজাতি। উল্লেখ্য, 'শুদ্ধতা' এবং 'অশুদ্ধতা'-র ধারণা জাতি ব্যবস্থার আদর্শগত ভিত্তি। এর উপর ভিত্তি করে সমাজে উঁচু এবং নিচু জাতির বিন্যাস হয়। ব্রাহ্মণদের সব থেকে শুদ্ধ মনে করা হয় এবং তার নীচে যে জাতিগুলি আছে তারা ক্রমান্বয়ে কম শুদ্ধ বা অ-পবিত্র বলা হয়। সমাজে একেবারে নীচে অস্পৃশ্য জাতিরা অতিশূদ্র, দলিত এবং বর্তমানে আইনি পরিভাষায় তপশিলি জাতি হিসাবে পরিচিত। আইনত নিষিদ্ধ হলেও তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিভুক্ত মানুষকে নানা ধরনের অমানবিক আচরণের শিকার হতে হয়।

৯.৩ ঔপনিবেশিক আমল : জাতি, বর্ণ ও রাজনীতি

ঔপনিবেশিক শাসন ঔপনিবেশিক পর্বের পূর্বেকার রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে জাতিভেদ প্রথাকে বিচ্ছিন্ন করে এবং নূতন জ্ঞান, প্রতিষ্ঠান ও নীতির আলোকে এই প্রথাটিকে পুনরায় ব্যাখ্যা করে এর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয়। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম দিকে অনহস্তক্ষেপের নীতির পর্যায়ে নানা রকম সুযোগ সৃষ্টি করা হয় যেগুলি তত্ত্বগতভাবে জাতিভেদ প্রথা মুক্ত। জমি বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত হয়, আইনের চোখে সমতা বিচার-বিভাগীয় প্রশাসনের প্রতিষ্ঠিত নীতি হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মেধাবীদের কাছে অবারিত করা হয়। উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের গোড়ায় মহীশুর বা কোলহাপুরের মতো দেশীয় রাজ্যগুলি প্রথম সরকারি চাকরিক্ষেত্রের কিছু অংশ জাতিভিত্তিতে সংরক্ষিত করে। উদ্দেশ্য ছিল, জন্মসূত্রে অব্রাহ্মণ মানুষদের অতীতে যেসব ক্ষতি হয়েছে সেগুলিকে পূরণ করা। ঔপনিবেশিক শাসকরাও উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের এবং অন্যান্যদের মধ্যে বিশেষ করে অস্পৃশ্যদের যাদেরকে 'নিপীড়িত শ্রেণি' বলে বর্ণনা করা হতো, ব্যবধান খুঁজে পান। নিপীড়িতদের পক্ষে সরকার 'সুরক্ষামূলক বৈষম্যের' বিশেষ নীতি গ্রহণ করে। অর্থাৎ এদের শিক্ষার জন্য সরকার বিশেষ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করে, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে এদের মতো প্রার্থীদের জন্য আসন সংরক্ষিত করে এবং সর্বোপরি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের সংস্কারবিধিতে মনোনয়নের মাধ্যমে এবং পরে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সাম্প্রদায়িক

পৃথক নির্বাচনের কথা ঘোষণা করে সরকার আইনসভায় নিপীড়িত শ্রেণির বিশেষ প্রতিনিধিত্বেরও ব্যবস্থা করে।

সামাজিক মর্যাদার নতুন নতুন উৎসের তাৎপর্য সম্বন্ধে উপলব্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন শিক্ষা, চাকরি, প্রতিনিধিত্ব এবং ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্গীয়রা যে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখত সে বিষয়ে চেতনা বৃদ্ধি। এর ফলে আরও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও সংরক্ষণের দাবি ওঠে। অস্পৃশ্যতা ও জাতিগত প্রশ্নে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কংগ্রেস রাজনীতি থেকে দলিতরা দূরে সরে যেতে থাকে। গান্ধিজি অস্পশ্যতাকে নিন্দা করলেও এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশ আন্দোলন এবং আত্মবলিদানকারী গৃহভৃত্য ঝাড়ুদার 'ভাঙ্গী'-র আদর্শায়ন অস্পৃশ্যতার 'আর্থিক ও রাজনৈতিক মূলে' কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি বলে ভিখু পারেখ মনে করেন। দলিত নেতারা মনে করেন যে তাদের উপযুক্ত পরিমাণে আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার করা হলে দরজা নিজে থেকেই খুলে যাবে। গান্ধিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে আম্বেদকরের মতো দলিত নেতারা সন্তুষ্ট হয়নি যাঁরা শিক্ষা, চাকরি ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে সমাধান চেয়েছিলেন। দলিতদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক সত্তার দাবির বিষয়টি দলিত রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে দলিতদের পৃথক নির্বাচনের বিষয়টি নিয়ে গান্ধির সঙ্গে আম্বেদকরের মতবিরোধ হয়। মতপার্থক্য থেকে যায় যখন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে অস্পৃশ্যদের—যারা তপশিলি জাতি নামে পরিচিত হয়, তাদের জন্য পৃথক নির্বাচনের অধিকারকে স্বীকার করা হয়। পুনা চুক্তি অনুযায়ী যৌথ নির্বাচনী ব্যবস্থায় তপশিলি জাতির জন্য ১৫১টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। পুনাচুক্তির বিভিন্ন ব্যবস্থা পরবর্তীকালে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে আম্বেদকর ইনডিপেনডেন্ট লেবার পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র ও অস্পৃশ্যদের জাতি অপেক্ষা বৃহত্তর কর্মসূচিতে শ্রমিক শ্রেণির মঙ্গল সাধনে সমাবিষ্ট করা। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে আম্বেদকরের দল বিপুল ভোটে বোম্বাইতে জয়লাভ করে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ১৮-২০ জুলাই নাগপুরে এক সম্মেলনে আম্বেদকর সর্বভারতীয় তপশিলি সংগঠন (All India Scheduled Caste Federation) শুরু করেন এবং দাবি করেন দলিতরা হিন্দুদের থেকে আলাদা ও বিশিষ্ট হবে।

দলিতদের আত্মজাগরণ বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। দলিতদের রাজনীতি কংগ্রেস ১৯৪০-এর দশকের শেষ দিকে আত্মসাৎ করে নেয়। তপশিলি সম্প্রদায়ের সংগঠনের সুযোগ, সম্পদ বা সময় ছিল না যা দিয়ে কংগ্রেসের মতো একটি গণসংগঠন গড়ে তুলতে পারত। শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটি দলিত নেতৃত্বের কাছে কোনো রকম পরিকল্পনা করার সুযোগ রাখেনি। এই পরিস্থিতিতে দলিতরা বাধ্য হয় কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে কংগ্রেস দলিতদের প্রতিবাদকে আত্মস্থ করতে উদ্যোগী হয় সাংবিধানিক সভায় আম্বেদকরকে মনোনয়ন দিয়ে এবং তাঁকে সংবিধানের খসড়া রচনা সভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে।

৯.৪ ঔপনিবেশ-পরবর্তী পর্যায় : জাতি, বর্ণ ও রাজনীতি

স্বাধীন ভারতের সাংবিধানিক আইনে জাতিভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ হয়েছে। সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকদের সমানভাবে প্রাপ্য। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার স্বীকৃত এবং নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ারও অধিকার আছে। ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সামাজিক ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা। স্বাধীনতার সময় তপশিলি জাতি বলতে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া, নির্ভরশীল, রাজনৈতিক ক্ষমতাহীন, সাংস্কৃতিক দিক থেকে অবহেলিত মানুষদের বোঝাত, ভারতীয় সংবিধানে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে ৪৬নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাজ্যগুলি তপশিলি জাতি, উপজাতিদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি দেবে। সব রকমের সামাজিক অন্যায় এবং শোষণ থেকে রক্ষা করবে। ৩৩০নং অনুচ্ছেদে লোকসভায় তপশিলি জাতি, উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণ করবে এবং ৩৩২নং অনুচ্ছেদে এদের জন্য বিধান সভায় আসন সংরক্ষিত হবে।

ভারতীয় রাজনীতি সামাজিক, ধর্মীয় এবং ভৌগোলিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় এবং এক্ষেত্রে জাত-পাতের রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নির্বাচনে প্রার্থীর সুবিধালাভের জন্য জাতিকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা হয়। একদিকে জাতিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক বিন্যাস ধরে রাখার প্রয়াস, অপর দিকে নিম্নবর্ণের জাতিগুলির পক্ষ থেকে তা পরিবর্তন করার বা চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা। এই আর্থ-সামাজিক লড়াই-এর অনেকটাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। সংসদীয় গণতন্ত্র ভোটার তথা সংখ্যার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এবং জাত-পাত পরিচিতি গোষ্ঠীগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হওয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নিজ নিজ জাতিভিত্তিক ভোট ব্যাঙ্ক গড়ে তোলায় সচেষ্ট থাকে। বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থী মনোনয়নের সময় ভোটারদের জাতিগত অবস্থান প্রার্থীর জাতিগত পরিচয়ের উপর প্রভাব ফেলে।

১৯৫০-এর দশক থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা উচ্চবর্গের হিন্দুদের হাত থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে স্থানান্তরিত হয়েছে। ১৯৭০ এর দশক থেকে অনেক পিছিয়ে পড়া জাতি শক্তিশালী ভোট ব্যাঙ্ক-এর সুবাদে অর্থনৈতিক দিকে থেকে উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। কয়েকটি বৃহৎ সংগঠিত পিছিয়ে পড়া জাতির মধ্যে ছিল উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের যাদব, হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবে জাঠ, মহারাষ্ট্রে মারাঠী, কর্ণাটকে ভক্কালিগা এবং তামিলনাড়ুতে গণ্ডার্স প্রভৃতি। ভোটাধিকার তাদের সংখ্যার গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। সামাজিক কাঠামোয় নীচের দিকে থাকা মানুষ তাদের সংখ্যাগত কারণে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেয়েছে। অনেক রাজনৈতিক দল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জাতিভিত্তিক।

ভারতের রাজনীতিতে বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে ১৯৮০-র দশক থেকে নিম্ন ও মধ্য জাতিগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৯০-এর দশক থেকে এটি আরও স্পষ্ট হয়। উত্তর প্রদেশে 'সমাজবাদী পার্টি' যাদব পার্টি নামে পরিচিত। 'বহুজন সমাজ পার্টি' দলিতদের দল হিসাবে পরিচিত। মহারাষ্ট্রের 'শিবসেনা' মারাঠাদের দল নাম পরিচিত। লালুপ্রসাদ যাদব, মুলায়ম সিংহ, নীতিশ কুমারের মত মধ্য জাতিভুক্ত নেতার

পাশাপাশি ভারতীয় রাজনীতিতে দলিত নেত্রী মায়াবতীর উত্থান ঘটেছে। নিম্ন, অবদমিত জাতির অবস্থান ক্রমেই এক ধরনের স্বাভিমান ও পরিচিতির ভিত্তি হয়ে উঠেছে। নিজেদের জাতির ঐতিহ্য নেতা-নেত্রীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে এবং এই পরিচিতি তাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে সংগঠিত হতে সাহায্য করেছে।

তবে জাতিভিত্তিক রাজনীতি বা জাতির সঙ্গে রাজনীতির এই ঘনিষ্ট সম্পর্কের বিষয়টি গণতন্ত্রের নিকট একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ভারতে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে, তা মূলত সাম্য, স্বাধীনতা এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রীয় রাজনীতি জাতির উর্দ্ধে থাকা সমীচীন। জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সংকীর্ণ স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সর্বসাধারণের উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করা সমীচীন। সমাজের ভিত্তি হওয়া উচিত সাম্য ও সমান মর্যাদা।

৯.৫ উপসংহার : দলিত পরিচিতি

স্তরবিন্যস্ত সমাজব্যবস্থায় একেবারে নিম্নগোষ্ঠীভুক্ত মানুষ দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে অবহেলিত জাতি হিসেবে তাদের সামাজিক পরিচিতি হয় দলিত হিসাবে কিন্তু সময়ের সঙ্গে এই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। জাতিগত বিষয়টি হিন্দু ধর্মের অভ্যন্তরীণ বিষয় মনে করা হত, হিন্দু ধর্মের মধ্যেই এর পরিবর্তন সাধন সম্ভব। আম্বেদকর একটি আদর্শনিষ্ঠ, উদারনৈতিক সমাজের কল্পনা করেছিলেন যে সমাজ হবে অত্যাচার, নিপীড়ন এবং শোষণমুক্ত। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ১৫ অক্টোবর আম্বেদকর বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। এই ধর্মান্তর গ্রহণকে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিরোধীতার নজির হিসাবে ধরা হয়। তিনি বৌদ্ধধর্মকে পুনর্ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই ধর্মের প্রগতিশীল বক্তব্যগুলিকে তুলে ধরেন যাতে ভারতীয় সমাজে ধর্মের যে নৈতিক ভূমিকার কথা তিনি ভেবেছিলেন তার অনুগামী হয়ে উঠতে পারে। এই কারণেই বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে আম্বেদকরের ধ্যানধারণাকে দলিতরা জগৎ সম্বন্ধে নতুন ধারণার ভিত্তি মনে করে এবং তারা মনে করে যে আম্বেদকরের সামাজিক রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল সমাজের ক্ষমতার কাঠামোর ও প্রভাবশালী ধর্মীয় ঘরানাগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী।

আম্বেদকারের কল্পিত সমাজব্যবস্থায় দলিতরা তাদের অবহেলিত অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন সংস্কৃতির ধারক-বাহক হবে, সমাজে দলিতদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্যাপক অর্থে আম্বেদকরের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক বিপ্লব ঘটানো যেখানে জাতি নামক প্রতিষ্ঠানটির বিলুপ্তি ঘটবে, সমাজে অস্পৃশ্যের নতুন নামকরণ হবে না, সাম্যের মূল্য সকলের নিকট পৌঁছবে। তাঁর আশা ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠিত হবে, হিংসা, শোষণ, বঞ্চনার পরিবর্তে সমাজে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে।

আম্বেদকরের পরে দলিত মুক্তি আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন কাঁসিরাম যিনি 'বহুজন সমাজ পার্টি' গঠন করে জাতীয় স্তরে রাজনীতিতে দলিতদের সামনে এনেছিলেন। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে বহুজন সমাজ পার্টি উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় আসে। সামাজিক দিক থেকে দলিতদের একটি নতুন ধর্মীয় পরিচিতি গড়ে ওঠে। মানসিকভাবে কিছুটা হলেও হীনমন্যতা থেকে মুক্তির আস্বাদ লাভ করে, একধরনের নিজস্ব সত্তা খুঁজে পায়।

তবে এসত্ত্বেও নিম্নবর্গীয় এই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের আন্দোলন একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচিতি সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ সফল হয়নি যেখানে সমস্ত অবহেলিত জাতির আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়িত হবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে নিজস্ব রাজনৈতিক সত্তা বা কোনো পৃথক রাজনৈতিক দর্শন গড়ে তুলতে পারেনি। আধুনিক রাজনীতিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা জাতি বিলুপ্তির পরিবর্তে জাতিগত পরিচিতির উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা সামাজিক বিভাজনকে টিকিয়ে রেখেছে কিনা এই প্রশ্নও উঠেছে। ভবিষ্যতের ভারত এর উত্তর দেবে।

৯.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় জাতি-বর্ণ বলতে কী বোঝায়?

২। ঔপনিবেশিক আমলে তপশিলি জাতির প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল?

৩। অস্পৃশ্যতা এবং জাতিগত প্রশ্নে জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি আম্বেদকর কি সমর্থন করেছিলেন?

৪। ঔপনিবেশিক-পরবর্তীকালে ভারতীয় রাজনীতিতে নিম্ন ও মধ্য জাতিগুলির গুরুত্ব কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল?

৫। দলিত পরিচিতি সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। A. R. Dutta ed. — *Politics in India, Issues, Institutions, Processes*, Arun Prakastan, Guwahati, 2013.

২। Rajani Kothari — *Caste in Indian Politics*, Orient Longman, New Delhi, 1970.

৩। Zoya Hasan ed. — *Parties and Party Politics in India*, New Delhi, 2002.

৪। Zelliot, E — *From Untouchable to Dalit : Essays on Ambedkar Movement*, New Delhi, 2001.

৫। Ram Nandu — *Beyond Ahmedkar : Essays on Dalits in India*, New Delhi, 1995.

৬। রূপ কুমার বর্মণ—*জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক : পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান*, কলকাতা, ২০১৯।

একক ১০ ❑ ভারতীয় গণতন্ত্রে ধর্ম: স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

গঠন

১০.০ উদ্দেশ্য

১০.১ ভূমিকা

১০.২ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

১০.৩ স্বাধীন ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

১০.৪ স্বাধীনতা-উত্তরকালে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

১০.৫ উপসংহার

১০.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১০.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বরূপ, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ধরন কেমন ছিল।
- ভারতবাসী এক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করে এক আধুনিক যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান-নির্ভর রাষ্ট্র গঠন করার সিদ্ধান্ত করা সত্ত্বেও পারস্পরিক অবিশ্বাস, ঘৃণা ও বিচ্ছিন্ন থাকার মানসিকতা শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পরিণত হয়।
- ১৯৬০-এর দশকের সূচনা থেকেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গার ঘটনা ঘটে।
- ১৯৮০-র দশকে 'হিন্দুত্ব' সাম্প্রদায়িকতায় মৌলিক পরিবর্তন এনেছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।

১০.১ ভূমিকা

স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিগত প্রায় ছয় দশক কালের প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রশ্নটি বিচার করে দেখা যায় যে এই সম্পর্ক খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি। পারস্পরিক অবিশ্বাস, ঘৃণা ও বিচ্ছিন্ন থাকার

মানসিকতা যা শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষে পরিণত হয়েছিল, তার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। নিরাপত্তা, সমতা এবং আত্মপরিচয় সংক্রান্ত প্রশ্নে এক ধরনের অস্থিরতা ছিল। ১৯৬১-৬২ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের সময় থেকে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের বিশেষ অবনতি ঘটে। ধর্মীয় উত্তেজনা এতটাই জটিল আকার ধারণ করে যে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, নিরাপত্তা, উন্নয়নের প্রশ্ন, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের বিষয়কে কেন্দ্র করে, সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০-র দশকে 'হিন্দুত্ব' সাম্প্রদায়িকতায় মৌলিক পরিবর্তন এনেছে বলে সমাজবিজ্ঞানীদের একাংশ মনে করেন।

১০.২ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বলতে বোঝায় জাতিগত অথবা সম্প্রদায়গত রাজনীতি। অর্থাৎ কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের একই ধরনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক স্বার্থ থাকে এবং তা সাধারণভাবে অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের থেকে পৃথক হওয়ার কারণে উদ্ভূত অবিশ্বাস, সন্দেহ সুসম্পর্কের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তুলনামূলকভাবে কম সুবিধাভোগী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, নিরাপত্তা, উন্নয়নের প্রশ্ন, রাজনৈতিক ক্ষমতা, কোনো প্রতিষ্ঠানের উপর ক্ষমতা দখলের বিষয়কে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ হয় এবং এ থেকে জন্ম নেয় ঘৃণা এবং হিংসার যা উদারতা এবং গণতন্ত্র বিরোধী।

বর্তমানে ভারতের মতো আধুনিক, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও বহুত্ববাদী সমাজে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুত্ব সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের গোড়ায় ভারতীয় রাজনীতিতে চরমপন্থার উত্থানের ভাবগত পটভূমিকা তৈরির ক্ষেত্রে হিন্দুত্ববাদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। অমলেশ ত্রিপাঠীর মতন অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে পাঞ্জাবে দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য সমাজ, মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলকের শিবাজী উৎসব বা গণপতি উৎসব জাতীয়তাবাদকে হিন্দুত্বের আবরণে আবৃত করেছিল। বর্তমান ভারতের রাজনীতিতে সংঘ পরিবার সমস্ত হিন্দুকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানাচ্ছে, তার প্রাথমিক প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছিল ভি. ডি. সাভারকর রচিত *Essentials of Hindutva* গ্রন্থে (১৯২২ খ্রিস্টাব্দ)। ১৯৮০-র দশকে হিন্দুত্ব সাম্প্রদায়িকতায় মৌলিক পরিবর্তন এনেছে। এই দশকে সংঘ পরিবার অযোধ্যায় মসজিদের জায়গায় রামমন্দির গঠনের দাবিতে সোচ্চার হয়। নেহেরুর আমলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবক্তা ছিল ভারতীয় জনসংঘ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সঙ্গে ভারতীয় জনসংঘের ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। বিপান চন্দ্র লিখেছেন—জনসংঘ কর্মীরা নীচুস্তরে এবং সংগঠনের নেতারা বক্তৃতা ও পত্রপত্রিকায় লেখার মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ প্রচার করতেন। এই পরিস্থিতিতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পায় এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শক্তিশালী হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, ভারতীয় জনসংঘ বা ভারতীয় জনতা দল নিজেদের প্রকৃত ভারতীয় ও অসাম্প্রদায়িক বলে মনে করে।

১০.৩ স্বাধীন ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ শক্তি ভারতীয় নেতাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ও পাকিস্তান গঠনের পরিণতি ছিল ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর ভারত সরকার ঘোষণা করেছিল যে, ভারত-রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করবে। কিন্তু বাস্তবে তা পূর্ণরূপে হয়নি। হিন্দু ও অ-হিন্দু নাগরিকদের মধ্যে আইনের ক্ষেত্রে বিভাজন আনা হল। শিখ সমেত সমস্ত হিন্দুর জন্য হিন্দু আইন তৈরি হল এবং তা সমরূপ দেওয়ানি বিধি (Uniform Civil Code) নামে পরিচিত হল। কিন্তু মুসলমানদের জন্য পৃথক ব্যক্তিগত আইন (Personal Law) থেকে গেল। দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক আইনের অস্তিত্ব সাম্প্রদায়িক সমস্যার অবসান ঘটাল না।

স্বাধীনতা-উত্তর কালে বিগত প্রায় ছয় দশক কালের প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রশ্নটি বিচার করলে দেখা যায় যে এই সম্পর্ক খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি। পারস্পরিক অবিশ্বাস, ঘৃণা ও বিচ্ছিন্ন থাকার মানসিকতা যা শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষে পরিণত হয়েছিল, তার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। নিরাপত্তা, সমতা এবং আত্মপরিচয় সংক্রান্ত প্রশ্নে এক ধরনের অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল। ভারত বিভাজনের পর যে সমস্ত মুসলমান পাকিস্তানে গিয়েছিলেন তারা ছিলেন সামাজিক, অর্থনৈতিক মর্যাদায় উপরের স্তরের, শিক্ষিত এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব দানের পক্ষে উপযুক্ত। অন্যদিকে যারা ভারতে থেকে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একাংশ ছিলেন কৃষি শ্রমিক, দরিদ্র স্বল্প-শিক্ষিত মুসলমান। ভারতীয় মুসলমানদের একাংশের মধ্যে সৃষ্টি হয় রক্ষণশীল মনোভাব। এইসব সাধারণ মুসলমান যাদের পক্ষে পাকিস্তানে যাওয়া সম্ভব হয়নি, তারা নেতৃত্ববিহীন অবস্থায় স্বাধীনতার পূর্বে ও পরের দাঙ্গা ও লুঠপাঠ জনিত ধনপ্রাণ নাশের আতঙ্কে ভুগেছেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিঃস্ব, অপমানিত, ধর্ষিত হয়ে জলস্রোতের মতো আসা লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখের মনের জ্বালা ও চোখের আগুন এবং উপযুক্ত সংখ্যক আধুনিক মনস্ক মুসলিম নেতার অভাব ভারতীয় সমাজে একধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল বলে মনে হয়।

জওহরলাল নেহেরু ধর্মনিরপেক্ষতার বাতাবরণে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৫০-এর দশকের গোড়ায় অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ক্ষেত্রে কিছু উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের উন্নতি ঘটায়। সর্দার প্যাটেলের মৃত্যু এবং অন্যান্য সহযোগী নেতার প্রস্থানের ফলে জাতীয় কংগ্রেসে নেহেরুর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠ হয়। ভারতীয় জনসংঘ বা ভারতীয় জনতা দল নিজেদের প্রকৃত ভারতীয় ও অসাম্প্রদায়িক বলে মনে করে। জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন না করার ক্ষেত্রে মুসলমানদের কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি ছিল না। সাধারণভাবে নেহেরুর প্রতি এক ধরনের আস্থার মনোভাব তৈরি হয়। সংবিধানে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক উন্নতির দিকটি বিবেচিত হয়েছিল। সংবিধানে ২৫নং অনুচ্ছেদে বলা হয় 'all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion'. এছাড়া ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি হওয়ায় সাম্প্রদায়িক সমস্যার উন্নতি হয়। স্বাধীনতার পর

থেকে দুটি দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দলে দলে চলে যেতে শুরু করেছিল। পূর্ব পাকিস্তানে অ-মুসলিম সম্প্রদায়-এর উপর নির্মম অত্যাচার শুরু হলে সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভারতে বিশেষত পশ্চিমবাংলায় চলে আসে। ফলে দুদেশের মধ্যে বিদ্বেষভাব বৃদ্ধি পায়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ৮ এপ্রিল জওহরলাল নেহেরু এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খাঁ দিল্লিতে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তি 'নেহেরু লিয়াকৎ চুক্তি' অথবা 'দিল্লি চুক্তি' নামে পরিচিত। এই চুক্তিতে স্থির হয় যে দুটি দেশের সংখ্যালঘু নাগরিকগণ নিজ নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখাবে এবং দুটি রাষ্ট্রই সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। নেহেরুর মতে এই চুক্তির ফলে সংখ্যালঘুদের ভীতির মানসিকতা (The psychology of fear) প্রশমিত হবে।

১৯৬১-৬২ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় নির্বাচনের সময় থেকে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। ধর্মীয় উত্তেজনা এতটাই জটিল আকার ধারণ করে যে ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। নেহেরুর কর্মজীবনের শেষ কয়েক বছর ছিল সমস্যা জর্জরিত। চিনের সঙ্গে যুদ্ধ, কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা, ১৯৬১-৬৬ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যর্থতা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুনরায় আবির্ভাবের কারণে এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর স্বল্পকালীন কর্মজীবন (মে, ১৯৬৪—জানুয়ারি, ১৯৬৬) এবং ইন্দিরা গান্ধির কর্মজীবনের গোড়ার দিকে ভাষাসহ অন্যান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের পর হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার পরিকল্পনা, আলিগড় মুসলিম বিদ্যালয় ভারতের সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান নয় এবং সেই কারণে সেখানে ধর্মের ভিত্তিতে ছাত্রদের জন্য আসন সংরক্ষণ বেআইনি—এই মর্মে এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের রায় এবং এর ফলে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ সুবিধা স্থগিত, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন মুসলমানদের আনুগত্য সত্ত্বেও মুসলমান সামরিক এবং বেসামরিক কর্মচারীদের কখনও কখনও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা, অর্থনৈতিক মন্দা ইত্যাদি কারণে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জাকীর হোসেন রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত হলেও মুসলমানদের উদ্বেগ কমেনি।

১৯৭০ এর দশকের শেষ এবং ১৯৮০-র দশকের গোড়ায় সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সংঘ পরিবারের উদ্যোগে সাম্প্রদায়িকতা শক্তিশালী হয়। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতা বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুমিত সরকার, তনিকা সরকার, তপন বসু প্রমুখ *Khaki Shorts and Saffron Flags* পুস্তিকায় 'আর.এস.এস. আগ্রাসী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎস মুখ' বলে বর্ণনা করেছেন। অযোধ্যা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্মোন্মাদনাও সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশা করা যায় সুপ্রিম কোর্টের রামমন্দির সংক্রান্ত রায়ের ফলে হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য দূর হবে এবং শান্তি সুনিশ্চিত হবে।

১০.৪ স্বাধীনতা-উত্তর কালে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

ভারতবাসী এক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করে এক আধুনিক যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞাননির্ভর রাষ্ট্র গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সত্ত্বেও পারস্পরিক অবিশ্বাস, ঘৃণা ও বিচ্ছিন্ন থাকার মানসিকতা যা শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষ পরিণত হয়, তার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। ১৯৬০-এর দশকের সূচনা থেকেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ৪-৯ ফেব্রুয়ারি মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর শহরে বড় আকারে দাঙ্গা হয়। এই দাঙ্গার কারণ হিসাবে কিছু সফল মুসলমান ব্যবসায়ীর অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে দায়ী করা হয়। অক্টোবর ৩, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে উত্তরপ্রদেশে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-সংসদের নির্বাচনকে ঘিরে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে দাঙ্গা হয়। একই সময়ে উত্তরপ্রদেশে মীরাটে একজন হিন্দু ছাত্রকে কয়েকজন মুসলমান ছাত্র প্রহার করলে হিন্দুরা মিছিল করে এবং একটি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করার ভয় দেখালে মুসলমান বসবাসকারীরা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি নেয়। অভিযোগ ওঠে যে পুলিশ উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে শান্ত করার পরিবর্তে মুসলমানদের উপর লাঠি চালালে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গা শুরু হয়। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ১৬ মার্চ রৌউর কেল্লায় দাঙ্গা হয় যখন একটি বিশেষ ট্রেনে জনৈক হিন্দু উদ্‌বাস্তু মুসলমান রুটি বিক্রেতার নিকট থেকে রুটি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই সংবাদ সংলগ্ন শহরের বস্তি এবং গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়লে হিন্দু জনতা স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মুসলমানদের হত্যা করে। ১৯৬০-এর দশক থেকে ইস্পাত কারখানায় কাজ করার সুবাদে কিছু মুসলমান কর্মচারীর আর্থিক উন্নতি স্থানীয় হিন্দু এবং আাদিবাসীদের অসন্তোষের কারণ হয়েছিল মনে করা হয়।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২২-২৯ আগস্ট বিহারের হাতিয়া এবং রাঁচি শহরে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ হয়। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু-বিরোধী অসন্তোষের সূত্র ধরে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে এখানে দাঙ্গা হয়েছিল। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে মার্চ-এ সাধারণ নির্বাচনের সময় পরিস্থিতির আরও অবনতি হয় উর্দুকে বিহারে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাবকে ঘিরে। BJS, RSS এবং বিহার হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন একযোগে রাজ্যবাসী উর্দু বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে। মুসলিম আজাদ হিন্দু বিদ্যালয়ের সামনে উর্দু বিরোধী ছাত্রদের মিছিলের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন হিন্দু ছাত্র মারা গেলে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ১৮-২৪ সেপ্টেম্বর গুজরাটের আমেদাবাদ এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতে দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় থেকেই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা চলেছিল। পাকিস্তান বিরোধী মনোভাব মুসলমান-বিরোধী মনোভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে জুনে মুসলমান সংগঠন Jamiat-ulema-i-Hind গুজরাটি মুসলমানদের নিয়ে একটি সম্মেলন আহ্বান করে। এর সূত্র ধরে ২২-২৯ ডিসেম্বর RSS একটি মিছিলের আয়োজন করে গুরু গোয়ালকরের নেতৃত্বে। জানুয়ারি মাসে All Gujrat RSS Camp আহমেদাবাদে আয়োজিত হয় যেখানে প্রায় দুই হাজার স্বেচ্ছাসেবক অংশ নেয়।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ১০ মার্চ জনৈক হিন্দু পুলিশ মুসলমান ধর্মগ্রন্থ কোরান সম্পর্কে কটূক্তি করায় মুসলমানরা প্রতিবাদ জানায় এবং এতে অনেক পুলিশ কর্মী আহত হয়। ৮ সেপ্টেম্বর হিন্দুদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলাকালীন জনৈক মুসলমান পুলিশ কর্মী হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ রামায়ণকে পদাঘাত করলে দুই দিন পর Hindu Dharma Raksha Samity গঠিত হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর জনসংঘ মুসলমান পুলিশ কর্মীর শাস্তি হওয়ার বিষয়কে কেন্দ্র করে বিজয় উৎসব করে।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ৭-৮ মে মহারাষ্ট্র ভিওয়াণ্ডি, জায়গন এবং মাহাদ শহরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ঘটনা ঘটে। হিন্দু সংগঠন রাষ্ট্রীয় উৎসব মণ্ডল শিবজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল নিজামপুরার মধ্য দিয়ে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করে। এই অঞ্চলটি ছিল একটি মসজিদের সন্নিকটে। মুসলমান নেতৃত্বের বিরোধীতা সত্ত্বেও স্থানীয় প্রশাসক এই শোভাযাত্রার অনুমতি দেয়। ৭ মে এই শোভাযাত্রা বিতর্কিত পথ ধরে অগ্রসর হওয়ার সময় মুসলমান-বিরোধী ধ্বনি উচ্চারিত হয়। এর ফলে প্রচুর সংখ্যক মুসলমান গ্রামবাসী এই শোভাযাত্রার উপর চড়াও হয়, পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠে।

১৯৭০-এর দশকের গোড়ায় পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত ছিল। এই দশকের মাঝামাঝি আবার উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ২২-২১ অক্টোবর উত্তর প্রদেশে বারাণসীতে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকার মধ্য দিয়ে দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মুসলমানরা এতে বাধা দিলে প্রতিরোধ হিংসার আকার নেয়। উভয়পক্ষ অস্ত্রের সাহায্য নিয়ে বিরোধে অংশ নেয়। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ২৯ মার্চ উত্তরপ্রদেশে সম্ভলে দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। স্থানীয় হিন্দু কংগ্রেস নেতা হোলি উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রার আয়োজন করেন এবং এই সঙ্গে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয় যেখানে দুই জন মুসলমান বালিকা অংশ নেওয়ায় জনৈক মুসলিম লিগ নেতা মনজর শফি ক্রুদ্ধ হন। স্থানীয় সমাজবিরোধীদের সহযোগিতায় মনজর শফি ধর্মঘটের ডাক দেন। দাঙ্গার ঘটনা ঘটে যখন জনৈক হিন্দু পান ব্যবসায়ী এই ধর্মঘট পালন করতে অস্বীকার করেন।

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ১১ এপ্রিল বিহারে জামশেদপুরে দাঙ্গা হয়। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের উত্তেজনার পর সবিরনগর এলাকায় মুসলমানরা বসবাস করতে শুরু করে। এই সময় হিন্দু-জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলি স্থানীয় হিন্দু আদিবাসীদের হিন্দুকরণ করার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে হিন্দু দেব-দেবী, হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন করে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে RSS রামনবমী উপলক্ষ্যে হিন্দু শোভাযাত্রার আয়োজন করতে সচেষ্ট হয়। ১ এপ্রিল RSS প্রধান বালাসাহেব দেওরাস বক্তৃতা দেওয়ার পর শহরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বলে কেউ কেউ মনে করেন। স্থানীয় বিধানসভার সদস্য দিননাথ পাণ্ডে সবিরনগরের মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রা যাওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন এবং ১১ এপ্রিল জনগণকে সমবেত হওয়ার কথা বলেন। প্রায় ১৫০০০ জনকে নিয়ে এই শোভাযাত্রা একটি মসজিদের সামনে পৌঁছলে মুসলমানরা বাধা দেয় এবং এই শোভাযাত্রাকে ছত্রভঙ্গ করা হয়। আদিবাসীরা জামশেদপুরের সম্পন্ন মুসলমানদের আক্রমণে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। এই

দাঙ্গার ঘটনায় প্রায় ৭৯ জন মুসলমান এবং ২৫ জন হিন্দু মারা যায়। Jitendra Narayan Commission এই দাঙ্গার জন্য RSS কর্মীদের এবং বিশেষভাবে স্থানীয় বিধায়ক দিননাথ পাণ্ডেকে দায়ী করে।

১০.৫ উপসংহার

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে গণতন্ত্রকে বহু ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে নানা ধরনের জটিল সীমাবদ্ধতা এই দেশের ছিল। সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক উপাদান বিচিত্র ভাবে সক্রিয় ছিল। রাষ্ট্র-কাঠামো, জনজীবন এবং সাধারণ মানুষের চৈতন্যে তা অত্যন্ত জটিল প্রভাব সৃষ্টি করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দারিদ্র্য, হতাশা, ক্ষোভ, জীবন ও সমাজ সম্পর্কে বেদনা ও আশাভঙ্গ, বৈষম্যজনিত অবসাদ—যা সমাজের আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া সামাজিক শ্রেণিগুলোকে তীব্র ভাবে প্রভাবিত করেছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের তৈরি করে যাওয়া সাম্প্রদায়িকতাবাদের বীজ ভারতীয় সমাজে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়কালে এই ক্ষতের সম্পূর্ণ নিরাময় হওয়া তো দূরস্থান, শাসকশ্রেণির বিবিধ দুর্বলতার কারণে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বহুগুণ বেড়ে যায়। খুব স্পষ্ট করে এই কথা মনে রাখা দরকার যে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিপক্ষে : তাঁরা দাঙ্গা, লুঠপাট, নারীদের উপর অত্যাচার, সম্পত্তি নষ্ট সহ সকল ধরনের অশান্তির বিরুদ্ধে। দাঙ্গা ও অশান্তির জন্য সর্বদাই দায়ী উভয় সম্প্রদায়ের-ই অল্প কিছু স্বার্থান্ধ মানুষ। সাধারণ মানুষ, প্রশাসন, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, সমাজের বুদ্ধিজীবী শ্রেণি—সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে সাম্প্রদায়িকতাবাদ-বিরোধী চেতনার বিকাশের জন্য। এর পাশাপাশি প্রয়োজন শিক্ষার বিস্তার ও প্রগতিশীল সমাজ চেতনার প্রকাশ। আরও মনে রাখা দরকার যে কোনো সম্প্রদায়, কৌম, ধর্মীয় গোষ্ঠী, সামাজিক শ্রেণি, বর্গ, লিঙ্গ—কেউ-ই ভারত-রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে নয়। রাষ্ট্রীয় একতা ও চেতনা সর্বদাই সার্বভৌম।

১০.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বলতে কী বোঝায়? স্বাধীনোত্তর-ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

২। স্বাধীনোত্তর ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৩। ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

১০.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। T. Basu, P. Datta, S. Sarkar, T. Sarkar & S. Sen — *Khaki Shorts Saffron Flags,* New Delhi, 1993.

২। R. Bhargava — *Liberal Secular Democracy and Explanation of Hindu Nationalism,* Oxford, 2002.

৩। P. R. Brass — *The Production of Hindu-Muslim Violence in Contemporary India*, Washington Press, 2003.

৪। A. A. Engineer — *Communalism in India, A Historical and Empirical Study*, New Delhi, 1995.

৫। Bipan Chandra & Others — *India Since Independence, 1947-2000,* Penguin Press.

একক ১১ ❑ নির্বাচনী রাজনীতি এবং পরিবর্তিত দল ব্যবস্থা

গঠন

১১.০ উদ্দেশ্য

১১.১ ভূমিকা

১১.২ নির্বাচনী রাজনীতি এবং পরিবর্তিত দল ব্যবস্থা

১১.২.১ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সূত্রপাত

১১.২.২ পরিবর্তিত সময়ে নির্বাচনী রাজনীতি

১১.৩ দলব্যবস্থার বিবর্তন

১১.৩.১ প্রাক-চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন

১১.৩.২ ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী পর্যায়

১১.৪ পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন

১১.৪.১ যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভাঙন

১১.৫ জোট-সরকারের আমলে আঞ্চলিক দলগুলির উদ্ভব

১১.৬ উপসংহার

১১.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিলাভের পর প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।
- ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর সংসদীয় প্রতিষ্ঠান, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, নির্বাচনী প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক দলব্যবস্থা এদেশে শাসন সংস্কৃতিতে স্থান করে নেয়।
- জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুর পর কংগ্রেস বিরোধী হাওয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহু বিরোধী দল তৈরি করে। বিরোধী দলগুলি অনেক রাজ্যে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের পর জোট-সরকার তৈরি করে।

- ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে অ-কংগ্রেসি দলগুলির সমর্থনের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়।
- ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আদর্শগত পার্থক্য, দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে কাজ না করতে পারায় যুক্তফ্রন্ট সরকার সাফল্যলাভ করতে পারেনি।

১১.১ ভূমিকা

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিলাভের পর প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় যেখানে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার দিকে দল ব্যবস্থাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ঘটবে। সমাজ ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্কের চাবিকাঠি ছিল রাজনৈতিক দলগুলির চরিত্র ও প্রকৃতি। সমাজের গোষ্ঠীগুলির স্বার্থ রক্ষার্থে দলগুলি গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সময় সংসদীয় প্রতিষ্ঠান, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, নির্বাচনী প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক দলব্যবস্থা এদেশে শাসন-সংস্কৃতিতে স্থান করে নেয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর এই ব্যবস্থা পুনর্স্থাপিত হয়। সংবিধান অনুযায়ী একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন তৈরির কথা বলা হয় যার দায়িত্ব নির্বাচন পরিচালনা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত কাজ করা।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের একটি আধিপত্যকারী স্থায়ী সরকার গঠনে ভূমিকা লক্ষ্য করা গেলেও নেহেরুর মৃত্যুর পর কংগ্রেস আধিপত্য হ্রাস পেতে থাকে। কংগ্রেস বিরোধী হাওয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহু বিরোধী দল তৈরি করে, প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিরোধী দলগুলি অনেক রাজ্যে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের পর জোট-সরকার তৈরি করে। ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। তবে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকটের কারণে জোট-সরকার স্থায়ী হয়নি। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আদর্শগত পার্থক্য, দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে কাজ না করতে পারায় যুক্তফ্রন্ট সরকার সাফল্যলাভ করতে পারেনি। যদিও বিরোধী আঞ্চলিক দলগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে গ্রামীণ ও প্রান্তিক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করেছে।

১১.২ নির্বাচনী রাজনীতি এবং পরিবর্তিত দল ব্যবস্থা

১১.২.২ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সূত্রপাত

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে ভারতে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় নির্বাচন এবং ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে আঞ্চলিক পরিষদে প্রথম নির্বাচনী নীতি কার্যকর হয়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সময় সংসদীয় প্রতিষ্ঠান, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, নির্বাচনী প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক দলব্যবস্থা এদেশে শাসন-সংস্কৃতিতে স্থান করে নেয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হওয়ার সময় এই ব্যবস্থা পুনর্স্থাপিত হয়। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তি ছিল সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার। ২১ বছর বয়স্ক সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ১৯৫১-৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সাধারণ নির্বাচন ছিল যে কোনো দেশের তুলনায় ভারতে গণতন্ত্রের বড় ধরনের পরীক্ষা। সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় ও রাজ্য আইন সভাগুলিকে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচিত হতে হবে। একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন তৈরির কথা বলা হয় যার দায়িত্ব হবে নির্বাচন পরিচালনা করা এবং নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত কাজ করা। এই কাজগুলির মধ্যে ছিল লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনী এলাকার পুনর্বিন্যাস, যোগ্য ভোটদাতাদের তালিকাভুক্তকরণ, জাতীয় ও আঞ্চলিক দলগুলিকে স্বীকৃতিদান এবং প্রতীক প্রদান, প্রার্থীর মনোনয়ন সংক্রান্ত প্রক্রিয়া তৈরি প্রভৃতি।

১১.২.২ পরিবর্তিত সময়ে নির্বাচনী রাজনীতি

বেশ কয়েক দশক জুড়ে ভারতের নির্বাচনী রাজনীতিতে পরিবর্তন সূচীত হয়। ১৯৯০-এর দশকে এই পরিবর্তন স্পষ্টভাবে সামনে আসে। ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সময়কালকে 'নয়া নির্বাচনী ব্যবস্থা নামে চরিত্রায়িত করা হয়। এই নয়া নির্বাচনী ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ভোটারদের নিকট বহু পছন্দের উপস্থিতি। পূর্বের নির্বাচনগুলিতে নির্বাচকদের কাছে কংগ্রেস ভাবনা ছিল পছন্দের মূল কেন্দ্র। কংগ্রেসের পক্ষে অথবা বিপক্ষে ভোটদানের পছন্দই ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বহু অ-কংগ্রেসি দলের উত্থানের ফলে তা নানা বিকল্প সামনে এনেছে। এই অর্থে ভারতের নির্বাচনী রাজনীতি কংগ্রেস-উত্তর রাজনীতি নাম চিহ্নিত করা যায়।

১১.৩ দলব্যবস্থার বিবর্তন

১১.৩.১ প্রাক-চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন

উন্নয়নশীল দেশগুলির মতই স্বাধীন ভারতে বহু রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য আইনসভাগুলিতে আসন সংখ্যার বিচারে কংগ্রেস দল প্রাধান্যকারী ভূমিকা পালন করেছিল। সাংগঠনিক শক্তির দিক থেকে তখন কংগ্রেস একমাত্র জাতীয় দল হিসাবে ভূমিকা পালন করেছিল। কংগ্রেস দলের প্রাধান্য শুধু শাসক দল তথা সরকার গঠন কিংবা সাংগঠনিক শক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। বরং জাতীয় আন্দোলনে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঐতিহ্য, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, জাতীয় ঐক্য এবং সর্বোপরি নেহেরুর নেতৃত্ব তাদের পক্ষে গিয়েছিল। ১৯৫১-৫২ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রাধান্যকারী দলের মর্যাদা পেলেও ক্রমে বহুদলীয় ব্যবস্থার সূচনা হয় যদিও চতুর্থ নির্বাচনের আগে কংগ্রেসকে বিরোধী দলগুলি গুরুতর চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি।

নেহেরুর সময়কালে কংগ্রেস ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে প্রভাবশালী। কেন্দ্রে এবং প্রায় সব রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস তার ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু শুরু থেকেই প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তি করে একটি বহুদলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল। স্বাধীনতার পর থেকেই কংগ্রেস, সমাজতান্ত্রিক, সাম্যবাদী, ভারতীয় জনসংঘ, কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টি সক্রিয়ভাবে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। বিরোধী দলগুলি জনগণের সমর্থনের প্রেক্ষাপটে কংগ্রেসের তুলনায় দুর্বল হলেও সরকারের অর্থনীতি এবং রাজনীতির সমালোচনায় মুখর হয়েছিল। শাসক কংগ্রেস দল ঐক্যমত্যের দল হিসাবে কাজ করেছিল। দলগত অবস্থানে বিরোধীতা কংগ্রেসের কাছাকাছি আসতে না পারলেও নির্বাচনী রাজনীতিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের মধ্যেকার বিভিন্ন গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে কার্যোদ্ধার করতে চেয়েছিল।

একথা ঠিক যে অকংগ্রেসি বিরোধী দলগুলির দুর্বলতা তথা কংগ্রেসের প্রাধান্যকে চ্যালেঞ্জ জানানোর ক্ষেত্রে অপারগতা নিয়ে কথা হলেও নির্বাচনী জোট সংযুক্তির নিরিখে বলা যায় যে ১৯৬৭ খ্রিষ্টব্দের পূর্বের লোকসভা নির্বাচনে অ-কংগ্রেসি প্রার্থীরা শতকরা ৫০-এর বেশি ভোট পেয়েছেন। রাজ্য বিধান সভা নির্বাচনগুলিতে অকংগ্রেসি দলগুলির প্রাপ্ত ভোটের সম্মিলিত সংখ্যার শতাংশের বিচারে অর্ধেকেরও বেশি ছিল। নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সমস্যা এবং নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনী রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরোধীদের ভোট ভাগাভাগি কংগ্রেসের আসন লাভের স্বাভাবিক সুবিধা করে দিয়েছিল।

১১.৩.২ ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী পর্যায়

ভারতীয় রাজনীতির চর্চায় দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৬৭-১৯৭৭)-এর দল ব্যবস্থার বিকাশ ছিল জল-বিভাজিকা স্বরূপ। প্রথম পর্যায়ে দেশ প্রত্যক্ষ করেছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের একটি আধিপত্যকারী স্থায়ী সরকার গঠনে ভূমিকা, দ্বিতীয় পর্বে নেহেরুর মৃত্যুর পর কংগ্রেস আধিপত্য হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্যে পরাজয় এবং এর সূত্র ধরে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ লোকসভা নির্বাচনে পরাজয় তা সম্পূর্ণ করে। কংগ্রেস আধিপত্যের ক্রমশ অবক্ষয় দলের মধ্যে নেহেরু-উত্তরপর্বে নতুন ধারা তৈরি করে যা ভারতীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। নেহেরুর মৃত্যুর পর নেতাদের অনেকের মধ্যে দুর্নীতি, জীবন যাত্রায় বিলাসিতা, নেতৃত্বের সংঘাত, উপদলীয় কোন্দল বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জনগণ তাদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে। এই সময় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে ৬১.১% ভোটার ভোটদান করেছিল, যা পূর্বের তুলনায় বেশি। তবে জনগণ এও মনে করে যে কংগ্রেসের পরিবর্তে আর কোনো দল ক্ষমতায় আসার উপযুক্ত হতে পারে না। বিরোধী দলগুলি নির্বাচনী প্রচারের সময় তাদের পক্ষে জনসমর্থন আদায় করার মতো কোনো বিষয় তুলে ধরতে পারেনি।

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকেই কংগ্রেসের অবক্ষয় স্পষ্ট হতে শুরু করে। কংগ্রেস বিরোধী হাওয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহু বিরোধী দল তৈরি করে, প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিরোধী দলগুলি অনেক রাজ্যে ১৯৬৭

খ্রিস্টাব্দের পর জোট-সরকার তৈরি করে। কংগ্রেসের মধ্যে যেমন দ্বন্দ্ব ছিল তেমনি কংগ্রেস দলের বিকল্প দলগুলির মধ্যেও তখন দ্বন্দ্ব ছিল। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের পর কংগ্রেস থেকে দলত্যাগ ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইন্দিরা গান্ধির প্রধানমন্ত্রীত্বকালে এই ধরনের প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেসের অপেক্ষাকৃত বয়ঃজ্যেষ্ঠ অংশ গান্ধির বিরোধীতা করায় কংগ্রেসে ভাঙন হয়।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস (ই) ও কংগ্রেস (ও) তৈরি হয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের পর জাতীয় কংগ্রেসের প্রাধান্যকারী ভূমিকার অবসান হতে শুরু করলে ইন্দিরা গান্ধি নিজের কর্তৃত্ব দলের এবং সরকারে বাড়িয়ে নিজেকে জাতীয় স্তরের নেত্রীরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্য এবং কেন্দ্রের বিরোধী দলগুলির প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। তিনি নতুন ধরনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু করেন যা ছিল অনেক বেশি কেন্দ্রীভূত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং সরকার ও দলের নীতি নির্ধারণে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দুর্বল করে দেওয়ার পক্ষে উপযোগী। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করেন। দলত্যাগের ক্ষেত্রে এই সময় দু-ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাওয়া যেমন ঘটে ঠিক তেমনি কংগ্রেসে অন্তর্ভুক্তিও ছিল। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস এই সময় ডান ও বাম অনুসৃত নীতি বাদ দিয়ে নিজের শক্তিশালী মতাদর্শকেন্দ্রিক সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। ইন্দিরা গান্ধি বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে জাতীয় জরুরি অবস্থা চালু করেন। এই ধরনের কাজ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিকভাবে তাকে গণতন্ত্রবিরোধী পরিচিতি কিছুটা হলেও এনে দেয়।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধির কংগ্রেস দলের পরাজয়ের মাধ্যমে প্রথম কেন্দ্রে অ-কংগ্রেসি জনতা সরকার ক্ষমতায় আসে। জনতা দল ছিল বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের জোট। এই দলের মধ্যে ছিল বিভিন্ন বিরোধী গোষ্ঠী যেমন—পুরোনো কংগ্রেস (ও), জনসংঘ, ভারতীয় লোকদল, সমাজতান্ত্রিক দল। মতাদর্শগত, নেতৃত্বের সামাজিক অবস্থানগত তেমন কোনো সাধারণ যোগসূত্র এখানে ছিল না। জনতা দলের এই বিষমধর্মী গঠনের কারণে সরকারকে তাদের জোট বেশিদিন স্থায়ী করতে পারেনি। এই সময় কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক ও দুর্বল হয়েছে।

জনতা সরকার ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি ভেঙে পড়ে। এইসময় কংগ্রেস (ই) দল জাতীয় স্তরে স্থায়ী সরকার দিতে পারবে বলে মনে করা হয়। কংগ্রেস (ই) দল ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে জনতা সরকারের অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ক্ষমতায় আসে।

১১.৪ পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন

১৯৬৭ এবং ১৯৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা দখল করে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির মধ্যে অনৈক্য ছিল। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলির মধ্যে জোট তৈরি হয়। একইভাবে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে মধ্যবর্ত্তীকালীন নির্বাচনের পর কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। কিন্তু কোনো সরকার স্থায়ী হয়নি। বিভিন্ন

সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকটের কারণে যাকে Myron weiner 'Politics of Scarcity' বলে মন্তব্য করেছেন—জোট-সরকার স্থায়ী হয়নি। জোটবদ্ধ দলগুলি চেয়েছিল কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করা। কিন্তু দলগুলির স্বার্থের মধ্যে বৈপরীত্য ছিল। কয়েকটি দল জোটের মধ্যে থেকে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে তৎপর ছিল। স্বাভাবিকভাবে দলগুলির মধ্যে অন্তর্কলহ জোট-সরকারকে টিকিয়ে রাখার পরিপন্থী ছিল।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে অ-কংগ্রেসি দলগুলির সমর্থনের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়, যার স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ১০ মাস। এই সরকারের প্রতি শহরাঞ্চলের মানুষের সমর্থন ছিল। রাজ্যপাল ধর্মাভীর এই সরকারকে বরখাস্ত করে,—যেটিকে স্বেচ্ছাকৃত, অসাংবিধানিক মনে করা হয়। ১৪টি দল প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেছিল। দ্বিতীয় বারে ১২টি দল মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনে কংগ্রেস দলের মোকাবিলা করার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়। যুক্তফ্রন্ট সরকারে অংশগ্রহণকারী দলগুলির মধ্যে তুলনামূলকভাবে পূর্বের থেকে সমঝোতা বেশি পরিমাণে হলেও মৌলিক পার্থক্য ধরা পড়েনি। পারস্পরিক স্বার্থ, আদর্শ এবং সমর্থনের প্রেক্ষাপটে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

১১.৪.১ যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভাঙন

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার হঠাৎ করে ভেঙে পড়েনি। ফ্রন্ট সমর্থক দলগুলির মধ্যে অন্তর্কলহ এবং সম্মিলিত দায়িত্ববোধের অভাব ছিল। প্রথম দিকে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এম) এর প্রতি সহানুভূতিমূলক মনোভাব থাকলেও পরের দিকে এই দল অন্যান্য দলগুলির আশঙ্কার কারণ হয়। সরকারি নীতিকে কেন্দ্র করে বিরোধ, কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এম) এর প্রতি বিতশ্রদ্ধ হওয়া, এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর ভূমিকা যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যর্থতার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। বাংলা কংগ্রেস দলের মধ্যে অজয় মুখার্জীর মর্যাদা অটুট থাকলেও যুক্তফ্রন্ট সরকারের অস্তিত্বের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দোদুল্যমান। সর্বোপরি ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আদর্শগত পার্থক্য, দলীয় স্বার্থের ঊর্দ্ধে উঠে কাজ না করতে পারায় যুক্তফ্রন্ট সরকার সাফল্যলাভ করতে পারেনি।

১১.৫ জোট-সরকারের আমলে আঞ্চলিক দলগুলির উদ্ভব

স্বাধীনোত্তর ভারতে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক দলের উদ্ভব ঘটে। কোনো বিশেষ অঞ্চলে রাজনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষার প্রয়োজনে আঞ্চলিক দলের আবির্ভাব হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক এবং জাতীয় দলের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। কয়েকটি রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলি শাসন-ক্ষমতা অধিকার করেছে। আঞ্চলিক দলগুলি একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল বা সীমারেখার মধ্যে তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখার

মানসিক প্রস্তুতি রাখলেও অনেক সময় জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই পর্বে আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তামিলনাড়ুতে DMK এবং ADMK, জম্মু কাশ্মীরে National Conference, অন্ধ্রপ্রদেশে Telegu Desam, আসামে Asom Gana Parishad, গোয়ায় Maharashtrawadi Gomantak Party, মিজোরামে Mizo National Front, সিকিমে Sikkim Sangram Parishad, মেঘালয়ে All Party Hill Leaders Conference, হরিয়ানায় Indian National Lok Dal প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের পর জোট-সরকার গঠন করেছিল যে সব আঞ্চলিক দল তাদের মধ্যে ছিল Bangla Congress, Communist Party of India (Marxist), Forward Block (Marxist), Revolutionary Communist Party of India, Lok Sevak Sangh প্রভৃতি। কেন্দ্রে DMK দল ইন্দিরা গান্ধি সরকারকে সাহায্য করেছে। আঞ্চলিক দলগুলি বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তাদের রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করেছে।

১১.৬ উপসংহার

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় রাজনীতির সর্বাপেক্ষা বড় টানাপোড়েন ছিল সর্বভারতীয় দল হিসেবে বিকশিত কংগ্রেসের প্রাধান্যসৃষ্টিকারী ভূমিকার সঙ্গে আঞ্চলিক দলসমূহের প্রাধান্যবিস্তারের প্রয়াসের টানাপোড়েন ও দ্বন্দ্ব। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ছিল সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল যা ভারতে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বকে প্রশ্নের সামনে ফেলেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার আগে থেকেই কংগ্রেস ছাড়াও কমিউনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক, মুসলিম লিগ প্রমুখ রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ভারতে ছিল। স্বাধীনতার পর ভারতে নতুন ধরনের পরিচিতি সত্তার রাজনীতি বিকশিত হয়। আঞ্চলিক দলগুলির উত্থান আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও পরিচিতির প্রতিফলন ছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-কে দেশের সব অংশের মানুষ আর নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি বলে মানতে পারছিল না। স্থানীয় ভাবাবেগ, বঞ্চনা, বৈষম্য, শিক্ষা বিস্তারের আনুপাতিক হার, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, সরকারি নীতি, কৌম স্তরের পরিচিতি সত্তা—প্রতিটি উপাদানই কাজ করেছিল আঞ্চলিক রাজনৈতিক চেতনা এবং রাজনৈতিক দল গঠনের পিছনে।

১১.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং পরিবর্তিত সময়ে নির্বাচনী রাজনীতির উপর একটি টীকা লিখুন।

২। স্বাধীনোত্তর পর্বে ভারতের দল ব্যবস্থার উপর টীকা লিখুন।

৩। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার কীভাবে গঠিত হয়েছিল? এই সরকার কি সফল হয়েছিল?

৪। জোট-সরকারের আমলে আঞ্চলিক দলগুলির উদ্ভব আলোচনা করুন।

১১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। Rajni Kothari — *Politics in India*, New Delhi, 1970.

২। Partha Chatterjee ed. — *State and Politics in India*, New Delhi, 2009.

৩। Sally Ray — *Coalition and Conflict : The United Front Government of West Bengal, 1969 and 1969-70*, Phd. Thesis, Australian National University, April, 1974.

একক ১২ ❑ জাতীয় সংকট : জরুরি অবস্থা ঘোষণা এবং এর পরিণতি

গঠন

১২.০ উদ্দেশ্য

১২.১ ভূমিকা

১২.২ জরুরি অবস্থা ঘোষণার পটভূমি

১২.২.১ অর্থনৈতিক অবস্থা

১২.২.২ গুজরাট এবং বিহারে আন্দোলন

১২.২.৩ বিচারব্যবস্থার সঙ্গে দ্বন্দ্ব

১২.২.৪ জরুরি অবস্থা ঘোষণা

১২.২.৫ জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরিণতি

১২.৩ ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচন

১২.৪ জনতা সরকার

১২.৫ ৪২তম সাংবিধানিক সংশোধনী (১৯৭৬)

১২.৫.১ ৪৪তম সাংবিধানিক সংশোধনী

১২.৬ উপসংহার

১২.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১২.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন সংবিধানের ৩৫২নং ধারা অনুযায়ী ভারতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রেক্ষাপট কী ছিল।
- রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার, সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ ছাড়াও জরুরি অবস্থা চলাকালীন সাধারণ মানুষকে অনেক বেশি নির্যাতন সহ্য করতে হয়।
- জরুরি অবস্থার অবসানের পর ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে জনতা দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে সরকার গঠন করে।

- ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে লোকসভা নির্বাচনে জনতা দল পরাজিত হয় এবং ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস দল জয়লাভ করে।
- ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে জয়লাভ করে জনতা সরকার ১৯৭৭ এবং ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানের ৪৩ এবং ৪৪তম সংশোধন করে সংবিধানকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের অবস্থায় কিছুটা ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

১২.১ ভূমিকা

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ২৫ জুন অভ্যন্তরীণ বিশঙ্খলার আশঙ্কায় সংবিধানের ৩৫২নং ধারা অনুযায়ী দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার পেছনে সরকারের পক্ষ থেকে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, দারিদ্র দূরীকরণের কর্মসূচি রূপায়ণের মতো নানাবিধ প্রকল্প ঘোষণা করা হলেও সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতির অধিকাংশই অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল। সাংবিধানিক পরিবর্তনসহ সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার, সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ ছাড়াও জরুরি অবস্থা চলাকালীন সাধারণ মানুষকে অনেক বেশি নির্যাতন সহ্য করতে হয়।

জরুরি অবস্থার অবসানের পর ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে জনতা দল সরকার গঠন করে। জনতা দল এবং এর সহযোগী দল ৫৪২টি আসনের মধ্যে ৩৩০টি আসনে জয়লাভ করে। কিন্তু জনতা দলের লক্ষ্য, নেতৃত্ব এবং পরিকল্পনার অভাব ছিল। নীতিগত প্রশ্নে জনতা দল গঠিত সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। জনতা দলে ভাঙনের ফলে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে নতুন করে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে জনতা দল পরাজিত হয় এবং ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস দল জয়লাভ করে।

২৫ জুন, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২১ মার্চ, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ জরুরি অবস্থা জারী ছিল। এই সময় ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্দিরা গান্ধি পরিচালিত সরকার সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী আইন প্রণয়ন করে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা হ্রাস, দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার সংকোচন সহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে জয়লাভ করে জনতা সরকার ১৯৭৭ এবং ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানের ৪৩ এবং ৪৪তম সংশোধন করে সংবিধানকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের অবস্থায় কিছুটা ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

১২.২ জরুরি অবস্থা ঘোষণার পটভূমি

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ইন্দিরা গান্ধি একজন জনপ্রিয় নেত্রী হিসাবে আবির্ভূত হন। আবার এই সময় দলগত প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়। সরকার

এবং বিচার ব্যবস্থার মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। সরকারের পক্ষ থেকে সংবিধান অমান্য করার অনেক দৃষ্টান্ত সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টিগোচর হয়। কংগ্রেস দল সুপ্রিম কোর্টের এই দৃষ্টিভঙ্গি গণতন্ত্র এবং পার্লামেন্টের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করে। কংগ্রেস অভিযোগ আনে যে সুপ্রিম কোর্ট একটি রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের গণমুখী পরিকল্পনা রূপায়ণের পরিপন্থী। বিরোধী দলগুলি কংগ্রেসের বিরোধীতা করে কারণ তাদের অভিযোগ ছিল রাজনীতি সামগ্রিক স্বার্থে পরিচালিত হওয়ার পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে এবং সরকারের কর্তৃত্ব ব্যক্তিবিশেষের কর্তৃত্বে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় কংগ্রেসের ভাঙন ইন্দিরা গান্ধি এবং তাঁর বিরোধীদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি তীব্রতর করেছে।

১২.২.১ অর্থনৈতিক অবস্থা

১৯৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দের পর ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়নি। বাংলাদেশ সংকট দেশের অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহু শরণার্থী ভারতে আসে। এর সূত্র ধরে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সব রকম সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে জনসাধারণ দুর্দশার কবলে পড়ে।

শিল্পে মন্দা দেখা দেওয়ার ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। ব্যয়সংকোচ করার উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মচারীদের বেতনের পরিমাণ হ্রাস করা হয়। ১৯৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দে বৃষ্টিপাতের অভাবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস পায়। অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারণে সারা দেশে অসন্তোষ দেখা দেয়। এই অবস্থায় কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। বিশেষভাবে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী গোষ্ঠীসমূহ যারা পার্লামেন্টীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিল না, তাদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। এরা ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনে সচেষ্ট হয়ে অস্ত্রধারণ সহ বিপ্লবী কর্মসূচি গ্রহণ করে। এরা নক্‌শাল নামে পরিচিত হয়। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এদের শক্তি বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

১২.২.২ গুজরাট এবং বিহারে আন্দোলন

গুজরাট এবং বিহার কংগ্রেস শাসিত হওয়ায় এই দুই রাজ্যে সংঘটিত ছাত্র আন্দোলনের প্রভাব জাতীয় রাজনীতির উপর বিশেষভাবে পড়েছিল। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটে ছাত্ররা কালোবাজারি, খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি, ভোজ্য তেল সহ অন্যান্য অত্যাবশ্যক জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির কারণে আন্দোলন শুরু করে। বৃহৎ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ছাত্র-আন্দোলন সমর্থন করায় আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। বিরোধী দলগুলি রাজ্য আইনসভার নূতন করে নির্বাচনের দাবি জানায়। কংগ্রেস (ও) দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা মোরারজি দেশাই ছিলেন ইন্দিরা গান্ধির প্রধান বিরোধী যিনি নূতন করে নির্বাচনের দাবিতে সোচ্চার হন। বিরোধী দলগুলির সমর্থন পুষ্ট ছাত্র-আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে গুজরাট বিধানসভার নির্বাচন হয় এবং এই নির্বাচনে কংগ্রেস দল পরাজিত হয়।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে বিহারে ছাত্ররা সমবেত হয়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, খাদ্য সংকট, বেকারত্ব ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। কিছু দিন পর জয়প্রকাশ নারায়ণ যিনি সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে সামাজিক কাজে

লিপ্ত ছিলেন, তিনি ছাত্রদের আন্দোলন পরিচালনা করতে এগিয়ে আসেন। তিনি আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব নেন এই শর্তে যে আন্দোলন অহিংস পথে পরিচালিত হবে এবং এই আন্দোলন শুধুমাত্র বিহারে সীমাবদ্ধ থাকবে না। জয়প্রকাশ নারায়ণ বিহারে কংগ্রেস সরকারের উচ্ছেদ এবং প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন দাবি করেন। এই আন্দোলন জাতীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে বিশাল জনসভার আয়োজন করেন। এই সময় কয়েকটি কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দল যেমন ভারতীয় জনসংঘ, কংগ্রেস (ও), ভারতীয় লোকদল, সমাজতান্ত্রিক দল জয়প্রকাশ নারায়ণকে সমর্থন করে। এই সমস্ত রাজনৈতিক দল জয়প্রকাশ নারায়ণকে ইন্দিরা গান্ধির বিকল্প মনে করে।

১২.২.৩ বিচারব্যবস্থার সঙ্গে দ্বন্দ্ব

এই সময়কালে সরকার এবং শাসক দলের সঙ্গে বিচারব্যবস্থার মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী ভারতীয় সংবিধানে কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি পার্লামেন্ট সংশোধন করতে পারে না। এছাড়া রীতি অনুযায়ী সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ বিচারক সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারক পদে নিযুক্ত হবেন। কিন্তু সরকার এতে ভিন্নমত পোষণ করে। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে সরকার তিন জন সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ বিচারকের মধ্যে কাউকে নিয়োগ না করে বিচারক এ. এন. রায়কে প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ করেন। এতে বিচারবিভাগের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধির বিরোধ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যার ফলশ্রুতি হিসাবে হাইকোর্ট ইন্দিরা গান্ধির নির্বাচন অবৈধ বলে ঘোষণা করে।

১২.২.৪ জরুরি অবস্থা ঘোষণা

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ১২ জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি জগমোহনলাল সিন্‌হা লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধির জয়লাভকে অবৈধ ঘোষণা করেন। জনৈক সমাজতান্ত্রিক নেতা রাজনারায়ণ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে এই নির্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আবেদন করলে বিচারক এই রায় ঘোষণা করেন। রাজনারায়ণ তাঁর আবেদনে উল্লেখ করেন যে ইন্দিরা গান্ধি তাঁর নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন সরকারি কর্মচারীদের ব্যবহার করেছিলেন। হাইকোর্টে ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে এই রায়দানের অর্থ হল যে ইন্দিরা গান্ধি আর পার্লামেন্টের সদস্য নন এবং এই কারণে তিনি আর প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন না যদি না ছয় মাসের মধ্যে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য পদে নির্বাচিত হন। ২৪ জুন সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের এই রায়ের অংশ বিশেষ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। বলা হয় যে ইন্দিরা গান্ধির আবেদন বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধি পার্লামেন্টের সদস্য পদে বহাল থাকতে পারবেন কিন্তু তিনি পার্লামেন্টের আলোচনায় অংশ নিতে পারবেন না।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ২৫ জুন অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় সংবিধানের ৩৫২নং ধারা অনুযায়ী দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুযায়ী ক্ষমতা বিভাজন

বাতিল হয় এবং সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। এছাড়া জরুরি অবস্থা চলাকালীন মৌলিক অধিকার খর্ব করার অধিকার লাভ করে। সরকার এই পর্বে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয়। রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দীন আলী আহমেদ প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলে সংবাদপত্রের দপ্তরগুলিতে বৈদ্যুতিক সংযোগ ছিন্ন করা হয়। বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

১২.২.৫ জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরিণতি

জরুরি অবস্থা ঘোষিত হওয়ার ফলে সরকার বিরোধী আন্দোলন বন্ধ হয়, ধর্মঘট নিষিদ্ধ হয়, অনেক বিরোধী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়, রাজনৈতিক উত্তেজনা অনেকাংশে প্রশমিত হয়। সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করে। সরকারের অনুমতি ছাড়া কোনো সংবাদ প্রকাশিত হবে না বলা হয়। সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার আশঙ্কায় সরকার দুটি প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, (আর.এস.এস.) এবং জামাইত-ই-ইসলামী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কোনরকম প্রতিবাদ, ধর্মঘট এবং গণবিক্ষোভ নিষিদ্ধ হয়। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল জরুরি অবস্থা চলাকালীন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখা হয় এমন কি মৌলিক অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য নাগরিকগণ কোর্টের দারস্থ হতে পারবে না বলা হয়।

এছাড়া সরকার প্রতিরোধমূলক আটক (Preventive detention)-এর যথাসম্ভব ব্যবহার করে। জনগণকে আটক বা গ্রেপ্তার করা হয় শুধু এই কারণে যে তারা কোনো অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত, এই আশঙ্কায় যে তারা অপরাধ করতে পারে বা অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ সরকার কোনো সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক বা গ্রেপ্তার করতে পারে। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে রায় দেয় যে জরুরি অবস্থা চলাকালীন সরকার নাগরিকদের জীবনের অধিকার এবং স্বাধীনতার অধিকার কেড়ে নিতে পারে।

জরুরি অবস্থায় সরকারের এইসব পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অসন্তোষ লক্ষ্য করা যায়। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' এবং 'স্টেটস্‌ম্যান' সংবাদপত্র এবং 'সেমিনার' ও 'মেনস্ট্রিম' পত্রিকা প্রতিবাদ করে। অনেক সাংবাদিককে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে লেখার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। কানাড়ী লেখক শিবরাম করন্থ 'পদ্মভূষণ' পুরস্কার এবং হিন্দি লেখক ফনিশ্বরনাথ রেণু 'পদ্মশ্রী' পুরস্কার গণতন্ত্র স্থগিত রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ফিরিয়ে দেন।

পার্লামেন্ট সংবিধানে অনেকগুলি পরিবর্তন আনে। ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যে রায় দেওয়া হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানে এই মর্মে সংশোধনী আনা হয় যে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। জরুরি অবস্থা চলাকালীন সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী পাশ করা হয়। অনেকগুলি পরিবর্তনের মধ্যে অন্যতম হল দেশের আইনসভার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে ছয় বছর হবে। এছাড়া জরুরি অবস্থায় এক বছরের জন্য নির্বাচন স্থগিত রাখা যাবে।

জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার পেছনে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে সরকার এই সময়ে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে, এবং দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প রূপায়ণ করবে। এই কারণে ইন্দিরা গান্ধি পরিচালিত সরকার ২৬ দফা পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিল যার মধ্যে ছিল ভূমি-সংস্কার। ভূমি বণ্টন, কৃষকদের মজুরী বৃদ্ধি, চুক্তিভুক্ত শ্রমিকের অবসান ইত্যাদি। জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রথমের দিকে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সন্তোষ প্রকাশ করেছিল কারণ সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে শৃঙ্খলার উন্নতি হয়েছে। দরিদ্র জনগণও আশা করেছিল যে সরকারি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি রূপায়িত হবে।

বাস্তবে জরুরি অবস্থার সময় সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতির অনেকাংশই অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল। অন্যদিকে প্রতিরোধমূলক আটকের কবলে পড়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের মধ্যে অনেকেই গ্রেপ্তার হয়েছিল। শাহ কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী এই আইনের দ্বারা এক লক্ষ এগারো হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সংবাদপত্রের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছিল। এই সময় সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয় গান্ধি কোনো সরকারি পদে না থেকেও সরকারি কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করেন। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার, সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ ছাড়াও জরুরি অবস্থা চলাকালীন সাধারণ মানুষকে অনেক বেশি নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে।

১২.৩ ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচন

জরুরি অবস্থার অবসানের পর ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে সরকার নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয়। সব রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মচারীদের কারাগার থেকে মুক্ত করা হয়। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিরোধী দলগুলি নির্বাচনের প্রাক্কালে একত্রিত হয়ে 'জনতা দল' গঠন করে। এই নতুন দল জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্ব স্বীকার করে। কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা যারা জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিপক্ষে ছিলেন, তারাও এই নতুন দলে যোগদান করেন। কয়েকজন অপর কংগ্রেস নেতা যারা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে একটি পৃথক দল গঠন করেছিলেন তারা জগজীবন রামের নেতৃত্ব মেনে নেন। পরবর্তীকালে এই দল জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়। জগজীবন রাম গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারকল্পে নিয়োজিত হন। জনতা পার্টির গঠন এ-বিষয়ে নিশ্চিত করে যে অ-কংগ্রেসি ভোট বিভক্ত হবে না। এই অবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচনে জয়লাভ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

স্বাধীনোত্তর পর্বে এই প্রথম কংগ্রেস দল লোকসভায় ৩৫ শতাংশেরও কম ভোট পেয়ে মাত্র ১৫৪টি আসন দখল করে। জনতা দল এবং এর সহযোগী দল ৫৪২টি আসনের মধ্যে ৩৩০টি আসনে জয়লাভ করে। জনতা দল এককভাবে ২৯৫টি আসন লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। ইন্দিরা গান্ধি রায়বেরিলিতে এবং তাঁর পুত্র সঞ্জয় গান্ধি আমেঠীতে পরাজিত হন।

১২.৪ জনতা সরকার

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে জনতা দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে সরকার গঠন করার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রীর পদ নিয়ে তিন জন প্রতিযোগীর মধ্যে লড়াই শুরু হয়। এরা ছিলেন মোরারজী দেশাই যিনি ১৯৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইন্দিরা গান্ধির প্রতিদ্বন্দ্বী ; উত্তরপ্রদেশে কৃষক নেতা এবং ভারতীয় লোক দলের নেতা চরণ সিং এবং জগজীবন রাম যিনি কংগ্রেস সরকারের একজন অভিজ্ঞ মন্ত্রী হিসেবে সুপরিচিত। শেষ পর্যন্ত মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ করেন কিন্তু দলের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেনি।

সমালোচকদের মতে জরুরি অবস্থার বিরোধীতা করার প্রয়োজনে কিছু সময় জনতা দলের একত্রিকরণ সম্ভব হয়েছিল কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে জনতা দলের লক্ষ্য, নেতৃত্ব এবং পরিকল্পনার অভাব ছিল। নীতিগত প্রশ্নে জনতা দল গঠিত সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। জনতা দলের ভাঙনের ফলে মোরারজী দেশাই পরিচালিত সরকার ১৮ মাসের মধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। এর পর কংগ্রেস দলের সমর্থনের ভিত্তিতে চরণ সিং-এর নেতৃত্বে সরকার গড়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তীকালে কংগ্রেস দল সমর্থন তুলে নেওয়ায় চরণ সিং-এর নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার মাত্র চারমাস ক্ষমতায় ছিল। এর ফলে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে নতুন করে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে জনতা দল পরাজিত হয় এবং ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস দল জয়লাভ করে। কংগ্রেস দল ৩৫৩টি আসন দখল করে ক্ষমতা ফিরে পায়।

১২.৫ ৪২তম সাংবিধানিক সংশোধনী (১৯৭৬)

জরুরি অবস্থার সময় (২৫ জুন, ১৯৭৫ থেকে ২১ মার্চ, ১৯৭৭) সাংবিধানিক (৪২তম সংশোধনী) আইন, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্দিরা গান্ধি পরিচালিত কংগ্রেস সরকারের দ্বারা প্রণীত হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনা সহ বিভিন্ন অংশ পরিবর্তিত হয় এবং কয়েকটি নূতন আইনের ধারা ও অনুচ্ছেদ যুক্ত হয়। সংশোধনী আইনের ৫৯তম ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার সংকুচিত করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। সংশোধনী আইনের বলে সংবিধানের যে কোনো অংশের পরিবর্তন বিচার-বিভাগীয় পর্যালোচনা ছাড়া পার্লামেন্টের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর আঘাত হেনে রাজ্য সরকারের এক্রিয়ারভুক্ত অনেক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল। সংশোধনী আইনে তা পরিবর্তন করে ভারতকে 'সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সঙ্গে জাতির ঐক্য (Unity of the nation) কথাটি পরিবর্তন করে 'জাতির ঐক্য

এবং অখণ্ডতা' (Unity and integrity of the nation) করা হয়েছে। ঐক্যের সঙ্গে অখণ্ডতা শব্দটি যুক্ত হয়েছে।

জরুরি অবস্থা জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। ৪২তম সংশোধনী আইন ছিল বিতর্কিত বিষয়। নাগরিক স্বাধীনতার উপর পুলিশি হস্তক্ষেপ জনগণকে অশান্ত করে তোলে। জনতা দল সংবিধানকে প্রাক্-জরুরি অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করায় ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচন জয়লাভ করে। ১৯৭৭ এবং ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানের ৪৩ এবং ৪৪তম সংশোধন করে জনতা সরকার সংবিধানকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের অবস্থার কিছুটা ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হলেও সম্পূর্ণভাবে সফল হয়নি।

১২.৫.১ ৪৪তম সাংবিধানিক সংশোধনী

ভারতীয় সংবিধানের ৩৫২নং ধারায় জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। ৪৪তম সাংবিধানিক সংশোধনের প্রাক্কালে এ-বিষয়ে বলা হয়েছিল যে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে সমগ্র ভারত বা ভারতের কোনো অঞ্চলে যুদ্ধ, বহিঃশত্রু আক্রমণ অথবা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে যা ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক, তাহলে তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। ৪৪তম সংশোধনের পূর্বে ৩৫২নং ধারাটি ছিল বিধিবহির্ভূত এবং অস্পষ্ট। এই ধারায় প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রীসভার উপরে অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পণ করেছিল। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হলে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা ঘোষণার সুপারিশ করতে পারতেন। পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত ছাড়া জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা যেত না।

জনতা দল ক্ষমতায় আসার পর ৪৪তম সংবিধান সংশোধন করে ৩৫২নং ধারাটি স্পষ্ট করা হয় এবং জাতীয় জরুরি অবস্থা চলাকালীন সংশ্লিষ্ট সরকারের দায়িত্ব বৃদ্ধি করা হয়। ৩৫২নং ধারায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা সংক্রান্ত বিষয়টি এই মর্মে সংশোধিত হয় যে রাষ্ট্রপতি তখনই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন যদি তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রীসভা কর্তৃক লিখিত প্রস্তাবে দেশের সংকটজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হন। একইভাবে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত যথেষ্ট নয়, এক্ষেত্রে পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি এবং ভোটদানের মাধ্যমে জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিষয়টি সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন। জরুরি অবস্থা ঘোষণার এক মাসের মধ্যেই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি না পাওয়া গেলে জরুরি অবস্থা বাতিল বলে গণ্য হবে। এছাড়া জরুরি অবস্থা ঘোষণার ছয় মাস পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে পার্লামেন্ট অনুমোদন দেবে নচেৎ জরুরি অবস্থা স্থগিত রাখা হবে। আরও বলা হয় যে লোকসভার ১০ শতাংশ সদস্য জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে কোনো বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করার ব্যবস্থা করতে পারেন এবং এই বিশেষ অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য সমর্থন করলে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হবে।

১২.৬ উপসংহার

জরুরি অবস্থা ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত একটি বিতর্কিত বিষয়। ভারতীয় গণতন্ত্রের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ১৯৫০ এর দশক থেকে শুরু হয়েছিল, বহু চড়াই-উৎরাই পার করে তা ১৯৭০ এর দশকে এসে পৌঁছয়, তা অকস্মাৎ এক কঠিন প্রশ্নের সামনে পড়ে জরুরি অবস্থার জন্য। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, মূল্যবোধ, ভাবনা ও পরিচালন পদ্ধতি এর ফলে প্রবল ধাক্কা খায়। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী, সমাজকর্মী, মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, এমনকি সাধারণ মানুষও জরুরি অবস্থার দমন-পীড়নের শিকার হয়েছিল। জরুরি অবস্থা জারির জন্য কোনো যুক্তি-ই যথেষ্ট ছিল না। সাধারণ মানুষ এই দমন-পীড়ন মেনে নেয়নি। ১৯৭৭ এর সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধির শোচনীয় পরাজয় ভারতীয় গণতন্ত্রের জয় বলে মনে করা যেতে পারে। ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বার্থকতা এইখানে।

১২.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্দিরা গান্ধির আমলে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পটভূমি আলোচনা করুন।

২। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরিণতি ব্যাখ্যা করুন।

৩। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে লোকসভা নির্বাচনে জনতা দলের সাফল্যের কারণ কী ছিল? জনতা সরকারের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করুন।

৪। ৪২তম এবং ৪৪তম সাংবিধানিক সংশোধনী আলোচনা করুন।

১২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। Bipan Chandra and Others — *India Since Independence,* Penguin, 1999.

২। Tarlo Emma — *Unsettling Memories : Narratives of Emergency in Delhi*, University of California, 2001.

৩। R. C. Bhardwaj ed. — *Constitutional Amendment in India*, (sixth edn.) New Delhi, 1995.

একক ১৩ ❑ ভারত এবং বিশ্ব

গঠন

১৩.০ উদ্দেশ্য

১৩.১ ভূমিকা

১৩.২ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন

১৩.৩ ভারত এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র

১৩.৩.১ ভারত-চিন-সীমান্ত বিরোধ (১৯৬২)

১৩.৩.২ ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক : কাশ্মীর সমস্যা

১৩.৩.৩ কাশ্মীর সমস্যার সূত্রপাত

১৩.৩.৪ কাশ্মীর সমস্যার জটিলতা

১৩.৩.৫ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : ভারতের ভূমিকা

১৩.৩.৬ ভারত-নেপাল চুক্তি (১৯৫০)

১৩.৩.৬.১ ভারত-নেপাল চুক্তির পরিণতি

১৩.৪ উপসংহার

১৩.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু একটি স্বাধীন, সুচিন্তিত, বহিঃশক্তি প্রভাবমুক্ত বিদেশনীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে জোটনিরপেক্ষতার ধারণার অবতারণা করেন।
- কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক ছিল শুরু থেকেই পারস্পরিক মতবিরোধ ও সংঘাতপূর্ণ।
- ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে আওয়ামি লিগ নেতা শেখ মুজিবের রহমান-এর পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হয়।
- ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ৩১ জুলাই ভারত ও নেপালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৩.১ ভূমিকা

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু একটি স্বাধীন, সুচিন্তিত, পরদেশি প্রভাবমুক্ত বিদেশনীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে জোটনিরপেক্ষতার ধারণার অবতারণা করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে ভারতের মতো সদ্যস্বাধীন দেশের প্রধান লক্ষ্য দেশের উন্নয়ন, অভাব ও অনগ্রসরতা থেকে মুক্তি এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য বৃহৎ শক্তিগুলির সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদে জড়িয়ে পড়া ক্ষতিকারক। তাঁর যুক্তির প্রভাবে বহুসংখ্যক রাষ্ট্র নির্জোট আন্দোলনের অংশীদার হয় এবং তার নেতৃস্থানীয় হওয়ার সুবাদে ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

ভারত তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়টিতে অগ্রাধিকার দেয়। গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের অভ্যুদ্বয়ের পর প্রথম একদশককাল ভারত-চিন সম্পর্ক মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে চিন ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিরোধ শুরু হয়। তবে সত্তরের দশক থেকে চিন-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে শুরু করে। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক ছিল শুরু থেকেই পারস্পরিক মতবিরোধ ও সংঘাতপূর্ণ। এই সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ জাতিবিরোধ ১৯৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের চেহারা নিলে ভারত তার সামরিক কূটনীতি ব্যবহার করে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে সহায়তা করে এবং ভারতের এই সামরিক সাফল্য দেশে এক নূতন জাতীয় উদ্দীপনার সঞ্চার করে। স্বাধীনতার পর উত্তর সীমান্তে অবস্থিত নেপালের অবস্থান ভারতের নিরাপত্তা ও সুস্থিতির জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ৩১ জুলাই ভারত নেপালের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে। নেহেরুর মতে নেপালের নিরাপত্তা আর ভারতের নিরাপত্তা একে অন্যের পরিপূরক। ভূপ্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণে নেপালের পক্ষে ভারতকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

১৩.২ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে ভারতীয় বিদেশনীতির পথিকৃৎ বলা হয়। একটি স্বাধীন, সুচিন্তিত, পরদেশি প্রভাবমুক্ত বিদেশনীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে তাঁর বিশেষ অবদান হল জোটনিরপেক্ষতার ধারণা, যা দুই শিবিরের লড়াইকে অতিক্রম করে জাতীয় স্বার্থের অনুসরণকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। ভারতের মতো সদ্যস্বাধীন দেশগুলির প্রধান লক্ষ্য দেশের উন্নয়ন, অভাব ও অনগ্রসরতা থেকে মুক্তি। সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে বৃহৎ শক্তিগুলির সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদে জড়িয়ে পড়া অনর্থক এবং ক্ষতিকারক। কারণ, কোনো একটি শক্তিগোষ্ঠীর অনুগামী হওয়ার অর্থই স্বাধীন অবস্থানকে ক্ষুণ্ণ করা। জোটনিরপেক্ষতার অর্থ নিস্পৃহতা নয় বা বিশ্ব রাজনীতির বিতর্কিত বিষয়গুলি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া নয়। বরং কোনো গোষ্ঠীর মুখাপেক্ষী না হয়ে প্রতিটি প্রশ্নকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করার ক্ষমতাই স্বাধীন

বিদেশনীতির আসল চিহ্ন। এই ধারণা থেকেই নেহেরু জোটবদ্ধতার সমালোচনা করেন এবং পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে বাগদাদ চুক্তি, ম্যানিলা চুক্তি, সিয়াটো, সেন্টো প্রভৃতি জোটকে তিনি বিপজ্জনক মনে করেন। তাঁর যুক্তির প্রভাবে বহুসংখ্যক রাষ্ট্র নির্জোট আন্দোলনের অংশীদার হতে থাকে এবং নির্জোট আন্দোলনের নেতৃত্ব অর্পিত হয় ভারতবর্ষের ওপর। জোটের বিরুদ্ধে একটি ভিন্নমুখী জোট তৈরি করা এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য না হলেও একথা অনস্বীকার্য যে এই আন্দোলন তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে এক অভূতপূর্ব সংঘবদ্ধতায় আবদ্ধ করেছে এবং তার নেতৃত্বস্থানীয় হওয়ার সুবাদে ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

জওহরলাল নেহেরু এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মিলিতভাবে একটি জোটনিরপেক্ষ কূটনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবরে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে ভারতকে সামরিক বা অন্য কোনো জোটবদ্ধ রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখার নীতি ঘোষিত হয়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ২৯ এপ্রিল ভারত ও চিন পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দ্ধারণের জন্য পাঁচটি সূত্র উপস্থাপিত হয়। এই সূত্রগুলি একত্রে 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত। এই সূত্রগুলি হল—প্রত্যেকের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদাবোধ, পরস্পরের বিরুদ্ধে আগ্রাসন থেকে বিরত থাকা, অন্যের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা, সমমর্যাদা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। চিন ও ভারত উভয়েরই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সহযোগিতা ও সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে প্রথমে এশিয়ার চৌদ্দটি রাষ্ট্র নতুন দিল্লিতে মিলিত হয়ে পারস্পরিক ঐক্য শক্তিশালী করা, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রতিহত করা এবং ঔপনিবেশিক শাসন ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সংহতি জ্ঞাপনের অঙ্গীকার করে। এরপর ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ১৮-২৬ এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ ২৬টি এশিয়া-আফ্রিকার দেশ জওহরলাল নেহেরুর উদ্যোগে মিলিত হয়। বান্দুং সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত বিশ্বে আনুষ্ঠানিকভাবে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা করে।

১৩.৩ ভারত এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র

১৩.৩.১ ভারত-চিন সীমান্ত বিরোধ (১৯৬২)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চিনে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রতিষ্ঠা (১৯৪৯ খ্রিঃ) ও ভারতে সাম্রাজ্যবাদের অবসান এশিয়া তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের অভ্যুদয়ের পর প্রথম একদশক কাল ধরে ভারত-চিন সম্পর্ক মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল। নেহেরুর মতে সাম্যবাদী চিনের অভ্যুদয় সুদূর প্রাচ্যে ও বিশ্বরাজনীতিতে ভারসাম্য এনেছে। তাঁর মতে বিশ্বশান্তির পক্ষেও ভারত-চিন

মিত্রতা অপরিহার্য। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ২৯ এপ্রিল পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য 'পঞ্চশীল' অথবা পাঁচটি সূত্র ঘোষিত হয়।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে চিন ও ভারত—এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ভারতের সঙ্গে চিনের সীমান্ত বিরোধ শুরু হয়। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে নেহেরুর উদ্যোগে ভারত ও চিনের যৌথ প্রচেষ্টায় আন্ত-এশিয় ঐক্য, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ও বিশ্বশান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল তার কার্যকারিতা ক্ষুন্ন হয়। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে চিন যখন উপলব্ধি করেছিল, রাষ্ট্রসংঘ চিনের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে ভারতের ভূমিকার কোনো মূল্য নেই, তখন থেকেই ভারতের বন্ধুত্বকে আর সে গুরুত্ব দেয়নি। চিনের নিকট অনেক বেশি মূল্য পেয়েছিল সীমান্তের স্বার্থ। চিন-ভারত সীমান্তের ম্যাকমোহন রেখার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। চিন সরাসরি পূর্ব-সীমান্তের ভূটান-সীমান্ত তাওয়াং থেকে শুরু করে ভারতের পূর্ব সীমান্তে ব্রহ্মপুত্র-লোহিত নদী পেরিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ডিফু বর্ত্ম বেয়ে কুমজাওঙ্ বর্ত্ম, হিপুঙ্গণ বর্ত্ম এবং চাউঘন বর্ত্ম পর্যন্ত দাবি করেছিল। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে চিন লাদাখের অন্তর্গত আকসাই চিনে বড় রাস্তা বানিয়ে নেয় এবং সংশ্লিষ্ট কয়েকটি লাদাখী অঞ্চল দখল করে নেয়। চিন-ভারত সরাসরি যুদ্ধ বাধে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে। যুদ্ধে ভারতই ছিল আহতের ভূমিকায়, তবে ২১ নভেম্বর একতরফাভাবে যুদ্ধ থামিয়ে চিন তার স্বীকৃত সীমানায় ফিরে গিয়েছিল।

চিন-ভারত বিরোধের সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান চিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ নেয়। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পাক-ভারত যুদ্ধেও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় চিন ভারতের বিরোধীতা করে। সত্তরের দশকের শেষ থেকে চিন-ভারত সম্পর্ক পুনরায় স্বাভাবিক হতে শুরু করে। ১৯৭৭-৮০ খ্রিস্টাব্দে জনতা সরকার এবং ১৯৮০-৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্দিরা সরকার চিনের সঙ্গে সম্পর্কের পুনঃস্থাপনে উদ্যোগী হয়।

১৩.৩.২ ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক : কাশ্মীর সমস্যা

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক শুরু থেকেই পারস্পরিক মতবিরোধ ও সংঘাতপূর্ণ। এই সংঘাতপূর্ণ সম্পর্কের উৎস ভারতের প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। হিন্দু ও মুসলিম এই দুই ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বতন্ত্র চরিত্র সম্পর্কে মহম্মদ আলী জিন্না মন্তব্য করেছিলেন, 'It is a dream that the Hindus and Muslims can ever evolve a common nationality ..... The Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies, social customs and literature'. দেশ বিভাজনের বিনিময়ে নবজাত এই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের থেকে এদেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবর্তে অন্তহীন বৈরিতা প্রাধান্য পেয়েছে।

১৩.৩.৩ কাশ্মীর সমস্যার সূত্রপাত

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সমস্ত দ্বিপাক্ষিক সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম হল কাশ্মীর সমস্যা। ১৯৪৭-৪৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৬০১টি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে ৫৫৫টি ভারত ডোমিনিয়নে যোগদান করে। কিন্তু

দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে প্রধানতম ব্যতিক্রম হল কাশ্মীর রাজ্য। কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং কাশ্মীরকে ভারতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের প্ররোচনায় পাঠান উপজাতিরা কাশ্মীরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং মহারাজের প্রশাসন ভেঙে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় বাহিনী হস্তক্ষেপ করে এবং অন্যদিকে উপজাতিদের অনুগামী পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু হয়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে মুসলিম উপজাতি গোষ্ঠীর সশস্ত্র বাহিনীর কাশ্মীর অভিযানের ফলে দ্রুত রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে। দুটি কারণ কাশ্মীরের এই সশস্ত্র মুসলিম অভিযানের পেছনে কার্যকর ছিল। প্রথমত, মহারাজা হরি সিং-এর শাসনে হিন্দু ভূস্বামী গোষ্ঠী যথেষ্ট অত্যাচারী হওয়ায় মুসলিম সাধারণ মানুষ এই হিন্দু শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। কাশ্মীরের উপজাতি গোষ্ঠী পাকিস্তানের সাহায্যে এর প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করে। দ্বিতীয়ত, কাশ্মীরের পশ্চিম অংশে এই সময় গুজব রটানো হয় যে হরি সিং বিক্ষোভ দমন করার জন্য ভারতীয় বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। পাকিস্তান সরকার যেহেতু কাশ্মীরকে তার সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিল সেহেতু, এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে কাশ্মীরের জঙ্গি উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযান করার ব্যাপারে সে প্ররোচনা দেয় ও সক্রিয় সাহায্য করে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর কাশ্মীর উপজাতি আক্রমণ ঘটলে হরি সিং বাধ্য হয়ে ভারতের সাহায্য চান। ২৭শে অক্টোবর ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং হরি সিং-এর প্রধানমন্ত্রী মেহের চাঁদ মহাজনের মধ্যে একটি 'সমঝোতা পত্র' বা 'Instrument of Accession' স্বাক্ষরিত হয়। কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দেয়। কিন্তু বলা হয় যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থায় কাশ্মীর একটি পৃথক মর্যাদা ভোগ করবে। অর্থনীতি, বিদেশনীতি এবং প্রতিরক্ষা ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে কাশ্মীরে স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখা হবে। ভবিষ্যতে কাশ্মীরের গণভোটের আয়োজনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে কাশ্মীর ভারত অথবা পাকিস্তান কোন্ রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হবে। এই গণভোট না হওয়া পর্যন্ত কাশ্মীরকে পৃথক মর্যাদা দেওয়া হবে এবং কাশ্মীরে নির্বাচিত শাসককে প্রধানমন্ত্রীর সম্মানও দেওয়া হবে। কাশ্মীরের এই স্বাতন্ত্রের বিষয়টি পরে ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০নং ধারার অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই কাশ্মীরের দুই-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড ভারতীয় বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলেও সেই সময় এক-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড পাকিস্তান সমর্থিত হানাদারদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সেই অংশটি পরিচিত হয় আজাদ কাশ্মীর নামে। এই অবস্থায় পাকিস্তান দাবি করতে থাকে যে যেহেতু কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধিবাসীরা ভারতের বিরুদ্ধে সেই কারণে পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীরের সংযুক্তি এর একমাত্র রাজনৈতিক সমাধান। অপরদিকে ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয় যে কাশ্মীরের জনগণের রায় পৃথকভাবে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার আগে অধিকৃত এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল থেকে পাকিস্তান তার সমর্থিত হানাদারদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য। এইভাবে স্বাধীনতার পরেই ভারত ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্রের সম্পর্কের মধ্যে কাশ্মীর একটি জটিল সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়।

১৩.৩.৪ কাশ্মীর সমস্যার জটিলতা

কাশ্মীর সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ ছিল এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি। কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি ভারতীয় নেতৃত্বের কাছে জরুরি ছিল কারণ কাশ্মীর ভূখণ্ডে অধিকাংশ জমি হিন্দু ভূস্বামীদের দখলে থাকায় ঐ সব ভূস্বামী ও কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ভারতীয় নেতৃত্বের ওপর জোরালো চাপ ছিল। তাছাড়া কাশ্মীরের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কারণে কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্তি ভারতীয় রাষ্ট্রচরিত্রের ধর্মনিরপেক্ষতার দিকটিকে শক্তিশালী করবে—এই বিশ্বাস ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাদের মনে দৃঢ়মূল ছিল। অন্যদিকে পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের পক্ষে কাশ্মীরের মতো একটি মুসলিম অধ্যুষিত রাজ্যের ভারতে অন্তর্ভুক্তি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

কাশ্মীরের জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সমর্থন করেছিলেন কারণ তিনি মনে করতেন যে কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যোগ দিলে কোনো একজন শাসকের স্বৈরাচারের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নষ্ট হবে। ভারত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখেছিল। শেখ আবদুল্লার বিশ্বাস ছিল একমাত্র ভারতের সঙ্গে যোগ দিলে এবং ভারতের বিশাল বাজারের সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে যুক্ত হলে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষকে একটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। তিনি তাঁর দলের নতুন নামকরণ করেছিলেন National Conference যাতে তার পেছনে হিন্দু ও মুসলিম উভয় গোষ্ঠীর সমর্থন বজায় থাকে। ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের যোগদানের পর শেখ আবদুল্লাকে কাশ্মীরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পর প্রথম এক দশকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বিষয়টি সম্পর্কে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলীকে দেওয়া চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে ভারত রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবকে গুরুত্ব দেবে। কাশ্মীর সম্পর্কে সেখানকার মানুষের রায় মেনে নেবে। নেহেরু বলেছিলেন, 'We want no forced marriage, no forced union'. কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দে নেহেরুর মনোভাব পরিবর্তিত হয়। কারণ ইতিমধ্যে পাকিস্তান আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্টতার সুবাদে মার্কিন আধিপত্যবাদের ক্ষেত্র হিসাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করেছে। অপরদিকে চিন-ভারত পঞ্চশীল নীতির ঘোষণা সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার কূটনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে চিন-পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছে। এই পরিস্থিতিতে নেহেরুর মনোভাব পাকিস্তানের প্রতি কঠোর হয়।

ইতিমধ্যে গণতন্ত্রের পরিবর্তে পাকিস্তানে কেন্দ্রমুখী একনায়কতন্ত্র বা সামরিকতন্ত্রের দিকে ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। এই একনায়কশাসকের সাফল্যের অন্যতম শর্ত ছিল ভারতের বিরুদ্ধে বিদেশনীতি পরিচালনা করা। স্বভাবতই এক্ষেত্রে অন্যতম অবলম্বন ছিল কাশ্মীরের সীমান্ত সমস্যা। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আইয়ুব খান রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন। ভারত তিনটি কারণে আতঙ্কিত বোধ করেছিল। প্রথমত,

শুধু পাকসীমান্ত নয়, কাশ্মীরের ভৌগলিক অবস্থান ভারত-চিন সীমান্তের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুতরাং চিন-পাকিস্তান সমঝোতা ভারতের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে এই আশঙ্কা ভারত সরকারের ছিল। দ্বিতীয়ত, চিন পাকিস্তানের পক্ষে চলে যাওয়ায় এশিয়া ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত রাজনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয় ছিল। তৃতীয়ত, একই কারণে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃত্ব হারানোর আশঙ্কা ছিল। চিনকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে নেহেরু চিনের সঙ্গে সংঘাতের পথ বেছে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে চিন-ভারত যুদ্ধে ভারতের পরাজয় একদিকে যেমন ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুর্বলতা প্রকাশ করে, অন্যদিকে তেমনি পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়। এর ফলে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ভারত আক্রমণ করে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে অবশ্য পাকিস্তান সফল হয়নি। নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বেশ কিছুটা অঞ্চল ভারতীয় সেনাবাহিনী দখল করে নেয়।

পাকিস্তান ও ভারতের তৃতীয় সংঘর্ষ হয় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়। এই যুদ্ধে পাকিস্তান সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় এবং সেখানে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। নির্বাচিত পাক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সিমলায় যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, তার ফলে সম্পাদিত হয় সিমলা চুক্তি (৩ জুলাই, ১৯৭২)। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে কাশ্মীরকে নির্দিষ্টভাবে দ্বিপাক্ষিক সমস্যা হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয়ত, পূর্বেকার নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে যে ৩৫৪ বর্গমাইল এলাকা ভারতীয় সেনাবাহিনী দখল করে নিয়েছিল সেই এলাকাকে পাকিস্তান ভারতের অন্তর্ভুক্ত বলে মেনে নিয়েছিল। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ইন্দিরা গান্ধি দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার পর কাশ্মীর সম্পর্কে বেশি উগ্র নীতি অনুসরণ করেন।

১৩.৩.৫ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : ভারতের ভূমিকা

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ জাতিবিরোধ ১৯৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের চেহারা নেয়। ভারত সেই সুযোগে সামরিক কূটনীতি ব্যবহার করে পাকিস্তানের খণ্ডীকরণকে ত্বরান্বিত করে। পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশি মুক্তিফৌজকে সঙ্গে করে ভারতীয় সেনাবাহিনী জেনারেল অরোরার নেতৃত্বে পাকিস্তানি প্রতিরোধ প্রতিহত করে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে আওয়ামি লিগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হয়।

বাংলাদেশ যুদ্ধে ভারতবর্ষের অভূতপূর্ব সামরিক সাফল্য একটি যুগান্তকারী ঘটনা। যুদ্ধে উপযুক্ত সামরিক প্রস্তুতি ও কূটনৈতিক পরিকল্পনায় ভারতের এই সাফল্য ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে চিন-ভারত যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মুছে যায়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর দক্ষতা প্রমাণিত হয়। ইন্দিরা গান্ধির সাফল্য দেশে এক নূতন জাতীয় উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদ ও স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সূচনা করে। রাষ্ট্রপতি ইয়াইয়া খাঁ ক্ষমতাচ্যুত হন। জুলফিকর আলী ভুট্টা প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন

হন। পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাপে ভুট্টো ভারতের সঙ্গে শান্তি স্থাপনে আগ্রহী হন। ধৃত তিরানব্বই হাজার পাক বন্দি সেনাদের প্রত্যর্পণ সম্পন্ন করতে পাকিস্তানের দিক থেকে প্রচণ্ড তাগিদ ছিল। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ২৮ জুন জুলফিকর আলী ভুট্টো এবং শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধির মধ্যে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে দুই দেশ পরস্পরের সার্বভৌম অখণ্ডতা বজায় রাখা, যুদ্ধোত্তর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা লঙ্ঘন না করা বা কোনোভাবে পরিবর্তনের চেষ্টা না করা এবং ভবিষ্যতে যাবতীয় বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা কেবলমাত্র দ্বিপাক্ষিক স্তরেই আবদ্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়। বাংলাদেশের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করার শর্তে ভারত থেকে বন্দি প্রত্যার্পণ ও শুরু করা হয়।

১৩.৩.৬ ভারত-নেপাল চুক্তি (১৯৫০)

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর উত্তর সীমান্তে অবস্থিত নেপালের অবস্থান কূটনৈতিক দিক থেকে ভারতের নিরাপত্তা ও সুস্থিতির জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। ভারত ও চিন এই দুই বিশাল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যবর্ত্তী নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতা দক্ষিণ এশিয়া বিশেষত ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ১১ জুলাই ভারত ও নেপালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা ও সম্প্রতি রক্ষার পাশাপাশি উভয় দেশের বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলে পারস্পরিক সাহায্যের অঙ্গীকার করা হয়। জওহরলাল নেহেরুর মতে, নেপালের নিরাপত্তা আর ভারতের নিরাপত্তা একে অন্যের পরিপূরক।

১৩.৩.৬.১ ভারত-নেপাল চুক্তির পরিণতি

ভারত নেপালের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিল কিন্তু নেপাল কংগ্রেসের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক শাসনের পক্ষে আন্দোলনের শুরু হলে ভারত গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবির সপক্ষে মতামত ব্যক্ত করে। ভারত প্রভাবশালী রানা শাসকগোষ্ঠীর জন-বিরোধী ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করে। নেপালের রাজা ত্রিভুবন ভারতে আসেন। শেষপর্যন্ত ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে নেপাল কংগ্রেসের নেতা এম পি কৈরালার নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় বসে এবং রানা গোষ্ঠীর প্রভাব খর্ব হয়।

নেপালের উপর ভারত-এর সহাবস্থানমূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পাশাপাশি চিন তিব্বতের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে ভারত-চিন চুক্তির মাধ্যমে ভারত তিব্বতে চিনের প্রাধান্য মেনে নেয়। এর বিনিময়ে চিন সিকিম, ভুটান ও নেপালের উপর ভারতের বিশেষ স্বার্থকে স্বীকৃতি জানায়। এর ফলে নেপালের বৈদেশিক নীতির উপর ভারতের পরোক্ষ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের পর নেপাল চিনের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। চিন নেপালের সঙ্গে সীমান্ত বিষয়ক চুক্তি সম্পন্ন করে এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেয়। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে চিনের নিকট

ভারতের সামরিক পরাজয় হওয়ায় নেপালের কাছে ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। নেপাল ভারত-চিন মতানৈক্যের সুযোগ নিয়ে এই দুই দেশের নিকট থেকে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে থাকে। ভারত নেপালের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে সুর নরম করতে বাধ্য হয়। দেখা যায় যে ভারত-নেপাল সম্পর্কের বিন্যাস ভারত-চিন সম্পর্কের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। তবে ভূপ্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণে নেপালের পক্ষে ভারতকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

১৩.৪ উপসংহার

এই এককে আমরা আলোচনা করলাম স্বাধীনতা-উত্তর পর্যায়ে ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক ভারত গড়ে তুলেছিল, এই সম্পর্কের-বিন্যাসের পিছনে কী জাতীয় উপাদান কাজ করেছিল এবং ভারতের সাথে বিশ্বের সম্পর্কের বিবর্তন কীভাবে হয়েছিল। এই সময়কালের ভারতীয় বৈদেশিক নীতির মৌলিক অন্তর্বস্তু হল জোটনিরপেক্ষতা যা ভারতকে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় ও মর্যাদা দান করেছিল। আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন—উভয় জোটের বাইরে গিয়ে তৃতীয় বিশ্বের সদ্য-স্বাধীন উন্নয়নশীলদেশসমূহ-কে একজোট করে একটি নিরপেক্ষ বলয় রচনা করার কাজ খুব সহজ ছিল না; এই কঠিন দায়িত্ব ভারতবর্ষ পালন করেছিল। প্রতিবেশি দেশসমূহ যেমন চিন বা পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত সর্বদাই চেষ্টা করেছে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত সহ অন্যান্য বিবাদ-মীমাংসা সহ অন্যান্য করতে। ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার মানব-উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সব সময় সফল হয়নি। চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ তার প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে আরও মনে রাখা দরকার যে ভারতের বলিষ্ঠ ভূমিকা বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধকে তরান্বিত করেছিল। ভারতের পররাষ্ট্র নীতি নেপালের মতন ছোট প্রতিবেশি দেশের উন্নতির পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। ভারতের সঙ্গে বিশ্বের সম্পর্ককে তাই শান্তি, উন্নয়ন ও সুস্থিতির দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

১৩.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা কীভাবে হয়েছিল?

২। ভারত-চিন সীমান্ত বিরোধ (১৯৬২) সম্পর্কে টীকা লিখুন।

৩। কাশ্মীর সমস্যার সূত্রপাত কীভাবে হয়েছিল? কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের বর্ণনা দিন।

৪। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকার পরিচয় দিন।

৫। ভারত নেপাল চুক্তি (১৯৫০) এবং এর পরিণতি আলোচনা করুন।

১৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী — *সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, কলকাতা, ২০০৬।

২। অলককুমার ঘোষ — *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব (১৮৭০-২০০৬)*, কলকাতা, ২০০৭।

৩। প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় — *আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস*, কলকাতা, ২০১০।

৪। Harish Kapur — *India's Foreign Policy, 1947-92*, Sage Publications, 1994.

পর্যায় ৪ : অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি (১৯৫০-১৯৭০ এর দশক)

একক ১৪ ❑ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের কৃষিকাঠামো

গঠন

১৪.০ উদ্দেশ্য

১৪.১ ভূমিকা

১৪.২ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের কৃষিকাঠামো

১৪.২.১ ভূমি-সংস্কার ও জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ

১৪.২.২ ভূদান ও গ্রামদান আন্দোলন

১৪.২.৩ সমবায় ও সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা

১৪.৩ কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও সবুজ বিপ্লব

১৪.৪ উপসংহার

১৪.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- স্বাধীনতা-উত্তর কালে ভারতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে কৃষিকাঠামোয় কতকগুলি পরিবর্তন আনা হয়।
- কৃষিকাঠামোয় আনা পরিবর্তনগুলির মধ্যে ছিল ভূমি-সংস্কার, সমবায় কর্মসূচি তথা গোষ্ঠী-উন্নয়ন প্রকল্প, ঋণ এবং কৃষিতে উন্নত ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার।
- ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বেশির ভাগ প্রদেশে জমিদারি উচ্ছেদ কার্যকর হয়।
- গান্ধিবাদী নেতা আচার্য বিনোবা ভাবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় গ্রামীণ ভূমি ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হন। তাঁর এই প্রয়াস ভূদান আন্দোলন নামে পরিচিত।
- সরকারি উদ্যোগে কৃষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য সমবায় আন্দোলন ও সমষ্টি উন্নয়ন বা গোষ্ঠীগত উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

- ৮০-র দশকে ভারত খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া ছাড়াও খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানি করতে সক্ষম হয়।

১৪.১ ভূমিকা

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের লক্ষ্য ছিল স্থবির এবং পিছিয়ে পড়া অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনা এবং এ-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যে এই পরিবর্তনের সুফল যেন সমাজের কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার ঔপনিবেশিক আমলের কৃষিকাঠামোয় পরিবর্তন আনে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় মেনে ভূমি-সংস্কার, সমবায় কর্মসূচি, ঋণ, কৃষিতে আধুনিক কৌশল তথা উন্নত ধরনের প্রযুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১৪.২ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের কৃষিকাঠামো

কৃষিকাঠামো হল কৃষি উৎপাদন, কৃষি-সম্পর্ক এবং কৃষির উন্নতি সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত যা সময় বিশেষে পরিবর্তিত হয়েছে। স্থাধীনোত্তর ভারতে কৃষিকাঠামোয় বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। ভারত রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল স্থবির এবং পিছিয়ে পড়া অর্থনীতিতে পরিবর্তন আনা এবং এ-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যে এই পরিবর্তনের সুফল যেন সমাজের কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। এই বিষয়টিকে গুরত্ব দিয়ে সরকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কৃষিতে কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হয়। এদের মধ্যে ছিল ভূমি-সংস্কার, সমবায় কর্মসূচি, ঋণ, গোষ্ঠী-উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সবুজ বিপ্লব প্রভৃতি।

১৪.২.১ ভূমি-সংস্কার ও জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ

স্বাধীনতার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভূমিসংস্কার নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে গঠিত কৃষি সংস্কার কমিটির প্রতিবেদনে এই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছিল যে ব্যাপক ভূমি-সংস্কার ছাড়া কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়। এও বলা হয়েছিল স্বাধীন ভারতে সরকার ও কৃষকের মধ্যে মধ্যসত্ত্বভোগী অর্থাৎ জমিদারদের কোনো স্থান নেই এবং কৃষকের হাতে জমির মালিকানা থাকা প্রয়োজন। কৃষকদের যাতে জমি থেকে উচ্ছেদ করা না হয় সেজন্যও সুপারিশ করা হয়েছিল। ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির সর্বোচ্চ সীমাও স্থির করে দেওয়া হয়েছিল।

এই কমিটির অধিকাংশ সুপারিশ নেহেরুর আমলে ভূমি-সংস্কার নীতির ক্ষেত্রে কার্যকরী না হলেও ভূমি-সংস্কারের ক্ষেত্রে ভারত সরকার প্রথমে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য পদক্ষেপ নেয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, অসম প্রভৃতি অঞ্চলে জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৫১ ও ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানে প্রথম ও চতুর্থ সংশোধনী যোগ করে সরকার জমিদারি উচ্ছেদে অগ্রসর হয়। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বেশির ভাগ প্রদেশে জমিদারি উচ্ছেদ

কার্যকর হয়। ভূমি সংক্রান্ত নথি ও তথ্যের অভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হলেও শেষ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ কৃষক প্রজা জমির মালিকানা লাভ করে। জমি হারানোর ফলে জমিদাররা খুব বেশি ক্ষতিপূরণ পায়নি এবং পেলেও অনেক দেরিতে পেয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং জমিদারি প্রথার অবসান ঘটে। উদ্বৃত্ত জমি দরিদ্র চাষী ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। বর্গাদারদের জন্য তাদের ৬০ শতাংশ ফসলের ভাগ ধার্য করা হয়।

জমিদারি উচ্ছেদের ফলে জমিদাররা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। গোচারণ, পুকুর ইত্যাদি অকৃষি জমি তাদের অধিকারে ছিল। এছাড়া ব্যক্তিগত চাষের জমিও তারা রাখতে পারত। এই ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ অনেক প্রদেশে প্রথমে স্থির করে দেওয়া হয়নি। প্রভাবশালী জমিদাররা প্রশাসনকেও ব্যবহার করেছিল। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের ফলে পূর্বতন জমিদারেরা যে ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল তা তারা কৃষিতে বিনিয়োগ করে এবং ধনী ও সম্পন্ন কৃষকেরা উন্নত যন্ত্রপাতি ও আধুনিক প্রথায় চাষ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করেছিল।

স্বাধীন ভারতে যেসব প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল জমির মালিক এবং প্রজাদের স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান। ভূমি-সংস্কার নীতির ফলে কোনো কোনো অঞ্চলে কৃষক ও প্রজারা উপকৃত হলেও প্রজাস্বত্ব আইনের অস্বচ্ছতার সুযোগ নিয়ে বা বলপ্রয়োগ ও ভীতিপ্রদর্শন করে বহু প্রজাকে জমি থেকে উৎখাত করেছিল। প্রজাদের একটি ক্ষুদ্র অংশ জমির স্বত্ত্ব পেলেও অধিকাংশ প্রজাই রূপান্তরিত হয়েছিল ক্ষেতমজুর বা ভাগচাষীতে। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারি থেকে জানা যায় যে দেশের শতকরা ৮২ জন প্রজাই নিরাপত্তার অভাব বোধ করত। ভূমি-সংস্কার সত্ত্বেও ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ ছিল না এবং তারা নানাভাবে শোষণের শিকার হত। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ভাগচাষিদের যাতে স্বত্ব না জন্মায় সেজন্য ব্যাপকহারে ক্ষেতমজুর ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দেয়। ৬০-এর দশকের শেষেও বেশির ভাগ কৃষকের জমির মালিকানা স্বীকৃত হয়নি, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করণের উদ্যোগ নেয়। 'অপারেশন বর্গা' যদিও বৃহৎ সংখ্যক বর্গাদার বা ভাগচাষির জমির উপর ভোগদখলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছিল কিন্তু এই প্রক্রিয়াটিও সম্পূর্ণ সফল হয়নি। কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে সফল হলেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রজাস্বত্ত্ব বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুরক্ষিত হয়নি। রাজ্যগুলিতে চাষাবাদের সঙ্গে যুক্ত কৃষকদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করে আইন প্রণীত হয়। তবে অধিকাংশ রাজ্যে উৎপন্ন ফসলের ২০ থেকে ২৫ শতাংশ রাজস্ব নির্ধারিত হলেও কয়েকটি রাজ্যে যেমন—পাঞ্জাব, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশে ৩৩.৩ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত রাজস্ব ধার্য হয়। ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের কিছু অংশে সবুজ বিপ্লবের সূচনা হলে কৃষকের উপর অতিরিক্ত রাজস্বের চাপ পড়ে। পাঞ্জাবের কিছু অংশে রাজস্বের পরিমাণ ৭০ শতাংশে পৌঁছায়। এই পরিস্থিতিতে সম্পন্ন কৃষক যাদের জমির উপর ভোগদখলের নিরাপত্তা ছিল তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকলেও নিরাপত্তাহীন কৃষক বা ভাগচাষী অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েছিল। এ

সত্ত্বেও জমিদারি ব্যবস্থার অবলুপ্তি, প্রজাসত্ত্ব আইন তথা ভূমি সংস্কারের ইতিবাচক ভূমিকা স্বীকার করে অর্থনীতিবিদ Danial Tharner মন্তব্য করেছেন 'despite all the evasions, leakages, loopholes, and so on, many millions of cultivators who had previously been weak tenants or tenants at will were enabled to become superior tenants or virtual owners'. যে সব কৃষক এবং ভাগচাষী যারা জমি ভোগ দখলের স্বত্ব লাভ করেছিল এবং নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদান করত ; ভূমিহীন কৃষক যারা জমির উর্দ্ধসীমা নির্ধারণের সুবাদে অতিরিক্ত জমির মালিকানা লাভ করেছিল ; যে সব অনুপস্থিত জমিদার সরাসরি কৃষকে পরিণত হয়েছিল—এদের সকলের লক্ষ্য এবং সম্ভাবনা ছিল নিজেদের সম্পদকে ব্যবহার করে প্রগতিশীল কৃষকে পরিণত হওয়ার। এরা প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করার সুযোগ লাভ করেছিল যে সুযোগ ক্রমশ দরিদ্র কৃষকের নাগালের মধ্যে আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল।

১৪.২.২ ভূদান ও গ্রামদান আন্দোলন

সরকারি উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় জমিদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষক ও প্রজাদের মধ্যে বন্টনের পরিকল্পনাটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়নি। এই পরিস্থিতিতে গান্ধিবাদী নেতা আচার্য বিনোবা ভাবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় গ্রামীণ ভূমি ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হন। তাঁর এই প্রয়াস ভূদান আন্দোলন নাম পরিচিত। আইনের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন হয় না—এই ভাবনা থেকে তিনি ভূস্বামীদের হৃদয়ে পরিবর্তন এনে তাদের স্বেচ্ছায় জমিদান করার কাজে ব্রতী হন। আচার্য ভাবের লক্ষ্য ছিল 'সাম্যবাদী' সমাজ গঠন। তিনি বলতেন বাতাস, জল বা সূর্যকিরণের উপর যেমন কারও পূর্ণ অধিকার থাকতে পারে না তেমনি জমির উপরেও কারুর অধিকার নেই, বরং জমি ও সম্পত্তির উপর সমাজের সকলের অধিকার আছে। দেশের ভূমিহীন মানুষের জন্য তিনি জমি সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং চেয়েছিলেন মানুষ তার প্রতিবেশীকে জমি দিয়ে সাহায্য করুক।

আচার্য বিনোভা তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সর্বোদয় সমাজ গঠন করেন। তিনি ও তাঁর অনুগামীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ধনী ভূস্বামীদের অনুরোধ করেন দরিদ্র চাষীদের জমি দেওয়ার জন্য। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৩০ লক্ষ একর জমি ভূদানের জন্য পাওয়া গিয়েছিল। এর মধ্যে বেশিটাই ছিল বিহার থেকে। বিহারের গয়া জেলা ছিল আচার্য ভাবের আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ একর জমি ভূদানের জন্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। তবে এরপর আন্দোলনের গতি মন্থর হয়ে যায়।

ভূদান আন্দোলনের সাফল্য ছিল সীমিত। সারা ভারত জুড়ে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েনি। বিহারে সংগৃহীত জমির অনেকটাই ছিল অনুর্বর এবং কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত। মামলা চলায় কিছু জমি ছিল বিতর্কিত। এই কারণে সমস্ত জমি বণ্টন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের গোড়ায় প্রায় ৮ লক্ষ ৭২ হাজার একর জমি বন্টন করা সম্ভব হয়েছিল।

আচার্য ভাবের আন্দোলন ব্যাপক গণসমর্থন লাভ করেনি। জমিদাতাগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উর্বর জমি হাতছাড়া করেনি। রাজনৈতিক স্বার্থে কেউ কেউ এই আন্দোলনে অংশ নিলেও সাধারণভাবে কংগ্রেসের মধ্যে এ সম্পর্কে আন্তরিকতার অভাব ছিল। ভূস্বামীরা এই আন্দোলনে সহযোগিতা করেনি। তবে একথা অনস্বীকার্য যে উদ্বৃত্ত জমি বন্টনের সরকারি উদ্যোগ যেখানে সফল হতে পারেনি সেখানে ভূদান বা গ্রামদান আন্দোলন একটি বিকল্প পথের সন্ধান দিয়ে কৃষকদের মধ্যে কিছুটা আশা উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। বিনোভা ভাবে যে পদ্ধতিতে সমাজ পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছিলেন তার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল না।

১৪.২.৩ সমবায় ও সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা

স্বাধীনতার পর সরকারি উদ্যোগে কৃষি ও কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য সমবায় আন্দোলন ও সমষ্টি উন্নয়ন বা গোষ্ঠীগত উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সহযোগিতার মাধ্যমে ভারতীয় কৃষির উন্নতি এবং দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব এই ভাবনা থেকে সমবায় কর্মসূচি নেওয়া হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিবাদী নেতা কুমারাপ্পার সভাপতিত্বে গঠিত কৃষি সংস্কার কমিটি ছোট বড় সব ধরনের কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে সমবায়ের আদর্শ প্রয়োগের সুপারিশ করে। গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করে তার মাধ্যমে ঋণসংগ্রহ ও পণ্যবিক্রয় এবং ছোট কৃষকদের যৌথভাবে জমি চাষের কথা এতে বলা হয়। এর ফলে কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও বীজের জন্য কৃষকদের জমিদার বা মহাজনের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ছোট ও মাঝারি কৃষিক্ষেত্রগুলিকে একত্র করে সমবায় সমিতির অধীনে আনার সুপারিশ করা হয়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ২ অক্টোবর সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার সূচনা হয়। এই পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের মাধ্যমে কৃষি, পশুপালন, স্বাস্থ্য, সমবায় প্রভৃতি সরকারি বিভাগের কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে চাওয়া হয়। প্রায় ৩০০টি গ্রাম নিয়ে প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্প গঠিত হয়েছিল। এই ধরনের মোট ৫৫টি উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনের তত্ত্বাবধানে প্রথম পরিকল্পনায় সংগঠিত হয়। যে সব এলাকায় সেচ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃষ্টিপাত থেকে জলের সরবরাহ মোটামুটি সন্তোষজনক ছিল, সেই সমস্ত এলাকায় এই সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রতিটি উন্নয়ন এলাকা ১০০টি গ্রাম নিয়ে তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। ২০টি বিভাগ নিয়ে এক একটি গ্রাম গঠিত হত। সিদ্ধান্ত হয় উন্নয়ন এলাকাগুলিতে বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষি সরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহ করে উন্নয়নের প্রক্রিয়া কার্যকর করা হবে।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে গ্রাম পঞ্চায়েত ও সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে সমস্ত জমি একত্রিত করে সমবায়ের মাধ্যমে যৌথভাবে চাষ করা হবে। জমির উপর কৃষকের মালিকানা স্বীকৃত হবে এবং জমির অনুপাতের হারে কৃষক উৎপন্ন ফসলের ভাগ পাবে। যেসব ভূমিহীন কৃষক যৌথ খামারে চাষ করবে তারাও পরিশ্রমের মূল্য হিসাবে ফসলের নির্দিষ্ট ভাগ পাবে। এই পরিকল্পনা রূপায়িত হয়নি কারণ কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা হয়। রাজাগোপালাচারী, চরণ সিং প্রমুখ নেতা মন্তব্য করেন যে এইভাবে একটি

একনায়কতন্ত্রী সাম্যবাদী পরিকল্পনা জোর করে দেশবাসীর উপর চাপিয়ে দিলে তারা মেনে নেবে না। নেহেরু সংসদে এই পরিকল্পনা রূপায়িত না করার কথা ঘোষণা করেন। ফলে পরিকল্পনাটি বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারেনি।

ভারতে সমবায় আন্দোলন উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে শুরু হলেও কার্যক্ষেত্রে এই আন্দোলন অনেক সময় কায়েমি স্বার্থরক্ষার সহায়ক হয়েছিল। প্রভাবশালী সম্পন্ন কৃষকরা সমবায় সমিতি গঠন করে জমির উর্ধ্বতম সীমাসংক্রান্ত আইন বা প্রজাসত্ত্ব আইনগুলিকে লঙ্ঘন করে গ্রাম সমাজে নিজেদের ক্ষমতা অটুট রেখেছিল। জমির মালিকানার ক্ষেত্রে ক্রমবর্দ্ধমান অসাম্য, অকৃষিজীবীদের হাতে জমি চলে যাওয়া, কৃষিজীবীদের শহরাঞ্চলে চলে আসা এবং গ্রামীণ গোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি ছিল দ্রুত উন্নয়নের পরিপন্থী। তাছাড়া প্রতিটি উন্নয়ন এলাকার জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ও উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। বস্তুত উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ, জমির মালিক ও বর্গাদার এদের মধ্যে স্বার্থের সমন্বয় ঘটিয়ে গোষ্ঠীর উন্নয়ন করা ছিল কঠিন বিষয়। গোষ্ঠী-উন্নয়ন প্রকল্পের ফলশ্রুতি হিসাবে ঋণ সমবায় সমিতি, পঞ্চায়েত ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান তৈরি হলেও এই প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেন জমিদার ও মহাজনেরা। সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হওয়ার পরিবর্তে সম্পন্ন পরিবার, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি, অকৃষিকাজে যুক্ত ব্যবসায়ীরা উপকৃত হয়। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে রিজার্ভ ব্যাংক-এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়—'tenant cultivators agricultural labourers and others' secured only 4 to 6 percent of the total credit disbursed'.

১৯৫১-৫২ খ্রিস্টাব্দে গ্রাম স্তরের সমবায় সমিতি Primary Agrucultural Credit Societies (PACS) ২৩ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিল। এই ধরনের সমিতিগুলি ১৯৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে ২০০ কোটি টাকা এবং ১৯৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দে ৪,৯০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছিল।১৯৫১-৫২ খ্রিস্টাব্দে সমবায় সমিতিগুলি কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণের মাত্র ৩.৩ শতাংশ পূরণ করেছিল। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে তা পৌঁছেছিল ৩০ শতাংশের কাছাকাছি। এই পরিস্থিতিতে কৃষিজীবীরা বাধ্য হয়েছিল মহাজন, ব্যবসায়ী এবং ভূস্বামীদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতে।

কৃষিজীবীদের ঋণের বিভিন্ন উৎস (১৯৫১-১৯৮১)
শতাংশের হিসেবে

	১৯৫১-৫২	১৯৭১	১৯৮১
মহাজন, ব্যবসায়ী, ভূস্বামী প্রভৃতি	৯২.৭	৬৮.৩	৩৬.৮
সমবায় সমিতি	৩.৩	২২.০	২৯.৯
বাণিজ্যিক ব্যাংক	০.৯	২.৬	২৯.৪
সরকার	৩.১	৭.১	৩.৯

Source : *All India Debt and Investment Survey, 1961-62, 1981* cited in Bipan Chandra and others, India After Independence Penguin, 1999, p. 550.

১৪.৩ কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও সবুজ বিপ্লব

স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ঔপনিবেশিক কৃষিকাঠামোর রূপান্তর ঘটানোর প্রয়াস শুরু হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি। স্বাধীনতার পর প্রথম দিকে দেশে প্রয়োজনের তুলনায় কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট ছিল না। খাদ্যের চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব ছিল। কিন্তু ভারতীয় কৃষিতে প্রযুক্তিগত সংস্কারের সূচনা হওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, সবুজ বিপ্লবের আগমন ঘটে। সবুজ বিপ্লবের সঠিক সময় এবং এর পিছনে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণ কী ছিল তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কৃষিজীবী শ্রেণি বিশেষত দরিদ্র কৃষকের উপর সবুজ বিপ্লবের প্রভাব নিয়েও আলোচনা আছে।

নেহরুর সময়কালে অর্থাৎ স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ভারতীয় কৃষিতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ছাড়া প্রযুক্তিগত কৌশলের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তবে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পাশাপাশি আধুনিক কৃষিব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নেহেরু উপেক্ষা করেননি। ভাকরা-নাঙ্গাল-এর উন্নত সেচ এবং বিদ্যুৎ প্রকল্প, কৃষি বিদ্যালয়, কৃষি গবেষণামূলক পরীক্ষাগার, সার, উদ্ভিদ, প্রভৃতি ভারী শিল্পের পাশাপাশি স্থান করে নিয়েছিল। সবুজ বিপ্লব বিশেষজ্ঞ G. S. Bhalla মন্তব্য করেন, 'The qualitative technological transformation in India—the Green Revolution ... came about not during his lifetime but soon after his death. But the foundations for the technological development were laid during Nehru's time'.

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও ৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে খাদ্য সংকট তীব্র হয়। স্বাধীনতার পর ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় যার যোগান দেওয়া ভারতের বাজারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯৪৭-৪৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারকে বিদেশ থেকে প্রায় ৩ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছিল। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে এই আমদানির পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৫ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছিল। এই সময় ভারত-চিন যুদ্ধ (১৯৬২) এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৬৫) ছাড়া ১৯৬৫, ৬৬ খ্রিস্টাব্দে পরপর দুই বছর দুর্ভিক্ষের ফলে কৃষিজাত শস্যের ফলন ১৭ শতাংশ এবং খাদ্যশস্যের ফলন ২০ শতাংশ হ্রাস পায়।

এই পরিস্থিতিতে ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি খাদ্য উৎপাদন এবং আর্থিক দিক দিয়ে স্ব-নির্ভর হওয়া ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নূতন কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সমসাময়িক প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রী সি. সুব্রমনিয়ম এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি সকলেই ভারতের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা করেন। সেচ ব্যবস্থার সুবিধা আছে এমন এলাকায় উচ্চ ফসনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক দ্রব্য, কৃষিকাজে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি যেমন—ট্রাক্টর, সেচের জন্য পাম্প, কৃষি জমি পরীক্ষার ব্যবস্থা, কৃষি শিক্ষণ পরিকল্পনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ-এর ব্যবস্থা করা হয়। প্রাথমিকভাবে ৩২ মিলিয়ন একর জমি এবং

সমগ্র কর্ষিত জমির ১০ শতাংশ পরীক্ষামূলকভাবে এজন্য নির্ধারণ করা হয়। সরকারি বিনিয়োগ কৃষিতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।

কৃষিতে নূতন কৌশল এবং বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৭-৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রায় ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে খাদ্যশস্যের আমদানির পরিমাণ ১০.৩ মিলিয়ন টন থেকে হ্রাস পেয়ে ৩.৭ মিলিয়ন টনে পৌঁছয়। একই সময়ে খাদ্যশস্যের বৃদ্ধির পরিমাণ ৭৩.৫ মিলিয়ন টন থেকে ৯৯.৫ মিলিয়ন টনে পৌঁছয়। ৮০-র দশকে ভারত শুধুমাত্র খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানি করতেও সক্ষম হয়।

সবুজ বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ে বিশেষভাবে সত্তরের দশকের গোড়ায় এই ধরনের অভিমত পোষণ কার হয় যে সবুজ বিপ্লবের ফলে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণির মেরুকরণ সৃষ্টি করেছে। ধনী বা সম্পন্ন কৃষক দরিদ্র কৃষক বা কৃষিজীবীকে শোষণ করে শক্তিশালী হয়েছে। কারণ দরিদ্র কৃষক কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করতে না পেরে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়েছে। এছাড়া কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে কৃষি শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস, বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং কৃষি শ্রমিকের মজুরী হ্রাসের মতো ঘটনা ঘটে। এই পরিস্থিতিতে কৃষক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীকালের ঘটনা এবং আধুনিক গবেষণায় এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। ৬০ দশকের শেষ এবং ৭০-এর দশকে ইন্দিরা গান্ধির 'গরিবী হটাও' (Garibi hatao) অভিযানের লক্ষ্য ছিল গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র, ক্ষুদ্র কৃষক এবং ভূমিহীনদের উন্নয়ন। এ ব্যাপারে কয়েকটি পরিকল্পনা যেমন Rural Works Programme, Small Farmers Development Agency, Marginal Farmers and Agricultural Labourers Scheme, Cash Scheme for Rural Employment, The Employment Gurantee Scheme in Maharasthra প্রভৃতির সূচনা হয়। Small Farmers Development Agency এবং Marginal Farmers and Agricultural Labourers Scheme প্রকল্পের মাধ্যমে ১.৫ মিলিয়ন ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষককে স্বল্প থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়া হয়। এছাড়া বহুসংখ্যক দরিদ্র কৃষককে সমবায় সমিতি, ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ দেয়। এইভাবে ক্ষুদ্র কৃষক থেকে শুরু করে ভূমিহীন কৃষিজীবী নূতন প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের দুরবস্থা থেকে রক্ষা পায়।

গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণে সবুজ বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে খাদ্যশস্যের যোগান বৃদ্ধি পায়, স্বাভাবিকভাবে খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস পায়, কৃষি এবং অকৃষি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সম্ভব হয়, শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি পায়। কৃষক অসন্তোষের ঘটনা ঘটলেও তা একেবারে নিম্নস্তরভুক্ত কৃষকের দ্বারা সংগঠিত হয়নি। ক্ষুদ্র কৃষক থেকে শুরু করে বৃহৎ কৃষক যারা নূতন অবস্থায় উপকৃত হয়েছিল, তাদের চাহিদা বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে এই ধরনের অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল।

১৪.৪ উপসংহার

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের কৃষিকাঠামোর বিভিন্ন দিক ও বৈশিষ্ট্য এই এককে আমরা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করলাম। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সূত্র ধরে ১৯৪৭ সালে ভারত একটি পিছিয়ে পড়া অর্থনীতি লাভ করেছিল। দেশের অধিকাংশ মানুষ ছিল কৃষিনির্ভর। কিন্তু কৃষিকাঠামো ছিল বৈষম্যে ভরা। গ্রামীণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জমিদার-জোতদার-ভূস্বামী-কুলাক শ্রেণির প্রায় অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্য ছিল। স্বাধীন দেশের নেতৃবর্গ অনুধাবন করেছিল যে কৃষিকাঠামোর এই বৈষম্য দূর করতে না পারলে দেশের সাধারণ অগ্রগতি সম্ভব হবে না। ভূমি-সংস্কার নীতি প্রণয়ন ছিল এই চিন্তার ফসল। আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে শুধু আইন করে এই ধরনের কাজে সাফল্য পাওয়া কঠিন। এরজন্য প্রয়োজন ছিল দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা, কখনও কখনও যার অভাব হয়েছিল বলে মনে হয়। ফলে স্বাধীনতার অনেক বছর পরেও দেশে ভূমি-সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। আমূল ভূমি-সংস্কার ব্যতীত উৎপাদন বৃদ্ধি বা দারিদ্র দূরীকরণ—কোনোটাই সম্ভব নয়।

১৪.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের কৃষিকাঠামো আলোচনা করুন।

২। ভূমি সংস্কারের ফলে কৃষিজীবীরা কতটা সুরক্ষিত হতে পেরেছিল?

৩। গোষ্ঠী-উন্নয়ন প্রকল্প কি সফল হয়েছিল?

৪। সবুজ বিপ্লব বলতে কী বোঝায়? এই বিপ্লবের ফলে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষক কি উপকৃত হয়েছিল?

১৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। Bipan Chandra and Others — *India Since Independence*, Penguin, 1999.

২। A. H. Hanson — *The Process of Planning : A Study of India's Five year Planning, 1950-1964*, Clarendon Press, 1966.

একক ১৫ ❑ কৃষি-সম্পর্ক এবং কৃষক সংগ্রাম

গঠন

১৫.০ উদ্দেশ্য

১৫.১ ভূমিকা

১৫.২ কৃষি-সম্পর্ক

১৫.৩ কৃষক সংগ্রাম

১৫.৩.১ তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলন

১৫.৩.২ পাতিয়ালা মুজারা আন্দোলন

১৫.৩.৩ শ্রীকাকুলাম, অন্ধ্রপ্রদেশ আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ

১৫.৪ ঔপনিবেশিক-উত্তর পর্বে কৃষক আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা

১৫.৫ উপসংহার

১৫.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১৫.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে উৎপাদন বৃদ্ধিকে সামনে রেখে কৃষিকাঠামোয় পরিবর্তন করা হলেও এই পরিবর্তন কৃষি সম্পর্কের আশানুরূপ উন্নতি ঘটাতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে এক ধরনের জঙ্গি ও শ্রেণি সচেতন কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়।
- কমিউনিস্ট পার্টি কৃষকদের সংগ্রামের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করায় কৃষক আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে।
- ঔপনিবেশিক আমলের শেষ পর্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনে কৃষক রমণী পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে যেমন লড়াই করেছেন, স্বাধীনতা-উত্তর পর্বেও সংগঠিত কৃষক সংগ্রামগুলিতেও একই ভাবে কৃষক রমণীদের দুঃসাহসিক সংগ্রাম লক্ষ্য করা গেছে।

১৫.১ ভূমিকা

প্রাক্-ঔপনিবেশিক থেকে ঔপনিবেশিক-উত্তর পর্বে ভারতে কৃষিকাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে কৃষি সম্পর্কে পরিবর্তন এসেছে। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে উৎপাদন বৃদ্ধিকে সামনে রেখে কৃষিকাঠামোয় পরিবর্তন করা হয় কিন্তু এই পরিবর্তন কৃষি সম্পর্কের আশানুরূপ উন্নতি ঘটাতে পারেনি। ফলে কৃষক অসন্তোষ তৈরি হয় এবং এই পরিস্থিতিতে এক ধরনের জঙ্গি ও শ্রেণি সচেতন কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে গড়ে ওঠা কৃষক আন্দোলনগুলির সূত্র ধরে অন্যায়, অবিচার ও শোষণের প্রতিকারকল্পে একতা, সাহস এবং কঠোর সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা নিয়ে দেশের নানা প্রান্তে স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে কৃষক সংগ্রামের ঘটনা ঘটে, মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে পরিচালিত ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক আমলের শেষ পর্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনে কৃষক রমণী পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে যেমন লড়াই করেছেন, স্বাধীনতা-উত্তর পর্বেও সংগঠিত কৃষক সংগ্রামগুলিতেও একইভাবে কৃষক রমণীদের দুঃসাহসিক সংগ্রাম লক্ষ্য করা গেছে।

১৫.২ কৃষি-সম্পর্ক

প্রাক্-ঔপনিবেশিক থেকে ঔপনিবেশিক-উত্তর-পর্বে ভারতে কৃষিকাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে কৃষি সম্পর্কে পরিবর্তন এসেছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সর্বত্র খাজনা বা রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে জমির উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করা। ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় আঞ্চলিক তারতম্য ছিল। ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারি ব্যবস্থা, মাদ্রাজ ও বম্বে প্রেসিডেন্সীতে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে মহলওয়ারী বন্দোবস্ত এবং অযোধ্যা অঞ্চলে তালুকদারী বন্দোবস্ত প্রচলিত হয়েছিল। জমিদারি ব্যবস্থায় জমিদারদের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত আদায় করা হতো। বিভিন্ন ধরনের ভূমি বন্দোবস্তের মাধ্যমে রাজস্ব চাহিদার পরিবর্তন ঘটেছিল এবং এই পরিবর্তনশীল রাজস্ব চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে রায়তদের মধ্যে এক ধরনের অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল।

স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকে সামনে রেখে কৃষিকাঠামোয় পরিবর্তন আনা হয়। কৃষিকাঠামোয় যে সব পরিবর্তন বা সংস্কারের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে ছিল ভূমি-সংস্কার, সমবায় কর্মসূচি, ঋণ, গোষ্ঠী-উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার যেমন মধ্যস্বত্বভোগী যেমন জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ, ভূমি রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস, জমির উপর কৃষকের মালিকানার স্বীকৃতি, অধিকৃত জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ প্রভৃতি কৃষক স্বার্থে গৃহীত হয়। কিন্তু ভূমি সংস্কারের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ সফল না হওয়ায় অনেক রাজ্যে কৃষকদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। এই পরিস্থিতিতে কৃষি সম্পর্কের উন্নতি আশানুরূপ না হওয়ায় কৃষক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সবুজ বিপ্লব, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, কৃষক চেতনাবৃদ্ধি

এক ধরনের জঙ্গি ও শ্রেণি সচেতন কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করে। জমিদার ও মহাজনেরা বা অকৃষিকাজে যুক্ত ব্যবসায়ীরা সরকার প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে গণআন্দোলনের নতুন তরঙ্গ লক্ষিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টি কৃষকদের সংগ্রামের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করায় কৃষক আন্দোলন নূতন মাত্রা লাভ করে।

১৫.৩ কৃষক সংগ্রাম

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে গড়ে ওঠা কৃষক আন্দোলনগুলির সূত্র ধরে অন্যায়, অবিচার ও শোষণের প্রতিকারকল্পে একতা, সাহস এবং কঠোর সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা নিয়ে দেশের নানা প্রান্তে স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে কৃষক সংগ্রামের ঘটনা ঘটে। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে শুরু হওয়া তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলন এবং Patiala and East Punjab States Union (PEPSU) কৃষক আন্দোলন থেকে শুরু করে ৬০-এর দশকের শেষে নকশাল আন্দোলন এবং ৮০-এর দশকে 'নতুন কৃষক' (New Farmers) আন্দোলন প্রভৃতি বিচিত্র কৃষক সংগ্রাম চলেছিল নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে। এছাড়া এই পর্বে বেশ কয়েকটি স্বল্প পরিচিত আন্দোলন ছিল ১৯৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারে খারওয়ার আদিবাসী কৃষকদের সংগ্রাম, ১৯৬৭-৭৫ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রের ধূলিয়া জেলায় ভীলদের সংগ্রাম, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে মহারাষ্ট্রে ওয়ারলি কৃষক বিদ্রোহ। পাঞ্জাব এবং অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষকরা সেচ কর আরোপের প্রতিবাদে এবং বিক্রয়জাত ফসলের মূল্য বৃদ্ধি সহ কয়েকটি দাবিতে বিদ্রোহ করে। কমিউনিস্ট পার্টি (CPI) ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সর্বভারতীয় কৃষি শ্রমিক সংগঠন 'ভারতীয় খেত মজদুর ইউনিয়ন' গঠন করে। তাঞ্জোর এবং কেরালাসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে।

স্বাধীনতা লাভের প্রত্যাশায় এবং কৃষি সম্পর্কের পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ১৯৪৫-৪৭ খ্রিস্টাব্দে সারা দেশে কৃষক আন্দোলনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এগুলির মধ্যে বাংলায় তেভাগা আন্দোলন এবং পাঞ্জাবে Canal Colonies Tenants' আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতার আবহে এবং দেশভাগের কারণে ভাঙন ধরে। কিন্তু দুটি আন্দোলন প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব থেকে স্বাধীনতা-উত্তরকালে সক্রিয় ছিল। একটি হল হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানায় কৃষক বিদ্রোহ এবং অপরটি PEPSU-র পাতিয়ালা এলাকায় কৃষক আন্দোলন। উভয় আন্দোলনই সাম্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং সমসাময়িক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল।

১৫.৩.১ তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলন

হায়দ্রাবাদ রাজ্যের তেলেঙ্গানা বা তেলেগুভাষী অঞ্চল ছিল এক জনবিরোধী সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরশাসনের শিকার। সেখানে আইনের শাসন ও নাগরিক অধিকার ছিল না। মুসলমান ভূস্বামী এবং উচ্চবর্ণের হিন্দু দেশমুখরা কৃষকদের নিকট থেকে বলপূর্বক বাধ্যতামূলক শ্রম (ভেট্টি) আদায় করতেন। কৃষকদের কাছ থেকে ইচ্ছেমত খাজনাও আদায় করা হত। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও সমর্থকরা স্থানীয় বিষয়গুলি নিয়ে

তেলেঙ্গানা অঞ্চলের কৃষকদের সংগঠিত করতে সচেষ্ট হন। কমিউনিস্টরা 'অন্ধ্র মহাসভা' নামে গণসংগঠনের মাধ্যমে তাদের কাজ শুরু করেন। তাঁদের উদ্যোগে তেলেঙ্গানা আন্দোলন জমি ও ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে পরিণত হয়। কমিউনিস্টরা এবং 'অন্ধ্র মহাসভা'র কর্মীরা নিজাম সরকার এবং নিজামের বাহিনী রাজাকারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে কমিউনিস্টরা কৃষক স্বার্থ রক্ষা করতে এগিয়ে এলে কৃষক আন্দোলন দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা যুব সংগঠন গঠন করে অস্ত্র সংগ্রহ করতে থাকেন। প্রথমে জেলা স্তরে, পরে আঞ্চলিক স্তরে সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী তৈরি করা হয়। সূর্যপেট, নালগোণ্ডা, হজুরনগর তালুকগুলিতে সশস্ত্র বাহিনী গঠিত হয়। অল্প সময়ের মধ্যে তেলেঙ্গানার গ্রামাঞ্চলে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। যেসব জমি ঋণের দায়ে কৃষকদের নিকট থেকে ৩০-এর দশকে মহামন্দার সময় জমিদাররা ঋণের দায়ে দখল করেছিল, সেগুলি কৃষকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কৃষি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, সরকার অধিকৃত পতিত জমি, বনাঞ্চল ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। জমিদারদের নিকট থেকে প্রথমে ৫০০ একর এবং পরে ১০০ একরের অতিরিক্ত জমি বাজেয়াপ্ত করে অতিরিক্ত জমি ভূমিহীন কৃষক এবং ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১৩ সেপ্টেম্বরে নিজাম বিরোধী আন্দোলনে জনগণের সক্রিয়তা উপলব্ধি করে ভারতীয় বাহিনী হায়দ্রাবাদে অগ্রসর হয়। জনগণ এই বাহিনীকে অভ্যর্থনা জানায়। অল্প সময়ের মধ্যে নিজাম এবং তাঁর বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। তেলেঙ্গানা আন্দোলনের পর সরকারের উদ্যোগে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে জায়গিরদারি উচ্ছেদ আইন (Jagirdari Abolition Act) এবং হায়দ্রাবাদ প্রজাস্বত্ত্ব এবং কৃষি আইন (Hyderabad Tenancy and Agricultural Act) নামে দুটি আইন প্রণীত হয়। ছয় লক্ষের বেশি কৃষককে সুরক্ষিত কৃষক (Protected Tenants) হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এইসব কৃষকদের সহজ শর্তে জমি ক্রয় করার অধিকার দেওয়া হয়। কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার কারণে ভূমি-সংস্কার কর্মসূচি অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয়। এই আন্দোলনের ফলে তেলেঙ্গানায় ভূস্বামীদের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা পি. সুন্দরাইয়া *Telengana People's Armed Struggle 1946-1951* গ্রন্থে লিখেছেন—৩০০০ গ্রামের প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ প্রায় ১৬,০০০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ওয়ারঙ্গল, নালগোণ্ডা ও খান্নাম—এই তিনটি জেলা বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র ছিল। 'এই গ্রামগুলিতে গ্রামাঞ্চলে নিজামের স্বৈরতন্ত্রের স্তম্ভ ঘৃণ্য ভূস্বামীদের তাদের দূর্গের মতো সুরক্ষিত বাড়ি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল এবং কৃষকরা তাদের জমিগুলি দখল করে নেন'।

১৫.৩.২ পাতিয়ালা মুজারা আন্দোলন

পাঞ্জাবের বৃহৎ দেশীয় রাজ্য পাতিয়ালায় স্বাধীনতার সময়কালে মুজারা বা কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, যার উৎপত্তি হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ দিকে। এখানকার জমিদাররা যারা বিশ্বেদর নামে পরিচিত ছিলেন তাদের প্রথমের দিকে শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়ের অধিকার ছিল। পরবর্তীকালে শাসন ব্যবস্থায় তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির মালিকানা দাবি করে। এর ফলে প্রায় ৮০০টি গ্রামে বংশানুক্রমিকভাবে

জোগদখল করা কৃষক দখলদারী কৃষকে পরিণত হয়। এই কৃষকরা জমিদারদের দাবি অবৈধ বলে মনে করে। কৃষকদের এই পুঞ্জিভূত অসন্তোষ বিশের দশকে আকালি এবং প্রজামণ্ডল আন্দোলনের সময় ব্যক্ত হয়। ত্রিশের দশকে অনেক প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনের সুবাদে আন্দোলন শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এই সময় কমিউনিস্টরা সক্রিয় হওয়ায় কৃষক আন্দোলন উৎসাহিত হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এবং মুজারা আন্দোলনে নেতৃত্বদানে এগিয়ে আসে। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে থেকে এই আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে মুজারা এবং বিশ্বেদরদের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে পাতিয়ালা ভারত-ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়। মহারাজা সব বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় মুজারাদের ওপর দমননীতি অনুসরণ করেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে Patiala and East Pubjab States Union (PEPSU) গঠিত হলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়। কিন্তু PEPSU-র কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় কিছু সংখ্যক জমিদার সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে মুজারদের ওপর আক্রমণ চালায়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে 'লাল কমিউনিস্ট দল' (Lal Communist Party) মুজারাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে PEPSU Tenancy Act প্রণীত হয় যার মাধ্যমে কৃষকদের সুরক্ষা দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস PEPSU-তে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হলে পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি শাসনের সময়কালে রাষ্ট্রপতি PEPSU Occupancy Tenants Act (1953) প্রণয়ন করেন। এই আইন বলে দখলিস্বত্ববান প্রজা ভূমি রাজস্বের ১২ গুণ ক্ষতিপূরণ দানের বিনিময়ে তাদের জমির মালিকানা লাভ করে। এই আইন কমিউনিস্টদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি কারণ তারা ক্ষতিপূরণ ছাড়া জমির ওপর কৃষকদের দাবি প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু কৃষকরা এই আইন সমর্থন করেছিল এবং এরপর আর কোনো প্রতিরোধের ঘটনা ঘটেনি।

১৫.৩.৩ শ্রীকাকুলাম, অন্ধ্রপ্রদেশ আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ

অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তরে শ্রীকাকুলাম জেলায় স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী যেমন জাতাপু এবং সাভারা ছিল বেশিরভাগই নিরক্ষর। এরা গভীর জঙ্গলে বসবাস করত। পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই কমিউনিস্টরা এদের সংগঠিত করতে থাকে। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এরা সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে ভূস্বামী এবং মহাজনদের দ্বারা অবৈধভাবে কেড়ে নেওয়া জমি ফিরে পায়, তাদের মজুরি বৃদ্ধি পায়, অরণ্যে উৎপাদিত পণ্য বেশি মূল্যে বিক্রয় করতে সক্ষম হয়, ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং অরণ্যে বাড়ী তৈরির জন্য কাঠ সংগ্রহ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের জন্য অরণ্যে প্রবেশের অনুমতি লাভ করে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর থেকে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির মধ্যে এটি সশস্ত্র আন্দোলনের চেহারা নেয়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী ভূস্বামী, মহাজন, পুলিশ, অরণ্যের কর্মচারীদের হত্যা করে। তবে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসের মাঝামাঝি এই আন্দোলন দমিত হয়। ১৯৭১

খ্রিস্টাব্দে কিছু মাওবাদী নেতা আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষীণ চেষ্টা করলেও ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই আন্দোলনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

১৫.৪ ঔপনিবেশিক-উত্তর পর্বে কৃষক আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা

মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে পরিচালিত ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন থেকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ভারত-ছাড়ো আন্দোলন কৃষক ও আদিবাসী মহিলাদের যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল এবং উচ্চবর্গের মহিলাদের সঙ্গে তারাও সভা-সমিতি, মিছিলে যোগদান করেছিলেন। ঔপনিবেশিক আমলের শেষ পর্যায়ে গড়ে ওঠা বাংলায় তেভাগা কৃষক সংগ্রাম, মহারাষ্ট্রে ওয়ারলি কৃষক বিদ্রোহ, অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা কৃষক বিদ্রোহে কৃষক-রমণী পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে লড়াই করেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বেও সংগঠিত কৃষক সংগ্রামগুলিতেও একইভাবে কৃষক-রমণীদের দুঃসাহসিক সংগ্রাম লক্ষ্য করা গেছে।

তেভাগা সংগ্রামের সমসাময়িক কালে দক্ষিণ ভারতে গড়ে ওঠা তেলেঙ্গানা কৃষক বিদ্রোহ ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল। এই বিদ্রোহ ছিল হায়দ্রাবাদ রাজ্যের স্বৈরাচারী শাসক নিজামের বিরুদ্ধে প্রজাস্বত্বহীন ভাগচাষী, খেতমজুর ও কৃষক রমণীদের এক দুঃসাহসিক সংগ্রাম। এই সংগ্রামের কারণ ছিল কৃষকদের ওপর জায়গীরদার ও দেশমুখদের চরম শোষণ ও অত্যাচার, জমি থেকে নির্বিচারে উচ্ছেদ, বে-আইনি খাজনা আদায় এবং পুরুষ-নারী নির্বিশেষে 'বেগার' শ্রমদান। এই সংগ্রামে কৃষক রমণীদের অংশগ্রহণের কারণ ছিল লিঙ্গজনিত বৈষম্য ও বঞ্চনা, সামাজিক শোষণ, যৌন লাঞ্ছনা এবং ধর্ষণ।

তেলেঙ্গানা সংগ্রামে কৃষক শ্রেণি যে সব দাবি তুলেছিলেন তার মধ্যে ছিল বেগার শ্রমের বিলোপ সাধন, জায়গীরদার ও দেশমুখ কর্তৃক বেআইনীভাবে দখল করা জমির প্রত্যাবর্তন, জমিদারি প্রথার বিলোপ, সরকারি জমি কৃষক ও ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন, কৃষক ও খেত মজুরদের নিকট থেকে অতিরিক্ত খাজনা আদায় না করা, কৃষকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান, ঋণের চড়া সুদের হার কমানো বা ঋণমুকুব। কৃষকদের এইসব দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বামপন্থী মহিলা সংগঠন 'অন্ধ্র মহিলা সঙ্ঘম' এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মহিলা খেতমজুররা জমিরক্ষা ও আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য পুরুষদের সহযোগী হিসাবে লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁরা গ্রাম রক্ষা এবং পুলিশ ও রাজাকার বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য লঙ্কার গুড়ো, ইট, পাথর ইত্যাদি নিয়ে এগিয়ে যেতেন। পিটার কাস্টার্স এর বক্তব্য অনুযায়ী, জঙ্গল এলাকায় যখন সশস্ত্র গেরিলা 'স্কোয়াড'গুলি রণকৌশলজনিত কারণে পিছু হটত, তখন মহিলারা পুরুষ যোদ্ধাদের খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি এবং মহিলা সঙ্ঘম বেআইনি ঘোষিত হলে মহিলারা নিজেরাই এই সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। এই ক্ষেত্রে মহিলাদের সাফল্য তেলেঙ্গানা সংগ্রামকে শক্তিশালী করেছিল।

উত্তরবঙ্গের তেভাগা আন্দোলনের মতো ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ির আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। আন্দোলনের শুরু থেকেই নিম্নবর্গের কৃষক ও আদিবাসী মহিলারা, বিশেষত রাজবংশী, সাঁওতাল, ওঁরাও উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায়ের তপশিলি জাতি-উপজাতির ভাগচাষী, বর্গাদার ও ভূমিহীন চাষি পরিবারের মহিলারা ব্যাপক সংখ্যায় অংশ নিয়েছিলেন। আন্দোলন জেলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়লে সি.পি.আই.(এম.এল.)-এর নেতৃত্বে বহু শিক্ষিতা মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা আন্দোলনের সমর্থনে ও সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। তবে নেতৃত্বের আপত্তি থাকায় মহিলারা সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দেননি। মধ্যবিত্ত পরিবারের বেশ কিছু মহিলা কর্মী যেমন অসীমা পোদ্দার, জয়া মিত্র, মালিনা চক, কল্পনা সেন, অর্চনা গুহ, মীনাক্ষী সেন, কৃষ্ণা বন্দোপাধ্যায়, রমা দেবী প্রমুখ গ্রামাঞ্চলে গিয়ে স্থানীয় কৃষক পরিবারের আন্দোলনরতা মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী গ্রামের মহিলারা অধিকাংশই ছিলেন নিরক্ষর আদিবাসী উপজাতি এবং স্বল্প শিক্ষিত মহিলা যারা জোতদার ও মহাজনদের শোষণের শিকার হতেন। আন্দোলনের গতিবেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি দমন-পীড়ন বৃদ্ধি পায়। মহিলাদের গ্রেপ্তার করে জেলবন্দি করা হয় এবং জেলে তাদের ওপর চলে অকথ্য অত্যাচার এমন কি ধর্ষণও। সশস্ত্র কৃষক বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র যন্ত্রের উচ্ছেদের স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত না হলেও এই আন্দোলনের প্রভাবে অন্যান্য রাজ্যে কৃষকরা সংগ্রাম শুরু করেছিলেন।

১৯৭২-৭৮ খ্রিস্টাব্দে উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল ও কুমায়ুন পাহাড় অঞ্চলের আদিবাসী রমণীরা চিপকো (গাছকে জড়িয়ে থাকা) আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। এই আন্দোলন ছিল অরণ্য বাঁচানোর বা প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করার আন্দোলন। প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বড় হওয়ায় গাছ ও অরণ্য রক্ষা তাদের নিজেদের এবং গৃহপালিত পশু-পাখির জন্য যে অপরিহার্য তা তারা উপলব্ধি করেছিলেন এবং এই উপলব্ধি থেকেই ব্যবসায়ী, ঠিকাদারিদের কুড়লের কোপ থেকে গাছ ও অরণ্য বাঁচানোর জন্য 'মহিলা মঙ্গল দল' গঠন করে নিজেদের সংঘবদ্ধ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। মহিলারা পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে, জেলে বন্দি থেকে নানারকম অত্যাচারের শিকার হয়ে আন্দোলনে জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির হস্তক্ষেপে ১৫ বছরের জন্য গাছ কাটা স্থগিত থেকেছে।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রের ধূলিয়া জেলার শহড়া উপজাতি এলাকায় খরা, ত্রাণ ও জমিজমার দাবিতে ভীল উপজাতির মহিলারা এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে মহারাষ্ট্রের ধূলিয়া জেলায় ৪টি অধিবাসী অধ্যুষিত তালুকে কৃষকদের উপর ভূস্বামীদের অত্যাচার ও জোর-পূর্বক জমি দখল চলেছিল। বংশানুক্রমিকভাবে ভোগ দখল করা সামান্য জমি যাতে জমিদাররা কেড়ে না নেয় তার জন্য তাঁরা জমিদারদের সব রকমের আদেশ পালন করতেন। বিনিময়ে তাদের সহ্য করতে হত নানা রকমের শোষণ ও অত্যাচার, এমন কি ধর্ষণ পর্যন্ত। এর প্রতিবাদে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রের ধূলিয়া জেলায় শুরু হয়েছিল ভূমিমুক্তি আন্দোলন। আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে মহিলারা সামনের সারিতে না এলেও পরে তাঁরা আন্দোলনের পুরোভাগে এসে আন্দোলন সংগঠিত করেন। উল্লেখ্য, এই আন্দোলন প্রথমে জমি ফিরে পাওয়ার আন্দোলন হিসাবে শুরু হলেও পরে তা পরিবারের পুরুষদের বিরুদ্ধে মদ্যপান বিরোধী এবং

স্ত্রী-অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। মহিলারা তাঁদের সংগঠন 'শ্রমিক স্ত্রী মুক্তি সংগঠন' (১৯৭৯)-এর মাধ্যমে এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিলেন। এই সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে 'স্ত্রীমুক্তি মেলায়' কয়েক হাজার নারী মিলিত হয়ে মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন এবং পারিবারিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন। বলা যেতে পারে, এই ধরনের আন্দোলনগুলি কৃষক ও আদিবাসী রমণীদের অন্যায় সম্পর্কে চেতনা এবং সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়।

১৫.৫ উপসংহার

ঔপনিবেশিক-উত্তর কৃষিকাঠামোয় ভূমি-সংস্কার সহ যে সব পরিবর্তন এসেছিল, তা অনেক রাজ্যে কৃষকদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করতে না পারায় কৃষি সম্পর্কের উন্নতি আশানুরূপ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে এক ধরনের জঙ্গি ও শ্রেণি সচেতন কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়। কমিউনিষ্ট পার্টি কৃষকদের সংগ্রামের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করায় কৃষক আন্দোলন নূতন মাত্রা পায়। কৃষক সংগ্রামগুলির পেছনে কতকগুলি একই ধরনের কারণ কাজ করেছিল। এদের মধ্যে ছিল কৃষকদের উপর ভূস্বামীদের চরম শোষণ ও অত্যাচার, বর্গাদারদের উপর অত্যাচার ও তাদের জমি থেকে নির্বিচারে উচ্ছেদ, বে-আইনি খাজনা আদায়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বাধ্যতামূলক শ্রমদান, কৃষকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান না করা, চড়া সুদের হার, শ্রেণি, জাত-পাত, ধর্ম ও বর্ণের বৈষম্যের ভিত্তিতে গ্রামের কৃষক ও আদিবাসী মহিলাদের আর্থ-সামাজিক শোষণ এবং অত্যাচার প্রভৃতি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আন্দোলনগুলি ছিল সংগঠিত এবং স্বতঃস্ফূর্ত। আন্দোলনের নতুন নতুন রণকৌশল তৈরি হয়েছিল এবং নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এর ফলে একদিকে যেমন আন্দোলনগুলি দমন করার তাগিদে রাষ্ট্রযন্ত্রের নিপীড়ন বেড়েছিল, অন্যদিকে তেমনি শঙ্কার কারণ হয়েছিল। এই শঙ্কা থেকেই আন্দোলনগুলি প্রশমনের লক্ষ্যে রাষ্ট্র কৃষকদের অনেক দাবি দাওয়া মেনে নিয়ে আইন প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল। এখানেই আন্দোলনের সাফল্য নিহিত।

১৫.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে কৃষক অসন্তোষের কারণগুলি কী ছিল?

২। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা কৃষক আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৩। ঔপনিবেশিক-উত্তর পর্বে কৃষক আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা কী ছিল?

৪। কৃষক আন্দোলনগুলি প্রশমনের লক্ষ্যে সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিল?

৫। কৃষক আন্দোলনগুলির সাফল্য ও ব্যর্থতার পরিচয় দিন।

১৫.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। Bipan Chandra and Others — *India Since Independence*, Penguin, 1999.

২। সুনীতি কুমার ঘোষ — *নকশালবাড়ি : একটি মূল্যায়ন*, কলকাতা, ২০১০।

৩। অমল দাশ — *ভারত ইতিহাসে নিম্নবর্গের নারী শ্রমিক—এদের সংকট ও সংগ্রাম উনিশ থেকে বিশ শতক*, কলকাতা, ২০১৩।

৪। কুণাল চট্টোপাধ্যায় — *তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৮৭।

৫। সুস্নাত দাশ — *অবিভক্ত বাঙলার কৃষক সংগ্রাম*, কলকাতা, ২০০৭।

একক ১৬ ❑ উন্নয়নের পথে ভারত : অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

গঠন

১৬.০ উদ্দেশ্য

১৬.১ ভূমিকা

১৬.২ উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারত : ঔপনিবেশিক কাঠামোর উত্তরাধিকার

১৬.৩ ঔপনিবেশিক কাঠামোর সঙ্গে পার্থক্য

১৬.৪ স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রেক্ষাপট

১৬.৫ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও ভারতীয় অর্থনীতি : নেহেরুর আমল

১৬.৬ নেহেরু আমলে অর্থনীতির মূল্যায়ন

১৬.৭ রাজনৈতিক পুনর্গঠন

১৬.৮ উপসংহার

১৬.৯ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১৬.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- ভারতে স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে ঔপনিবেশিক যুগের রাজনীতিতে পরিবর্তন আসে।
- পরিকল্পিত অর্থনীতি অনুসরণের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।
- নেহেরুর সময় ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে আপাতদৃষ্টিতে আর্থিক প্রগতি ঘটলেও অন্তরালে ব্যর্থতাও নিহিত ছিল।
- নেহেরু যে স্বপ্নের ভারত গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যে বিরাট প্রত্যাশা তিনি স্বাধীনতার জন্মলগ্নে জানিয়েছিলেন তার অনেকটাই অধরা থেকে গিয়েছিল।

১৬.১ ভূমিকা

ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ফলে ভারতে যে অনুন্নয়ন ও অনগ্রসরতা দেখা দিয়েছিল তাকে অতিক্রম করে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া স্বাধীন ভারত সরকারের পক্ষে সহজ ছিল না। ভারত স্বাধীন হলেও ঔপনিবেশিক প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসাও কঠিন ছিল। ঔপনিবেশিক স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ইংরেজরা যে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল স্বাধীন ভারত তা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে না পারলেও উন্নয়ন ও জনকল্যাণকর স্বার্থে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে নিজের মতো করে অগ্রসর হতে চেয়েছে।

১৬.২ উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারত : ঔপনিবেশিক কাঠামোর উত্তরাধিকার

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা এসেছিল, কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ফলে ভারতে যে অনুন্নয়ন ও অনগ্রসরতা দেখা দিয়েছিল তাকে অতিক্রম করে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া নতুন সরকারের পক্ষে সহজ ছিল না। তবে যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের হাত ধরে ভারত স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয়েছিল তা উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের উপর গভীর ছাপ ফেলেছিল। সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারপন্থী কবি, লেখক, সঙ্গীতবিদ, দার্শনিক, শিল্পপতি, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনায়ক সকলেই সাধারণ মানুষকে আলোর দিশা দেখিয়েছেন, লড়াই করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, আবার সাধারণের উদ্যোগে নিজেরাও সামিল হয়েছেন। এই সমবেত প্রয়াস স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রকে একটি নতুন রূপ, বৈধতা এবং স্থিতিস্থাপকতা দিয়েছিল।

তবে স্বাধীনতার জন্মলগ্নে জওহরলাল নেহেরুর ঘোষণা 'পুরাতনকে ত্যাগ করে নতুন ভারত আঁখি মেলে তাকালো' সত্যি হয়নি। পুরাতনকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা নতুন ভারতের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শতসহস্র মানুষের অশ্রুধারায় নিষিক্ত এই স্বাধীনতাকে অমলেশ ত্রিপাঠী 'জন্মসূত্রে প্রতিবন্ধী' বলে বর্ণনা করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে স্বাধীনতা অর্জনের তুলনায় দেশগঠনের কাজটি কোন অংশেই কম কষ্টসাধ্য ছিল না। নতুন ভারতের রূপ কী হবে, তার অভ্যন্তরীণ কাঠামো কীভাবে রচিত হবে বা কীসের ভিত্তিতে বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠবে তা নিয়ে অনিশ্চতা ও উদ্বেগ ছিল। ভারত স্বাধীন হলেও ঔপনিবেশিক প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসা সহজ ছিল না। ঔপনিবেশিক স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ইংরেজরা যে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল স্বাধীন ভারত তা থেকে মুক্ত হতে পারেনি, যদিও উন্নয়ন ও জনকল্যাণের লক্ষ্যে সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে নিজের মতো করে অগ্রসর হতে চেয়েছে।

স্বাধীন ভারতে গৃহীত সংবিধানের অনেকটাই ব্রিটিশ সংবিধান থেকে নেওয়া। ভারতীয়দের সাংবিধানিক সরকার, গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে ধারণা ব্রিটিশ আমলে সৃষ্ট। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল্‌স্

এ্যাক্ট দিয়ে এই সাংবিধানিকতার পথে যাত্রা শুরু, পরবর্তীকালে ১৮৯২ সালের আইন, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মর্লে-মিন্টো সংস্কার, ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড আইন এবং ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত-শাসন আইন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ভারতীয়রা শাসনব্যবস্থায় সীমিত প্রতিনিধিত্ব লাভ করে ছিল। প্রশাসনিক কাঠামো ও আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রে পুরাতন ব্রিটিশ কাঠামো অপরিবর্তিত ছিল। তবে ব্রিটিশ আমলে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ছিল প্রশাসকদের প্রধান কাজ, স্বাধীন ভারতে তাঁদের কাজ করতে হয়েছিল জনকল্যাণ ও উন্নয়নের স্বার্থে।

১৬.৩ ঔপনিবেশিক কাঠামোর সঙ্গে পার্থক্য

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামো ও শাসনব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক ছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারত পরিণত হয়েছিল একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত সরকার শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েছিলেন। ইংরেজ শাসনের ভিত্তি ছিল ভীতি, আইন প্রণয়নে দেশবাসীর কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। প্রশাসন ও বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ হয়নি। কিন্তু স্বাধীনতার পর ভারতের আইন, প্রশাসন ও বিচার বিভাগকে পৃথক করে একে অপরের কাজে হস্তক্ষেপ না করার নীতি নেওয়া হয় এবং বিচার বিভাগকে প্রশাসনের উপর রাখা হয়। ভারতে আইনসভা বা সংসদ জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ায় দেশের আইন প্রণয়নে জনস্বার্থ প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

ইংরেজরা ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থকে ব্রিটিশ অর্থনীতির স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। কৃষির উন্নতির দিকে নজর দেওয়া হয়নি। জমিদার এবং মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচারে কৃষকদের অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। ঔপনিবেশিক শুল্কনীতি ভারতে শিল্প বিকাশের পথ রুদ্ধ করেছিল। সকল প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য ভারত ইংল্যান্ডের উপর নির্ভরশীল ছিল।

স্বাধীন ভারতে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এছাড়া সমবায় আন্দোলন ও গোষ্ঠী-উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ও জমিদার-মহাজনদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা দূরীকরণের চেষ্টাও করা হয়। বেসরকারি শিল্পেও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় এবং বিদেশি প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ভারী শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে নিরাপত্তার অভাব বোধ না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। ধর্মীয় ভিত্তিতে সংরক্ষণ প্রথা বাতিল করে যৌথ নির্বাচন চালু করা হয়। তবে অনগ্রসর ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য সংরক্ষণ চালু ছিল। সমাজে প্রগতিশীল ও উন্নয়নমূলক আইন প্রণয়ন করা হয় এবং নারী প্রগতির বিষয়ে উদ্দ্যোগ নেওয়া হয়। তবে স্বাধীনতার লগ্নে যে সব জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছিল নেহেরু সমস্ত কিছুর মীমাংসা করতে পারেননি। এ সত্ত্বেও বিশ্বের এই বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি আজও তার অস্তিত্ব বজায়

রেখেছে। নেহেরুর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা পরিকল্পনার প্রভাব থেকে আজকের ভারত সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারেনি।

১৬.৪ স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রেক্ষাপট

মানব সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী হলেও ভারত স্বাধীনতার সময় ছিল অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ফলে কৃষি, শিল্প ও প্রযুক্তিতে স্বনির্ভর হতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়ে নেহেরু স্বাধীনতার পর পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পূর্বেই ভবিষ্যৎ ভারতের আর্থিক উন্নয়ন নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয় এবং এ-বিষয়ে জাতীয় নেতারা রাষ্ট্রের ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে সমসাময়িক কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে এবং জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি কৃষি, শিল্প, সমাজ-কল্যাণ, অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে এবং রাষ্ট্রের উদ্যোগে খনি, রেল, জাহাজ, পরিবহন ইত্যাদি বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার কথা ভাবে। কিন্তু দেশ পরাধীন থাকায় এইসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি।

অর্থনীতি সম্পর্কে নেহেরুর প্রবল আগ্রহ ছিল। এ-বিষয়ে তিনি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, টি. টি. কৃষ্ণমাচারি প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের মত গ্রহণ করতেন। মহাত্মা গান্ধি বৃহৎ শিল্প স্থাপনের বিপক্ষে ছিলেন এবং স্বনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতির মাধ্যমে ভারতের উন্নতি হবে মনে করতেন। কিন্তু নেহেরু উপলব্ধি করেছিলেন যে যন্ত্রচালিত শিল্পায়ন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সোভিয়েত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সাম্যবাদের বাস্তব প্রয়োগ নেহেরুকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

স্বাধীনতার আগে ভারতে বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করার উদ্যোগ দেখা দেয়। সাধারণভাবে লক্ষ্য ছিল শিল্প নির্ভর অর্থনীতির বিকাশ। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন ভারতের প্রথম শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। এই শিল্পনীতির মধ্য থেকেই পরবর্তীকালে শিল্পায়নের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই শিল্পনীতি ভবিষ্যতের 'মিশ্র অর্থনীতি'র সূচনা করে। এই শিল্পনীতিতে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই শিল্পনীতিগুলিকে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়। (ক) প্রথমটি চিহ্নিত হয় সম্পূর্ণ একচেটিয়া সরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্র হিসেবে। (খ) দ্বিতীয় শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় লৌহ-ইস্পাত, কয়লা, খনিজ তেল, জাহাজ ও উড়োজাহাজ নির্মাণের মত শিল্পসমূহকে। (গ) তৃতীয় শ্রেণিকে চিহ্নিত করা হয় সরকারি নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্র হিসাবে। (ঘ) অন্যান্য সমস্ত শিল্পকে চতুর্থ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারতের পরিকল্পনার যুগ শুরু হয় ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু পরবর্তী চার দশক ধরে ভারত সরকারের শিল্প সংক্রান্ত নীতিগুলির প্রধান ভিত্তি ছিল ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে এই শিল্পনীতি।

স্বাধীন ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি থেকে রাজনীতিবিদ ও সরকারি উদ্যোক্তাদের সমবেত চিন্তাধারার ফলশ্রুতি হিসাবে। এই অর্থনীতির রূপায়ণে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কেইন্স এর প্রভাব যেমন অনস্বীকার্য তেমনি সুভাষচন্দ্র বসুর মত রাজনীতিবিদ এবং পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাসের মত শিল্পপতির চিন্তাধারাও এই পরিকল্পিত অর্থনীতির সূচনা করেছিল।

১৬.৫ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও ভারতীয় অর্থনীতি : নেহেরুর আমল

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে পরিকল্পনা কমিশন ঐ বছরের এপ্রিল থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তাব রচনা করে এবং ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর ডিসেম্বর মাসে নবগঠিত সংসদে তা পেশ করে। এই পরিকল্পনার দুটি লক্ষ্য ছিল : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং দেশ বিভাগের ফলে উদ্ভূত অস্থির অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা। সামাজিক ন্যায় ও আদর্শের ভিত্তিতে ভারতের অর্থনীতির যথাসম্ভব দ্রুত সুষম বিকাশ—এই দুই লক্ষ্যের প্রেক্ষাপটে প্রথম যোজনায় কয়েকটি বিষয় যেমন মুদ্রাস্ফীতি সমস্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য ও কাঁচামালের ঘাটতি পূরণ, উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বাসন, দেশের অর্থনীতির ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করা, জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার দ্রুততর করে জীবনধারণের মান উন্নত করা, আর্থিক বৈষম্য কমানো ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সামগ্রিকভাবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনেকাংশে সফল হয়েছিল। জাতীয় আয়, খাদ্য উৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল প্রশংসনীয়। শিল্পের ক্ষেত্রে মিলের তৈরি কাপড় এবং স্টিম ইঞ্জিনের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। জলসেচ ও রেল পরিবহনের সম্প্রসারণ ঘটেছিল। কৃষিক্ষেত্রে জমিদারি প্রথার বিলোপ ঘটানো হয় এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগ বাড়ানো হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ছাত্রসংখ্যা বাড়ানো হয় এবং নতুন কিছু হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রও খোলা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল ভারি শিল্প এবং মূলধনী শিল্প। বেশিরভাগ শিল্পে সরকারি উদ্যোগ প্রাধান্য পেলেও বেসরকারি উদ্যোগ নিষিদ্ধ হয়নি যদিও সেখানে সরকারি নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ মেনে চলার কথা বলা হয়েছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নেহেরুর সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ পূর্ণ রূপায়ণের সুযোগ না পেলেও ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে তাঁর এই মতাদর্শ প্রাধান্য পেতে থাকে। তবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পুঁজিপতি শ্রেণি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং শিল্পপতি ঘনশ্যামদাস বিড়লা এর প্রধান সমর্থক ছিলেন। আসলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, সেচ ও ইস্পাত উৎপাদনের দায়িত্বে সরকার না এগিয়ে এলে পুঁজিপতিদের পক্ষে এই গুরদায়িত্ব গ্রহণ করা কঠিন ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মূলধনী বস্তু, অর্থাৎ শিল্পের সহায়ক বস্তু উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল শিল্পে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য। সরকারি উদ্যোগে ব্রিটিশ সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের দূর্গাপুর, রুশ সহায়তায় মধ্যপ্রদেশের ভিলাই-এ এবং

জার্মান সহায়তায় উড়িষ্যার রাউরকেল্লাতে তিনটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কারখানা স্থাপিত হয়। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন টাটার লৌহ-ইস্পাত কারখানা ও অন্যান্য বড় কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছিল। ট্রাক্টর, মোটর সাইকেল, স্কুটার, নিউজপ্রিন্ট, ওষুধ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পোদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের উপর। পাঁচ শতাংশ জাতীয় আয় বৃদ্ধি, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা, প্রাথমিক শিল্পের বিকাশ, কর্মসংস্থান এবং ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস ছিল এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। তৃতীয় পরিকল্পনায় যে সব ব্যয় বরাদ্দ ধার্য হয়েছিল তার মধ্যে পরিবহন, যোগাযোগ ও সমাজকল্যাণ ছাড়া কোনো ক্ষেত্রেই লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ করা যায়নি। খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় মূল্যবৃদ্ধি দেখা দেয়। শিল্প উৎপাদন হ্রাস পায়। পরিকল্পনা চলাকালীন চিনা আক্রমণ (১৯৬২) পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ (১৯৬৫) হওয়ার কারণে সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছিল। বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

১৬.৬ নেহেরু আমলে অর্থনীতির মূল্যায়ন

নেহেরুর সময় ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে আপাতদৃষ্টিতে আর্থিক প্রগতি ঘটলেও অন্তরালে ব্যর্থতাও নিহিত ছিল। কৃষিতে উন্নতি সত্ত্বেও খাদ্য উৎপাদন ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করার মতো প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত অধিকাংশ কৃষিজীবীর হাতে না থাকায় সম্পন্ন জোতদার শ্রেণি লাভবান হয়েছিল। পরিকল্পনা কমিশনের তত্ত্বাবধানে গ্রামাঞ্চলে যে গোষ্ঠী-উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল তাতে গ্রামে বিশেষত কৃষির উন্নতির উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু গ্রামের মৌলিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় পরিবর্তন না এনে গ্রামে পরস্পর স্বার্থবিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয়সাধন ও উন্নয়ন ছিল কঠিন ব্যাপার। ফলে গোষ্ঠী-উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণদানের জন্য সমবায় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সুযোগ নিয়েছিল পূর্বতন জমিদার ও মহাজন সম্প্রদায়। নেহেরুর মিশ্র অর্থনীতিতে গরিবরা বিশেষ উপকৃত হয়নি। সম্পদ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা পুঞ্জিভূত হয়েছিল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে। দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরেও ভারতীয় জনগণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে সার্বিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। দারিদ্র ও বেকারত্বের সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৬.৭ রাজনৈতিক পুনর্গঠন

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে ঔপনিবেশিক যুগের রাজনীতিতে পরিবর্তন আসে। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটের দ্বারা সংগঠিত সংসদের ভিতরে ও বাইরে রাজনীতিচর্চা নূতন মোড় নেয়, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে

সংগ্রামের পরিবর্তে স্বাধীন ভারতে নূতন রাজনীতির লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় সংসদের আসন দখল, সরকারে ক্ষমতার লড়াই এবং গণআন্দোলন গড়ে তোলা। স্বাধীনতার পর ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর নেহেরু আমলে ১৯৫৭ ও ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে আরও দুটি নির্বাচন হয়। তিনটি নির্বাচনেই কংগ্রেস সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং জওহরলাল নেহেরু সংসদীয় নেতা ও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হন।

স্বাধীনতার পর কমিউনিস্ট পার্টি তার অবস্থান পরিবর্তন করে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের পর কমিউনিস্ট দল সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা ত্যাগ করে সংসদীয় পথ গ্রহণের দিকে অগ্রসর হয়। কমিউনিস্ট দল ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে অংশ নেয়। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে পার্টির মাদুরাই সম্মেলনে নেহেরু সরকারের পররাষ্ট্র নীতির প্রশংসা করা হয়, তবে একই সঙ্গে সরকারের অভ্যন্তরীণ নীতির নিন্দা করে বলা হয় সেগুলি সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবাহী। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের কমিউনিস্ট পার্টির বেজওয়াড়া সম্মেলনে কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে 'ঐক্য ও সংগ্রাম' এর নীতি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কমিউনিস্ট পার্টির অপেক্ষাকৃত বামপন্থী অংশ অবশ্য এই কারণে নরমপন্থী নেতৃত্বের সমালোচনা করেন এবং বুর্জোয়া নেহেরু সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার বিরোধীতা করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে চিন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে পার্টির বামপন্থী অংশ সি. পি. আই (এম) নামে নতুন দল গঠন করে এবং ভারত-রাষ্ট্রকে বুর্জোয়া ও ভূস্বামী শ্রেণির শ্রেণি শাসনের হাতিয়ার হিসাবে বর্ণনা করে।

সাধারণ নির্বাচনগুলিতে লোকসভার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক বিধানসভাতেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এগুলির অধিকাংশেই কংগ্রেস দলের সাফল্য সূচিত হলেও আঞ্চলিক দলগুলি কিছু পরিমাণে সাফল্য লাভ করেছিল। তবে উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটে যখন ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে নবগঠিত কেরল প্রদেশে কমিউনিস্টরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। নেহেরু সরকার এই কমিউনিস্ট সরকারকে বরখাস্ত করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে যা গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়।

১৬.৮ উপসংহার

নেহেরু যে স্বপ্নের ভারত গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যে বিরাট প্রত্যাশা তিনি স্বাধীনতার জন্মলগ্নে জাগিয়েছিলেন তার অনেকটাই অধরা থেকে গিয়েছিল। খাদ্য ও পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে ভারত ক্রমেই পশ্চিমি দেশগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। ১৯৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেই ভারত ৩৪৮ মিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছিল। কৃষির ক্ষেত্রে জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটলেও কৃষকেরা জমির প্রকৃত মালিকে পরিণত হতে পারেনি। ঋণগ্রস্ত হয়ে জমি ছেড়ে শহরে কলকারখানায় মজুরি করতে যাওয়ার ধারাটি স্বাধীনতা-উত্তর যুগেও অব্যাহত ছিল। গ্রামে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যাপক ধনবৈষম্য ছিল। ভূমি-সংস্কারকে নেহেরু যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি। দরিদ্র কৃষকদের স্বার্থে আইন

প্রণীত হলেও আইনের সাহায্য নিয়ে আদালতে লড়বার মতো টাকা কৃষকদের হাতে ছিল না। গণতন্ত্রের পূজারি বলে পরিচিত হলেও ভারত সুরক্ষা আইন জারি করে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধকরণ করা এবং কেরলে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা তাঁর গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচায়ক নয়।

১৬.৯ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। আপনি কি মনে করেন নেহেরু সরকার ঔপনিবেশিক কাঠামোকে অটুট রেখেছিল?

২। স্বাধীনোত্তর ভারতে গৃহীত পরিকল্পিত অর্থনীতির পটভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

৩। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল্যায়ন করুন।

৪। স্বাধীনোত্তর ভারতে রাজনৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

১৬.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১। Bipan Chandra and Others — *India Since Independence*, Penguin, 1999.

২। অম্লান দত্ত — শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে *ভারতের আর্থিক বিকাশ*, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০।

৩। ভবতোষ দত্ত — *'উন্নয়নের অর্থনীতি ও নেহেরু'*, নেহেরু জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, দেশ।

৪। সরোজ মুখোপাধ্যায় — *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা*, কলকাতা, ১৯৮৫।

একক ১৭ ❑ শিল্পায়ন এবং শ্রমিক : পুঁজি, শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন

গঠন

১৭.০ উদ্দেশ্য
১৭.১ ভূমিকা
১৭.২ শিল্পপুঁজি : প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব
১৭.৩ শিল্পপুঁজি : স্বাধীনোত্তর পর্ব
১৭.৪ পুঁজিপতি শ্রেণির চরিত্র
১৭.৫ শ্রমিক আন্দোলন ও ইউনিয়ন সংগঠন : প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব
১৭.৬ শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন : ঔপনিবেশিক-উত্তর পর্ব
১৭.৭ উপসংহার
১৭.৮ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী
১৭.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- ভারতে শিল্পায়ন এবং শিল্পপুঁজির বিকাশের প্রক্রিয়া ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিল। ভারত একটি পরাধীন দেশ হওয়ায় শিল্পপুঁজির উদ্ভব ও বিকাশ স্বাধীনভাবে হওয়া সম্ভব ছিল না।
- স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ও প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা কাটানোর তেমন উদ্যোগ নেয়নি।
- উনবিংশ শতকের শেষ দিকে ভারতে সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯২০-র দশকের শেষ থেকে সারা ভারতে কিছু সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন স্থায়ী ভিত্তিতে পরিচালিত হতে থাকে।
- বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা এবং কর্মীরা তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও কর্মসূচি অনুযায়ী শ্রমিকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন।
- ঔপনিবেশিক-উত্তর পর্বেও শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের উপর রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাব পড়েছিল। বেশির ভাগ ট্রেড ইউনিয়নগুলি রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দলের নির্দেশ অনুযায়ী কর্মসূচি নির্দ্ধারণ করত।

- সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে দুর্বল করেছিল।

১৭.১ ভূমিকা

ভারতের শিল্পায়ন এবং শিল্পপুঁজির বিকাশের প্রক্রিয়া ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। তবে ভারত ব্রিটেনের দ্বারা বিজিত একটি পরাধীন দেশ হওয়ায় শিল্পপুঁজির উদ্ভব ও বিকাশ স্বাধীনভাবে হওয়া সম্ভব ছিল না। স্বাধীনতার পর সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে অর্থনৈতিক বন্ধন আরও শক্তিশালী হয়। বিদেশি পুঁজির প্রয়োজনীয়তা শুধুমাত্র দেশের সম্পদের পূরক হিসেবে নয়, বিনিয়োগকারীদের মনে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন তা সরকারি মনোভাবে ব্যক্ত হয়। স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ও প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা কাটানোর তেমন উদ্যোগ নেয়নি। এছাড়া বৃহৎ শিল্পপুঁজিপতিদের একটা বড় অংশ জন্ম থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিভিন্ন বন্ধনে এবং সামন্ত জমিদার ও মহাজনি পুঁজির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে আবদ্ধ ছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মূলত বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ এবং ঔপনিবেশিক উদ্যোগ খনি, চটকল, বস্ত্রশিল্প এবং রেলওয়ের মত পরিবহন ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পরে ভারতে স্পষ্টত এক নতুন সামাজিক শ্রেণি হিসাবে শিল্প শ্রমিকের আবির্ভাব ঘটে। শ্রমিক শ্রেণি তাদের অসহনীয় দুর্দশা ও অত্যাচারের প্রতিবিধান কল্পে আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠে এবং উনবিংশ শতকের শেষ দিক থেকে ভারতে সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা হয়। প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে ১৯২০-র দশকের শেষ থেকে সারা ভারতে কিছু সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন স্থায়ী ভিত্তিতে পরিচালিত হতে থাকে। ক্রমে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা এবং কর্মীরা তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও কর্মসূচি অনুযায়ী শ্রমিকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন এবং শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবি দাওয়াকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হন।

ঔপনিবেশিক-উত্তর পর্বেও শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের উপর রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাব পড়েছিল। বেশিরভাগ ট্রেড ইউনিয়নগুলি রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দলের নির্দেশ অনুযায়ী কর্মসূচি নির্ধারণ করত। সামগ্রিকভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিক শ্রেণির সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল।

১৭.২ শিল্পপুঁজি : প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব

ঔপনিবেশিক কালপর্বে শিল্পের বিকাশ তথা শিল্পায়নের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন স্বল্প পরিসরে হলেও পুঁজির বিকাশ ভারতে হয়েছিল, তেমনি ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির বিকাশ ও

শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার অবদান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পূর্ব ভারতের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার উপর ইউরোপের পুঁজির চূড়ান্ত আধিপত্য ছিল। পশ্চিম ভারতের শিল্পায়নের মূল উদ্যোগী ছিল গুজরাটি ও পারসি বণিকরা। পূর্ব ভারতে টাটাদের নেতৃত্বে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বিকাশ ভারতীয় পুঁজির বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

ভারতের শিল্পায়ন এবং শিল্পপুঁজির বিকাশের প্রক্রিয়া ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তবে ভারত ব্রিটেনের দ্বারা বিজিত একটি পরাধীন দেশ হওয়ায় শিল্পপুঁজির উদ্ভব ও বিকাশ স্বাধীনভাবে হওয়া সম্ভব ছিল না। এখানে শিল্পপুঁজির বিকাশ সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তনের মাধ্যমে হয়নি, কোনো প্রযুক্তিগত বিপ্লবও হয়নি, ব্রিটেনে উদ্ভূত এক শিল্প ব্যবস্থা এখানে প্রোথিত করা হয়। ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস 'পুঁজি' গ্রন্থে দু ধরনের পথের উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, যখন প্রাথমিক উৎপাদকরা নিজেরাই শিল্পপুঁজিপতিতে রূপান্তরিত হয় এবং দ্বিতীয়ত, যখন উৎপাদকেরা নয়, বরং বহিরাগত স্বাধীন ব্যবসায়ী মধ্যস্থরা, যারা ব্যবসা, ব্যাংকিং বা মহাজনি কারবার দ্বারা পুঁজি সঞ্চয়নের মাধ্যমে বৃহৎ আয়তন শিল্পের মালিক হয়। ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশে প্রাথমিক উৎপাদকেরা পুঁজিপতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বম্বে ও আমেদাবাদে যে পারসি ও গুজরাটি বণিকেরা সূতীবস্ত্র কারখানা গড়ে তুলেছিলেন, তারা দীর্ঘকাল ধরে মধ্যস্থ দালাল হিসেবে ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাওয়াসজি নানাভাই ডাভর বম্বে শহরে দুজন ব্রিটিশ বণিকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রথম সূতীবস্ত্র কারখানা গড়ে তোলেন। ভারতে যে সব কারখানা তৈরি হয়েছিল, তার উপযোগী যন্ত্রপাতি এদেশের শিল্পপতিরা বানাতো না, সবই আসত বিদেশ থেকে।

ভি. আই. পাভলভের মতে, ভারতীয় বুর্জোয়ারা যারা মুৎসুদ্দি হিসাবে যাত্রা শুরু করেছিল এবং বিদেশি পুঁজির দালালি করে কমিশন বাবদ প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিল, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায়ে, বিশেষত ১৯৩০-এর দশকে তাদের চরিত্রে পরিবর্তন আসে। মুৎসুদ্দির স্থলে রূপান্তরিত হয়ে জাতীয় বুর্জোয়াতে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে বিপানচন্দ্রের মন্তব্য হল, ভারতবর্ষে যে পুঁজিপতি শ্রেণি বিকাশলাভ করেছিল, তারা ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত হয়নি। কিন্তু এই মন্তব্যের বিরোধীতা করে অমিয় কুমার বাগচি লিখেছেন যে টাটারা এমনকি ক্ষতি স্বীকার করেও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বজায় রাখতো। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে টিসকো সরকারি সংরক্ষণ পায়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে টিসকো আর্থিক সংকটে পড়লে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ও ব্রিটিশ পুঁজি তাদের রক্ষাকর্তা হিসাবে আবির্ভুত হয়। সুনীতিকুমার ঘোষের মতে যেসব ভারতীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে শিল্পে বিনিয়োগ করে, তারা পুঁজি সঞ্চয় করেছিল নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে নয়, বরং বিদেশি পুঁজির সেবা করে, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সব ধরনের সহযোগিতা করে।

১৯৪০-এর দশকে বিদেশি একচেটিয়া পুঁজি আর ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিদের মধ্যে যৌথ শিল্প প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে বেশি কিছু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এগুলির মধ্যে ছিল রং এবং সেই সম্পর্কিত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য টাটাদের সঙ্গে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইনডাসট্রিজ-এর মধ্যে চুক্তি, Morris গাড়ির উৎপাদক ব্রিটেনের Nuffield কোম্পানীর সঙ্গে Hindustan Motor Works তৈরির জন্য বিড়লাদের চুক্তি প্রভৃতি।

১৭.৩ শিল্পপুঁজি : স্বাধীনোত্তর পর্ব

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার পর সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে অর্থনৈতিক বন্ধন আরও শক্তিশালী হয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ৬ এপ্রিল ভারত সরকারের শিল্পনীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সম্বলিত স্মারকলিপিতে বলা হয় যে ভারতে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ ও উদ্যোগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে খাদ্য, পুঁজি ও প্রযুক্তিগত সাহায্যের সন্ধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং মার্কিনি পুঁজিপতিদের আশ্বস্ত করে বলেন যে, ভারতবর্ষে ব্যক্তিমালিকানাধীন পুঁজির বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো রকমের প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। বৃহৎ পুঁজিপতিরাও একইভাবে বিদেশি পুঁজিকে আমন্ত্রণ জানাতে চেয়েছিল। জি. ডি. বিড়লা বলেন—এদেশে যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজির বাজার না থাকায় বাইরে থেকে পুঁজি আনার প্রয়োজন আছে। সরকারি মনোভাব প্রকাশিত হয় অর্থমন্ত্রী ড. জন মাথাইয়ের প্রথম বাজেট বক্তৃতায় ১৯৫০-৫১ খ্রিস্টাব্দে। সংসদে পেশ করা বক্তৃতায় বলেন 'এই দেশে বিদেশি পুঁজির প্রয়োজন শুধু আমাদের নিজস্ব সম্পদের পরিপূরক হিসাবে নয়, একই সঙ্গে আমাদের বিনিয়োগকারীদের মনে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্যও'।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প গড়ে তোলার নীতিকে সামনে রেখে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে রাউরকেল্লা, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ভিলাই, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে দুর্গাপুর এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে বোকারোয় লৌহ ও ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠে। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ভিলাইয়ের ইস্পাত কেন্দ্র গড়ে ওঠে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায়। সেই খরচের ১১০ কোটি টাকার মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন দেয় ৩৮.৫ কোটি। ব্রিটেনের Indian Steel Works Construction Co.-এর সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর দুর্গাপুর ইস্পাত কেন্দ্রে উৎপাদন শুরু হয়। বোকারো ইস্পাত কেন্দ্র ও সোভিয়েত প্রযুক্তি ও আর্থিক সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল ছিল। এছাড়া ব্যক্তিমালিকানাধীন বহু ভারতীয় শিল্পসংস্থা বিদেশি পুঁজি বিশেষজ্ঞ ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় গড়ে উঠেছিল। উল্লেখ্য, ভারতের শিল্পপুঁজিপতিরা বণিক ও মহাজন শ্রেণি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। তাদের প্রায় সকলের কাছে শিল্পের বিকাশ হলো এক নগণ্য ব্যাপার। ভারতীয় বুর্জোয়ারা জন্মলগ্ন থেকে বিদেশি পুঁজির মধ্যস্থ হিসাবে মুৎসুদ্দির ভূমিকা পালন করে এসেছে। ঔপনিবেশিক শাসন শেষ হওয়ার পরে ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণির দুর্বলতা দুটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। (১) বণিক পুঁজি ও মহাজনি পুঁজিকে উৎপাদনশীল পুঁজির নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং (২) পুঁজিবাদী উৎপাদনের উপাদানের অর্থাৎ যন্ত্রপাতি উৎপাদনের অনুপস্থিতি। ১৯৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দের Fiscal Commission-এর রিপোর্টে বলা হয় যে, ভারতবর্ষে মেসিন প্রস্তুতকারী কোনো শিল্পসংস্থা প্রায় অনুপস্থিত ছিল। তাই শিল্পের বিকাশের জন্য এদেশে বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তির প্রয়োজন। স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ও প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা কাটানোর চেষ্টা করেনি।

উল্লেখ্য, প্রযুক্তি যাদের হাতে আছে, অর্থাৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলির হাতেই বিনিময়ের নিয়ন্ত্রণ থাকে। ফলে কোন প্রযুক্তি বিক্রী হবে, কী পরিমাণে এবং কী দামে বিক্রী হবে,

ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তাবলী কী হবে, এ সবই মূলত বিক্রেতারা ঠিক করে থাকে। পি. এম. পিল্লাই ও কে. কে. সুব্রমনিয়াম এর মতে, প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত ও শিল্পগত নির্ভরশীলতার এক নতুন যুগ শুরু হয়।

১৭.৪ পুঁজিপতি শ্রেণির চরিত্র

ভারতে পুঁজিপতি শ্রেণির চরিত্র প্রসঙ্গে সোভিয়েত গবেষক বালাবুশেভিচ ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে 'New Stage in the National Liberation Struggle of the People of India' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, শুধু বণিক পুঁজি নয়, বৃহৎ শিল্পপুঁজিপতিদের একটা বড় অংশ জন্ম থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিভিন্ন বন্ধনে এবং সামন্ত জমিদার ও মহাজনি পুঁজির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে আবদ্ধ ছিল। নির্ভরশীল পুঁজিবাদ-এর তত্ত্ব উপস্থিত করে পরেশ চট্টোপাধ্যায় 'Some Trends in India's Economic Development' প্রবন্ধে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে লেখেন, ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল, তারা ভারতের স্বাধীন পুঁজিবাদের বিকাশের দিকে নিয়ে যায়। অমিয় কুমার বাগচির মতে, 'নির্ভরশীল পুঁজিবাদ'-এর স্তরের সূত্রপাত ১৯৩৭-৪৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি বলেন, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন হয়নি। ক্লদ মারকোভিটস্ লেখেন, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মূলত সংযুক্ত একটি বাণিজ্যিক শ্রেণির (অর্থাৎ মুৎসুদ্দি) সঙ্গে একটি শিল্প নির্ভর শ্রেণি—যা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী (অর্থাৎ জাতীয়)-র মধ্যে কোনো পার্থক্যের সীমারেখা টানা কঠিন কারণ অধিকাংশ ভারতীয় বৃহৎ পুঁজিপতি একই সঙ্গে নিজেরাই বণিক ও শিল্পপতি ছিল। ভারতীয় বুর্জোয়া বৃহৎ, মাঝারি ও ছোট এই তিনভাগে বিভক্ত ছিল। বৃহৎ বুর্জোয়ারা সম্পূর্ণভাবে মুৎসুদ্দি চরিত্রের। অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির ওপর নির্ভরশীল হলেও তারা বিদেশি নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে বেড়ে ওঠার চেষ্টা করে।

১৭.৫ শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন : প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মূলত বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ এবং ঔপনিবেশিক উদ্যোগে খনি, চটকল, বস্ত্রশিল্প এবং রেলওয়ের মত পরিবহন ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পরে ভারতে স্পষ্টত এক নতুন সামাজিক শ্রেণি হিসাবে শিল্প শ্রমিকের আবির্ভাব ঘটে। শ্রমিক শ্রেণি তাদের অসহনীয় দুর্দশা ও অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবিধানকল্পে আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ভারতে সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা হয়।

প্রাথমিক পর্বে তথাকথিত অর্থে শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠেনি। রণজিৎ দাসগুপ্ত তাঁর 'কলকাতা শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিক রাজনীতির একশো বছর: একটি রূপরেখা' প্রবন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত

করেছেন যে সাধারণত ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে All India Trade Union Congress (AITUC)-এর প্রতিষ্ঠাকে শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমগ্র দেশ জুড়ে মূল্যস্তরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কারণবশতঃ সাধারণ মানুষের বিশেষতঃ শ্রমজীবী মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি ঘটায় কলকাতাসহ দেশের প্রায় সমস্ত শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক প্রতিবাদ ও ধর্মঘট হয়। এই পটভূমিতে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে AITUC-র প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই সংগঠন ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের বিবর্তনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে জন্মলগ্ন থেকেই AITUC-তে নিয়মতান্ত্রিক, উদারনৈতিক র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদী, বামপন্থী, মার্কসবাদী সব ধরনের রাজনৈতিক মতাবলম্বী সংগঠকরা একসঙ্গে কাজ করতেন যদিও তাদের মধ্যে মত ও পথ নিয়ে ভিন্নতার সৃষ্টি হত। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সংগঠনের ভিতর কমিউনিস্ট আধিপত্যের অভিযোগে মডারেট ট্রেড ইউনিয়নিস্টরা AITUC ত্যাগ করে ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠন করেন, পরে এর নাম হয় ন্যাশানাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন। ইতিমধ্যে কমিউনিস্টরা নিজেরাই ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থাপন করেন। ক্রমাগত ভাঙনের ফলে সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সংগঠনের এই দুর্বলতা তলার দিকের শ্রমিক আন্দোলনের সংহতিকে বিশেষভাবে ব্যাহত করে।

ত্রিশের দশকের গোড়ায় বিশ্বব্যাপী মন্দার অভিঘাতে ভারতীয় অর্থনীতিতে তার প্রতিকূল প্রভাব পড়ে এবং এর ফলে শুরু হয় ব্যাপক কর্মসংকোচন এবং শ্রমিক ছাঁটাই, নিপীড়নমূলক আইন। ছাঁটাই করা শ্রমিকের পুনর্বহালের দাবিতে এবং বর্ধিত হারে মজুরি আদায়ের দাবিতে অসংখ্য ধর্মঘট সংগঠিত হয়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের পর বেশিরভাগ প্রদেশেই কংগ্রেস সরকার গঠন করে এবং নানাবিধ সীমাবদ্ধতা ও অসঙ্গতি সত্ত্বেও কংগ্রেস পরিচালিত সরকারগুলি শ্রমিক ও কৃষক স্বার্থের অনুকূলে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ঔপনিবেশিক শাসনের শেষের বছরগুলিতে ব্যাপক ছাঁটাই, মজুরি হ্রাস প্রভৃতি কারণে শ্রমিকদের মধ্যে দেখা দেয় এক অভূতপূর্ব জঙ্গি উন্মাদনা। কলকাতায় একশত দিন ব্যাপী ট্রাম ধর্মঘট (১০ জানুয়ারি—১৬ এপ্রিল ১৯৪৭) এবং বন্দর শ্রমিকদের ধর্মঘট (১৯৪৭) উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি থেকে কানপুরের মিলগুলিতে দীর্ঘস্থায়ী সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয় এবং সরকারি দমনপীড়ন সত্ত্বেও শ্রমিকরা তাদের দাবি দাওয়া আদায়ে অনেকাংশে সমর্থ হয়। ভারতের প্রায় সর্বত্র শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলনের যে জোয়ার এসেছিল তা সাম্রাজ্যবাদী শাসককে বিচলিত করে যদিও এই বিচ্ছিন্ন শ্রমিক আন্দোলনগুলি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত ঔপনিবেশিক শাসন ও পুঁজিবাদী শোষণকে চ্যালেঞ্জ জানাতে ব্যর্থ হয়। এই সময়েও অধিকাংশ ধর্মঘট অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া কেন্দ্রিক হওয়ায় দাবিদাওয়াগুলি আংশিকভাবে মিটলে শ্রমিকরা কাজে যোগদান করেছে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মূল ধারার গণআন্দোলনে কোনো উৎসাহ ছিল না।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে ১৯২০-র দশকের শেষ থেকে সারা ভারতে কিছু সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন স্থায়ী ভিত্তিতে পরিচালিত হতে থাকে। এগুলির মধ্যে ছিল আহমেদাবাদের মজুর মহাজন, বোম্বের গিরনি কামগর

ইউনিয়ন, জামসেদপুরের টাটা ওয়ার্কাস ইউনিয়ন, কলকাতা ট্রামওয়ে ওয়ার্কস ইউনিয়ন, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন। এই সমিতিগুলির নিয়মিত নির্বাচন হত; কার্য সমিতিগুলিও নিয়মিত বৈঠক করত, নিয়মিত ইউনিয়ন অফিস পরিচালিত হত সেখান থেকে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হত এবং ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের ব্যক্তিগত অভিযোগগুলির প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। ধর্মঘট ডাকা ছাড়া বিক্ষোভ সমাবেশ, জনসমর্থন ও রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন আদায়ের চেষ্টা এ সব কিছু তাদের নিয়মিত কাজের অংশ হয়ে ওঠেছিল। ১৯২০-র দশকের পর শ্রমিক আন্দোলন বৃহত্তর জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। শ্রমিক শ্রেণি ও বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কাজ করেছিল রাজনৈতিক দলগুলি। উল্লেখ্য, সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তারের সঙ্গে বহিরাগত নেতৃত্বের প্রশ্নটি জড়িত। বিশ-ত্রিশের দশক থেকে বহিরাগত নেতারা তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও কর্মসূচি অনুযায়ী শ্রমিকদের সংগঠিত করতেন। এই সংগঠকরা প্রায় সকলেই ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী। একই কারখানায় প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের সমর্থক কাজ শুরু করলে একাধিক ইউনিয়ন তৈরি হত। প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়নগুলির রেষারেষিতে শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য বিঘ্নিত হত। সাধারণভাবে বলা যায় যে কোনও শ্রমিক ইউনিয়নের তিনটি স্তর ছিল—সর্বোচ্চ বহিরাগত নেতৃত্ব, মধ্যবর্তী স্তরে শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে থেকে উঠে আসা নিজস্ব নেতৃত্ব এবং সবচেয়ে তলায় শ্রমিক সাধারণ ইউনিয়ন গড়ে ওঠার পূর্বে সর্দাররাই শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিত আবার মালিকদের প্রতিনিধি হিসাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ করত। ত্রিশের দশক থেকে শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে সাহসী ও নেতৃত্ব গুণসম্পন্ন কিছু মানুষ এবং সর্দারদের ধীরে ধীরে রাজনীতি সচেতন করা হয় এবং এরা রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন।

শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ বিদ্যমান ছিল। জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, তাই উদীয়মান শ্রমিক শ্রেণিকে তারা এই লড়াইয়ে যুক্ত করতে চেয়েছিল কিন্তু কখনোই জাতীয় বুর্জোয়াদের হাত থেকে নেতৃত্ব শ্রমিকদের হাতে চলে যাক সেটা তাদের কাম্য ছিল না, দেশীয় পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শ্রমিক শ্রেণিকে সমর্থন করা ও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অপরদিকে দেশি বা বিদেশি পুঁজিপতিদের চরিত্র যাই হোক না কেন কমিউনিস্টরা সর্বক্ষেত্রেই শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া ত্রিশের দশকে গড়ে ওঠা অন্যান্য বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলি শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অর্জন করে। কিন্তু আদর্শগত নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবক্ষেত্রে একাধিক বামপন্থী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও বহুক্ষেত্রে শরিকদের মধ্যে দলাদলি এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সংগতি রেখে জাতীয়তাবাদী মূলস্রোতের প্রতি ভারতীয় কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গির বারবার পরিবর্তন ঘটায় কমিউনিস্টদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং এর ফলে শ্রমিক আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।

বলা যেতে পারে ঔপনিবেশিক ভারতে প্রায় আট দশক ব্যাপী অস্তিত্বের পরেও শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে গোষ্ঠী চেতনা থেকে শ্রেণি চেতনার উন্মেষ ঘটেনি বা তারা অগ্রণী বৈপ্লবিক শ্রেণিতে পরিণত হতে পারেনি।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলভুক্ত শ্রমিক সংগঠকরা মূলত রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিকদের একত্রিত করার চেষ্টা করত এবং তাদের অর্থনৈতিক দাবি দাওয়াকে কাজে লাগাতে চাইত। ফলে অধিকাংশ শ্রমিক আন্দোলনগুলি হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত অর্থনৈতিক লড়াই।

১৭.৬ শ্রমিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন : ঔপনিবেশিক-উত্তর পর্ব

ঔপনিবেশিক-উত্তর পর্বেও একইভাবে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের উপর রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাব পড়েছিল। বেশির ভাগ ট্রেড ইউনিয়নগুলি রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দলের নির্দেশ অনুযায়ী কর্মসূচি নির্ধারণ করত। এর ফলে ইউনিয়নগুলি স্বাতন্ত্র্য, পরিকল্পনা এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। জাতীয় স্তরে শ্রমিক সংগঠনের সংখ্যা এই সময় বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে দুটি সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠনের অস্তিত্ব ছিল। এগুলি হল Indian Federation of Labour (IFL) এবং All India Trade Union Congress (AITUC)। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা AITUC থেকে বেরিয়ে এসে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গঠন করে Hind Mazdoor Sabha. Hind Mazdoor বিভক্ত হয়ে Bharatiya Mazdoor Sabha গঠিত হয়। কয়েক বছর পরে কনিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে দুটি সংগঠন United Trade Union Congress এবং Centre of Indian Trade Union গঠন করে।

তত্ত্বগত এবং বাস্তবসম্মতভাবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে নূতন মাত্রা দেয়। ট্রেড ইউনিয়নের গুরুত্ব প্রসঙ্গে পরিকল্পনা কমিশনের বক্তব্য ছিল 'The attitude of the trade unions should not be just a matter of toleration. They should be welcomed and helped to function as part and percel of the industrial system'. এই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তবে ট্রেড ইউনিয়নের দ্রুত বিকাশ সত্ত্বেও খুবই অল্প সংখ্যক শ্রমিক এর আওতায় এসেছিল। ১৯৬২-৬৩ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ২৪% শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য ছিল।

১৯৪৭-৬০ খ্রিস্টাব্দে সরকারি এবং বেসরকারি বিভাগে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলশ্রুতি হিসেবে বেশ কয়েকটি নতুন শিল্পের আগমন ঘটে। এই সময় সামগ্রিকভাবে দেশের শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা তুলনামূলকভাবে সন্তোষজনক থাকায় খুব বেশি সংগঠিত আন্দোলনের ঘটনা ঘটেনি। ধর্মঘটের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছিল। নেহেরু উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় শ্রমিক শ্রেণির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল অর্থনৈতিক এর অর্থ হল প্রগতি এবং এর প্রভাব শ্রমিক শ্রেণির উপর পড়বে। জাতির উন্নয়নে শ্রমিকদের ভূমিকা প্রসঙ্গে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে রাউরকেল্লা ইস্পাত কারখানায় প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'You are not here merely to earn wages, though that is also important, but you are engaged in a great national task'. ধর্মঘট, হরতাল সম্পর্কে তিনি শ্রমিকদের সতর্ক করেন কারণ এর দ্বারা ভারতের দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি ব্যাহত হবে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে

শ্রমিকদের মিছিল সম্পর্কে তিনি বলেন, 'Strikes and Hartals, he warned the workers, hampered the struggle against poverty in which India was engaged'. শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় এবং অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে সুশৃঙ্খল ট্রেড ইউনিয়নবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে শ্রমিক অসন্তোষ এবং ধর্মঘটের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি হ্রাস পায় এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পাওয়ায় শিল্প কারখানায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ২১৫১টি ধর্মঘটের কারণে ৭,৭২৫টি কাজের দিন নষ্ট হয়। এর সঙ্গে প্রায় ১, ০০২ জন শ্রমিক জড়িত ছিল। ১৯৬০-এর দশকের শেষে বোম্বাই শ্রমিকদের মধ্যে বেকারি এবং অর্থনৈতিক দুর্দশা লক্ষ্য করা যায়। সাবেকি শ্রমিক সংগঠনগুলি শ্রমিকদের এই সমস্যা মেটাতে অপারগ হওয়ায় শিবসেনার উদ্ভব হয় যারা Bharatiya Kamgar Sena নামে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে। এই সংগঠন শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে বিভাজন তৈরি করে মন্তব্য করে যে বিশেষত দক্ষিণ ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণ শ্রমিকের আগমনের ফলে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বহিরাগত শ্রমিকরা বোম্বাই ত্যাগ করলে মহারাষ্ট্রের প্রকৃত শ্রমিকরা কাজ পাবে এবং তাদের জীবন ধারণের মান উন্নত হবে। Bharatiya Kamgar Sena শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে অ-মহারাষ্ট্রীয় বহিরাগত শ্রমিকদের মনে নিরাপত্তার অভাব ঘটে।

১৯৬০-এর দশকের শেষে এবং জরুরি অবস্থা ঘোষণার সময় যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল তা শ্রমিক শ্রেণিকে প্রভাবিত করে। ১৯৭১-৭৫ খ্রিস্টাব্দে সরকারি এবং বেসরকারি বিভাগে শিল্প কারখানায় ধর্মঘটের ফলে অনেকগুলি কাজের দিন নষ্ট হয়। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে রেল ধর্মঘট ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময় বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী রাজনৈতিক দলসহ অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নেতৃবৃন্দের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় এবং এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে সত্তর এবং আশির দশকে কিছু অরাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এ. কে. রায়, শঙ্কর গুহ নিয়োগী এবং Working Women's Forum (চেন্নাই) Self Employed Women's Association (গুজরাট), Society for Technology and Development (হিমাচল প্রদেশ), Ama Sangathana (উড়িষ্যা), Kerala Dinesh Beedi (কেরালা) এবং Kagad Kach Patra Kashtkari Panchayat (মহারাষ্ট্র)। তবে এইসব সংগঠন শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিবিধানে সহায়ক হলেও ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প ছিল না।

সামগ্রিকভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিক শ্রেণির সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব ছিল। ধর্ম, বর্ণ, জাতি, ভাষাগত পার্থক্য শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক ছিল না। সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। উল্লেখ্য, ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবীদের যোগাযোগের অভাব লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৭০ ও ৮০-এর দশকের বিভিন্ন সমীক্ষাগুলি থেকে দেখা গেছে, পাঁচ বছর একটানা কাজ করা সত্ত্বেও শতকরা ৪০ ভাগ অসংগঠিত ক্ষেত্রের মহিলাদের ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে কোনোরকম ধারণাই তৈরি হয়নি।

১৭.৭ উপসংহার

এই এককে আমরা বিশ্লেষণ করেছি ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক কালপর্বে শ্রমিক শ্রেণির বিকাশ যা ভারতের শিল্পায়ন ও পুঁজির বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ঔপনিবেশিক কালে ভারতে শিল্পপুঁজির বিস্তারের সঙ্গে ব্রিটিশ উদ্যোগের পাশাপাশি ভারতীয় শিল্পপতিদের কথা বলা দরকার। পাট, বস্ত্রবয়ন ও লৌহ-ইস্পাত শিল্পের বিকাশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। স্বাধীনতার পর ভারতীয় শিল্পপতিরা অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতেও বিনিয়োগ শুরু করে। এই সময় বিদেশি পুঁজি যেমন ভারতে এসেছিল, তেমনি সরকারি উদ্যোগে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারী শিল্প ও পরিকাঠামোর উন্নয়ন শুরু হয়। শ্রমিক শ্রেণি ট্রেড ইউনিয়ন-এর মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয় ও তাদের দাবিদাওয়া জানাতে শুরু করে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে শ্রমিকদের মধ্যে কিন্তু একাধিক ইউনিয়ন ছিল, অর্থাৎ ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণি ঐক্যবদ্ধ থাকতে ব্যর্থ ছিল। এই টানাপোড়নের মধ্যে দিয়ে আধুনিক ভারতের শিল্প-সম্পর্ক এগিয়ে চলেছে।

১৭.৮ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। ঔপনিবেশিক-উত্তর পর্বে ভারতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করুন। এই পর্বে ভারতে পুঁজিপতি শ্রেণির চরিত্র আলোচনা করুন।

২। ঔপনিবেশিক-উত্তর পর্বে শ্রমিক আন্দোলনের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন। শ্রমিক আন্দোলনে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকার পরিচয় দিন।

১৭.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। Sunil Sen — *Working Class Movement in India, 1885-1975*, Delhi, 1994.

২। Abdul Aziz — 'Trade Union Movement in India'. *Journal of Humanities and Social Science,* Vol-20, Issue 6, June 2015.

৩। Arya, P.P. — *Trade Unions in India, Growth and Recognition*, New Delhi, 1985.

৪। অমল দাশ — *ভারত ইতিহাসে নিম্নবর্গের নারী শ্রমিক : এদের সংকট ও সংগ্রাম, উনিশ থেকে বিশ শতক,* কলকাতা, ২০১৩।

একক ১৮ ❑ বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা

গঠন

১৮.০ উদ্দেশ্য

১৮.১ ভূমিকা

১৮.২ স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞান নীতি

১৮.৩ স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতি

১৮.৩.১ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮)

১৮.৩.২ মধ্যশিক্ষা (Secondary Eduction) কমিশন (১৯৫২)

১৮.৩.৩ ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬)

১৮.৩.৪ জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৬৮)

১৮.৪ সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা : বাংলা সাহিত্য ও কলাবিদ্যাসমূহ

১৮.৪.১ বাংলা সাহিত্য

১৮.৪.২ বাংলার নাট্যসাহিত্য

১৮.৪.৩ বাংলার চলচ্চিত্র

১৮.৫ উপসংহার

১৮.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১৮.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর অনুসৃত বিজ্ঞান নীতির উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা গড়ে তোলা।
- ভারত সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে শিক্ষা কমিশন গঠন করে।
- জনগণের আশা আকাঙ্খার বাস্তবায়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, গবেষণা, সমাজের আধুনিকীকরণ, জনগণের সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশের ব্যাপারে কমিশন সুপারিশ করে।

- ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়।
- স্বাধীনোত্তর ভারতে সাংস্কৃতিক চেতনার সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়।

১৮.১ ভূমিকা

স্বাধীনোত্তর ভারতে বিজ্ঞান নীতি প্রধানত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুসৃত হয়েছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা গড়ে তোলা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতের উন্নতি নির্ভর করবে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা বিজ্ঞানীদের সামনে উপস্থিত করে সেগুলির সমাধান তিনি তাদের কাছেই চেয়েছিলেন। নেহেরুর মৃত্যুর অনেকদিন পরেও তাঁর বিজ্ঞান নীতি বৈজ্ঞানিক এবং প্রশাসনিক মহলে প্রশংসিত হয়। নেহেরুর পরবর্তীকালে ভারতীয় জীবনে বৈজ্ঞানিক মেজাজ, অনুসন্ধিৎসা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় স্বনির্ভরতা অর্জনের ভাবনা কিছুটা ম্লান হয়ে পড়ে।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষা নীতির ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। স্বাধীন ভারত বেশ কয়েকটি সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হয়। সরকার শিক্ষা কমিশন গঠন করে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে, জনগণের আশা আকাঙ্খার বাস্তবায়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, গবেষণা, সমাজের আধুনিকীকরণ, জনগণের সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশ যাতে সম্ভব হয় সে ব্যাপারে কমিশন সুপারিশ করে। কমিশনগুলির সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়।

স্বাধীনোত্তর ভারতে সাংস্কৃতিক চেতনা সমৃদ্ধ হয়। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, স্বাধীনতার পর শরণার্থীদের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি, সমাজ সচেতনতা, বাস্তববোধ, বামপন্থী ভাবাদর্শের প্রভাব, মানবিক মূল্যবোধ, গ্রাম জীবনের টানাপোড়েন—এ সবই সাহিত্য, নাটকে এবং চলচ্চিত্রে ফুটে উঠেছে।

১৮.২ স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞান নীতি

আধুনিক ভারতের ইতিহাস ও ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের বিজ্ঞান নীতি প্রধানত জওহরলাল নেহেরুর পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুসৃত হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করে তিনি ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতির মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা গড়ে তোলা। তিনি একথাও বলেছিলেন যে ভবিষ্যৎ ভারতের উন্নতি নির্ভর করবে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে একটি বক্তৃতায় নেহেরু বলেন, 'We live

in an age of science. We hear and read of revolutions but the greatest revolutionary force in the past 150 years has been science, which has transformed human life, and has changed political, social and economic organizations'. এর আগে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি বলেন, 'The future belongs to science and to those who make friends with science and seek its help for the advancement of society'.

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে নেহেরু Department of Scientific and Natural Resource নামে বিখ্যাত বিজ্ঞান দপ্তরটির প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির উন্নতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানীদের কর্ম প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টে 'Science Policy Resolution' নামে একটি প্রস্তাব পার্লামেন্টে অনুমোদন করান। এই ধরনের কোনো প্রস্তাব এর আগে পার্লামেন্টে অনুমোদিত হয়নি। নেহেরু ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সামাজিক সচেতনতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা জাগ্রত করতে সচেষ্ট ছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা বিজ্ঞানীদের সামনে উপস্থাপিত করে সেগুলির সমাধান তাদের কাছ থেকেই চেয়েছিলেন।

নেহেরু দেশের মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চেতনা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ও বিজ্ঞানকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটিগুলিতে তিনি এই প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের যুক্ত করেছিলেন এবং বিজ্ঞান নীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তিনি এইসব প্রশাসনিক অফিসারদের মতামত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতেন।

জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ বা বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার (popularisation of scientific outlook among the people) লক্ষ্যে তিনি বিজ্ঞানীদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে শুধুমাত্র কয়েকটি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করে জনগণের মন থেকে কুসংস্কার দূর করা যাবে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অঙ্গ হিসাবে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। বিজ্ঞানী ও সমাজের মধ্যে আন্তরিক সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে নেহেরু চেয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা যেন সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে অর্থাৎ বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে গবেষণাগারে আবদ্ধ না রেখে সমাজ ও মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। নেহেরুর এই নীতি 'Principle of science for the people' নামে পরিচিত। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বিজ্ঞানীরা মানুষের প্রতিনিয়ত সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সচেষ্ট হলে জনগণের মনে বিজ্ঞান চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটানো সম্ভব হবে।

নেহেরু বিজ্ঞান ও কারিগরি গবেষণার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে কতকগুলি রিসার্চ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া অ্যাটোমিক এনার্জি এজেন্সি গঠন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগগুলিকে প্রসারিত করা হয় এবং টেকনোলজিকাল ইনস্টিটিউট গঠন করা হয় এবং এগুলি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

নেহেরুর বিজ্ঞান নীতির লক্ষ্য ছিল স্বনির্ভরতা অর্জন করা। ভারত জোটনিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করায় যুদ্ধের সময় সমস্ত দেশগুলির নিকট থেকে সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। ১৯৬২ এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধের সময় বৈদেশিক সাহায্যের ব্যাপারে ভারত কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। এদিকে লক্ষ্য রেখে ভারত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করতে সচেষ্ট হয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় ভারতের National Committee of Science and Technology একটি নীতি গ্রহণ করে। এই নীতির নাম দেওয়া হয় Approach to Science and Technology Plan যার উপর ভিত্তি করে জনগণের জন্য বিজ্ঞান (Science for the people) নীতিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হয়। The Indian Institute of Science গ্রামীণ এলাকায় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নেহেরুর মৃত্যুর অনেকদিন পরেও নেহেরুর বিজ্ঞান নীতি বৈজ্ঞানিক এবং প্রশাসনিক মহলে প্রশংসিত হয়। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে *Indian Journal of Public Administration*-এর প্রকাশিত একটি সংখ্যায় নেহেরুর নীতি এবং দূরদর্শিতার প্রশংসা করে লেখা হয়, 'India was fortunate, to have had a prime minister who realised more than most people that science and its application are the only means to combat backwardness and increase the pace of national development.'

তবে নেহেরুর পরবর্তীকালে ভারতীয় জীবনে বৈজ্ঞানিক মেজাজ, অনুসন্ধিৎসা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় স্বনির্ভরতা অর্জনের ভাবনা কিছুটা ম্লান হয়ে পড়ে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় বিজ্ঞান নীতির লক্ষ্য হিসাবে ভারতীয় নাগরিকদের বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ ঘটানোর আহ্বান জানালেও বিজ্ঞানের অগ্রগতির চেয়ে নিজের রাজনৈতিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ১৯৭০-এর দশকে নেহেরুর বিজ্ঞান ভাবনার বাস্তব রূপায়ণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। David Arnold লেখেন, 'By the 1970s and 1980s the image of Nehru Science had become tarnished—in part because it had failed to deliver all that had been grandly promised in the name of science, including the eradication of poverty'.

১৮.৩ স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতি

স্বাধীনোত্তর ভারতে শিক্ষার বিকাশে সরকারের শিক্ষানীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার আইনের সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতে সেই অর্থে কোনো শিক্ষানীতি ছিল না। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে চার্লস উড-এর Education Despatch এবং প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে Sargeant Commission-এর শিক্ষা ব্যবস্থার উপর কিছু প্রভাব ফেলেছিল। স্বাধীন ভারতে শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের

সূচনা হয়। স্বাধীন ভারত বেশ কয়েকটি সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ-এর সম্মুখীন হয়। সরকার শিক্ষা কমিশন গঠন করে এই সমস্ত চ্যালেঞ্জ এবং সমস্যার সমাধানকল্পে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির তাগিদে। কমিশনের দায়িত্ব ছিল এই ব্যাপারে সরকারকে গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়া।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উপর শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব অর্পিত হয়। সংবিধান প্রণেতারা উপলব্ধি করেছিল যে দেশের স্থায়িত্ব এবং প্রগতি গণতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল এবং গণতন্ত্রের সফল রূপায়ণ নির্ভর করে শিক্ষিত নির্বাচকমণ্ডলীর উপর। গণতন্ত্রের সফল রূপায়ণ এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে সংবিধানে সকলের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়। বিভিন্ন সময়ে গঠিত শিক্ষা কমিশনগুলির সুপারিশের ভিত্তিতে ভারতের শিক্ষানীতি নির্ধারিত হয়।

১৮.৩.১ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮)

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন এই কমিশনের চেয়ারম্যান। এই কমিশন রাধাকৃষ্ণণ এডুকেশন কমিশন নামে পরিচিত। এই কমিশন স্বাধীন ভারতে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কমিশন ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষা বিস্তারের ত্রুটি তুলে ধরে দেশের প্রগতি এবং গণতন্ত্রের উপযোগী শিক্ষা সংস্কারের সুপারিশ করে। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ব্যক্তিকে তাঁর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করা এবং পেশাগত ও বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ দেওয়া। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষার বিস্তার ঘটানো প্রয়োজন। ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর প্রয়োজনে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার দরকার। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল মানুষকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ প্রদান করা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ভারতীয় সংবিধানের লক্ষ্যকে স্মরণে রেখে এই শিক্ষা কমিশন উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের সুপারিশ করে।

১৮.৩.২ মধ্যশিক্ষা (Secondary Education) কমিশন (১৯৫২)

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে মধ্যশিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন লক্ষণস্বামী মুদালিয়ার। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে মুদালিয়ার কমিশন সরকারের নিকট ভারতীয়দের শিক্ষা সমস্যা বিশদভাবে তুলে ধরে এবং এর সমাধান সূত্র দেয়। কমিশন ছাত্রদের প্রয়োজন এবং আগ্রহের দিকে লক্ষ্য রেখে বহুমুখী বিদ্যালয় খোলার পরামর্শ দেয়। সারা দেশে একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের সুপারিশ করে। কমিশন ছাত্রদের বয়স ১১-১৭ বছর বিদ্যালয় শিক্ষার বয়স হিসাবে গণ্য করে এই সাত বছরকে জুনিয়র এবং হাই বা উচ্চ বিভাগে ভাগ করে পড়ানোর কথা বলে। মধ্যশিক্ষার পাঠ্যসূচিতে গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত বিদ্যালয় গুলিতে কৃষিকাজ সম্পর্কিত বিষয় পড়ানোর প্রস্তাব দেয়। মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্যবিজ্ঞান পড়ানো প্রয়োজনে মনে করে। কমিশনের মতে মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষা বিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত। পাঠ্যসূচিতে

সমাজবিজ্ঞান, সাধারণবিজ্ঞান, গণিত, সঙ্গীত, হাতের কাজ এবং শরীরশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেয়। শিক্ষা বিস্তারে মুদালিয়ার কমিশনের সুপারিশ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। বেশির ভাগ শিক্ষাবিদ এই কমিশনের বাস্তবসম্মত সুপারিশের প্রশংসা করে। কমিশনের প্রস্তাবে মেয়েদের শিক্ষা বিষয়েও সুপারিশ করা হয়।

১৮.৩.৩ ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬)

ডি. এম. কোঠারি-র নেতৃত্বে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করা হয়। এই কমিশনের দায়িত্ব ছিল শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয় এবং জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া। কমিশন মনে করে যে জনগণের কল্যাণ এবং নিরাপত্তা রক্ষা করা সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে সম্ভব। স্বাধীন ভারতে শিক্ষাবিকাশের ধারা পর্যালোচনা করে এই কমিশন শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পরামর্শ দেয়। অভ্যন্তরীণ কাঠামো, শিক্ষার গুণগত মান এবং শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন মনে করে। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ছাত্রদের মনে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা, জনগণের আশা-আকাঙ্খার বাস্তবায়ন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গবেষণা, সমাজের আধুনিকীকরণ, জনগণের সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন যাতে সম্ভব হয় সে ব্যাপারে কমিশন সুপারিশ করে। এই কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়।

১৮.৩.৪ জাতীয় শিক্ষা নীতি (১৯৬৮)

সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দের লক্ষ্যে শিক্ষা সংস্কার করা ছিল এই নীতির লক্ষ্য। শিক্ষার উন্নতি এবং বিস্তারে যে উদ্যোগগুলি নেওয়া হয়েছিল সেগুলির মধ্যে ছিল অবাধ এবং সর্বজনীন শিক্ষা, ভারতীয় ভাষা সমূহের সংরক্ষণ, শিক্ষার সমান সুযোগ, বিজ্ঞান, গবেষণা, কৃষি ও শিল্পে প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার, স্বাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষা, খেলাধূলো প্রভৃতি। শিক্ষা খাতে জাতীয় আয়ের ছয় শতাংশ ব্যয় বরাদ্দ করার কথা বলা হয়। জাতির উন্নয়ন গণতন্ত্রের বিকাশ শিক্ষা ছাড়া অসম্ভব। স্বাধীনতার পর জাতীয় নেতারা তাই শিক্ষার প্রসার নিয়ে ভাবনা করেন এবং শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সমস্ত স্তরের শিক্ষার আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করা হয়। শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে ভারত সরকার কর্তৃক জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জনগণের মাত্র ১৬.৬ শতাংশের অক্ষরজ্ঞান ছিল। গ্রামাঞ্চলে এই হার ছিল আরও কম। নারী শিক্ষার অবস্থা ছিল শোচনীয়। নেহেরু শিক্ষার উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং প্রয়োজনে অন্য খাতে ব্যয় কমিয়ে শিক্ষার প্রসারে খরচ করার পক্ষপাতী ছিলেন। শিক্ষা প্রধানত রাজ্যের বিষয় হলেও নেহেরু রাজ্যগুলিকে শিক্ষাখাতে খরচ না কমানোর নির্দেশ দিতেন।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রেও তা উল্লেখজনক ভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫১ থেকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭,২৮৮ থেকে বেড়ে ২৪,৪৪৭-এ পৌঁছয়। স্বাধীনতার সময় ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তার সংখ্যা হয় ৫৪। তবে জনসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষার প্রসার সেভাবে হয়নি। সংবিধান কার্যকর করার ১০ বছরের মধ্যে ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়স্ক সব শিশুকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা দেবার কথা বলা হলেও বাস্তবে তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম ছিল। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ছিল শোচনীয় এবং শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে কম। বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হলেও অনেকেই দারিদ্র ও পারিবারিক কারণে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হত।

১৮.৪ সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা : বাংলা সাহিত্য ও কলাবিদ্যাসমূহ

১৮.৪.১ বাংলা সাহিত্য

বিংশ শতকে বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ হয়েছিল, তার সূত্রপাত হয়েছিল উনিশ শতকে। বিংশ শতকে কাব্য, নাটক, উপন্যস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা নিয়ে সমগ্র সাহিত্য জগৎ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ১৯৪০-এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মন্বন্তর সাহিত্যের উপর প্রভাব ফেলেছিল। বহু হৃদয়বিদারক কাহিনী সাহিত্যের আকারে লেখকদের লেখনিতে ফুটে ওঠে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হল গোপাল হালদারের *পঞ্চাশের পথ*, *তেরশ পঞ্চাশ*, *ঊনপঞ্চাশী*। তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের *মন্বন্তর*, *সপ্তপদী*, *উত্তরায়ন*, বিভূতিভূষণের *অশনি সংকেত*, *অনুবর্তন*, *মন্বন্তর* বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষীয় সেনাদের ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেয়। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের *দর্পণ*, যুদ্ধের বাজার, চোরাকারবার ও অসাধু কনট্রাকটারদের চরিত্র তুলে ধরে। পঞ্চাশের দশকে দেবেশ দাসের *রক্তরাগ* সেনাবাহিনীর জীবন যাপনের পরিচয় দেয়। সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস *জাগরী* সমকালীন পরিস্থিতি তুলে ধরেছে। তাঁর *ঢোঁড়াইচরিতমানস* বাংলা-বিহারের নিম্নবিত্ত সাঁওতাল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনের পরিচয় দিয়েছে।

স্বাধীনতার পর যে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী এদেশে এসেছিলেন, এদের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি স্থান করে নিয়েছে বাংলা সাহিত্য ও চলচিত্রে। দাঙ্গা ও দেশভাগ নিয়ে লেখা হয়েছে নবেন্দু ঘোষের *ফিয়ার্স লেন*, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের *কোলকাতা-নোয়াখালি-বিহার*, অমিয় ভূষণ মজুমদারের *গড় শ্রীখণ্ড*। তবে এ পর্যায়ের সবচেয়ে সার্থক রচনা হল—সতীনাথ ভাদুড়ীর *গণনায়ক* ও জ্যোতির্ময়ী দেবীর *এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা*। পরবর্তীকালে রচিত সাহিত্যগুলির মধ্যে অতীন বন্দোপাধ্যায়ের *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে*, *সুপুরিবনের সারি* এবং আখতারুজ্জমান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা*। বিংশ শতকের শেষের দিকের কবি, লেখক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, বুদ্ধদেব বসু, জয় গোস্বামী, শঙ্খ ঘোষের লেখা সারা বাংলা সাহিত্যেকে সমৃদ্ধ করেছে।

স্বাধীনতার পর বাংলা সাহিত্য সাধনায়, বিদ্যাবত্তায় যারা নারীবাদকে স্পষ্ট করেছেন তাদের মধ্যে কেতকী কুশারী ডাইসন, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক, কবিতা সিংহ, বাণী বসু, সুকুমারী ভট্টাচার্য, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, সুমিতা চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা দেবী, ইলা মিত্র প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। আত্মসচেতনতা ছাড়াও বাংলার সমাজসচেতন ভাবাদর্শের প্রকাশ তাদের লেখনিতে ফুটে উঠেছে।

১৮.৪.২ বাংলার নাট্যসাহিত্য

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্টার পর বাংলার নাট্য আন্দোলন গতিলাভ করে। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে নাট্যভিনয় নিয়ন্ত্রণবিধি প্রয়োগ করে নাটকের মাধ্যমে জাতীয় চেতনা প্রকাশের সুযোগ কমিয়ে আনেন ব্রিটিশ শাসক। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নাট্য আন্দোলন নতুন গতিতে অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজ প্রগতির ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলার নাটকে পরিবর্তন আসে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা আর গণআন্দোলনকে সমর্থনের জন্য নাটক ও অন্যান্য শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের মুক্ত মঞ্চ গড়ে ওঠে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-এর আন্দোলনে বাংলার নাট্য আন্দোলনে পরিবর্তন আসে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পর গণনাট্য সংঘ ভেঙে পড়ে। শম্ভু মিত্র ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গড়ে তোলেন 'বহুরূপী' (১৯৪৮) নাট্য সংস্থা, বিজন ভট্টাচার্য গড়ে তোলেন 'ক্যালকাটা থিয়েটার গ্রুপ (১৯৫০)। ক্রমে গণনাট্য আন্দোলন গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনে পরিণত হয়।

পৌরাণিক ভক্তিরস, সামাজিক বাস্তব, ঐতিহাসিক দেশভক্তি মূলক নাটক এই পর্বে লেখা হয়। বিধায়ক ভট্টাচার্য এর *মাটির ঘর* (১৯৩৯), *ক্ষুধা* (১৯৫৭), বীরু মুখোপাধ্যায়ের *সংক্রান্তি* (১৯৫৯) ও *সাহিত্যিক* (১৯৬০), শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের *গৈরিক পতাকা* ও *সবার উপরে মানুষ সত্য* (১৯৫৬) প্রভৃতি। তুলসী লাহিড়ী-র বাস্তবাদী নাট্য চিন্তা, আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তাঁকে ব্যতিক্রমী করেছে। *ছেঁড়া তার* (১৯৫৩) বা *দুঃখীর ইমান* (১৯৪৭) গুরুত্বপূর্ণ নাট্য সাহিত্য। ঋত্বিক ঘটক ছিলেন এক অসাধারণ চিত্র নির্মাতা। তাঁর নাটক *জ্বালা* বা *দলিল* (১৯৫২) অবিস্মরণীয়।

বাংলার গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন ক্রমশ বামপন্থী রাজনীতি ও সমাজ পরিবর্তনের দিকে এগিয়েছে। ১৯৬০ সালে গড়ে ওঠে 'নান্দীকার'। অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এবং কেয়া চক্রবর্তীর অভিনয়ে সমৃদ্ধ এই নাট্যদল। *মঞ্জুরী আমের মঞ্জুরী* (১৯৬৪) এবং ১৯৬১তে রবীন্দ্রনাথের *চার অধ্যায়* মঞ্চস্থ করেন তাঁরা।

১৮৪.৩ বাংলার চলচ্চিত্র

১৯৩০ এর দশক থেকে চলচ্চিত্র তৈরি হলেও ব্রিটিশ যুগে তখনও পর্যন্ত স্বদেশিক চেতনা, স্বাধীনতা সংগ্রাম বা সক্রিয় রাজনীতির ছাপ পড়েনি। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ-বিষয়ে চর্চার সূত্রপাত হয়। পঞ্চাশের দশকে এই সমস্ত ছবির পাশাপাশি উত্তম সুচিত্রা অভিনীত ছবি দর্শককে মুগ্ধ করে। *সাগরিকা, হারানো সুর, পথে হলো দেরি, অগ্নিপরীক্ষা* প্রভৃতি ছবিতে বাস্তব জগতের মধ্যে স্বপ্নের স্পর্শ আছে।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পায় সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় *পথের পাঁচালি*। এর পরে একে একে *অপরাজিত, চারুলতা, মহানগর, অশনি সংকেত, নায়ক, কাঞ্চনজঙ্ঘা* দিয়ে সত্যজিৎ রায় ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন। গ্রাম বাংলার সরল চিত্র ও গ্রাম জীবনের টানাপোড়েনের পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় *কাবুলিওয়ালা, সুবর্ণরেখা, পলাতক, ছিন্নপত্র, চাওয়া পাওয়া* প্রভৃতি চলচ্চিত্রের মধ্যে। ষাট এবং সত্তরে দশকে *সপ্তপদী, উত্তর ফাল্গুনী, দেয়া নেয়া, লাল পাথর* এর মতো ছবিগুলি ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। *কলকাতা-৭১* ছবিতে গরীবের আরও গরীব হওয়া আর ধনীর আরও ধনী হওয়া, সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির যে নগ্ন রূপ তা ধরা পড়েছে।

১৮.৫ উপসংহার

এই এককের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হল বিজ্ঞান নীতি ও শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা ও দেশকে প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া। স্বাধীন দেশের নেতৃবর্গ অনুধাবন করেছিলেন যে একটি যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্তা ও স্বচ্ছ দৃষ্টির অধিকারী সমাজ গড়তে গেলে শিক্ষা ও বিজ্ঞান ভাবনা ব্যতীত সম্ভব নয়। স্বাধীন ভারতবর্ষ এটাও স্বীকার করেছিল যে সরকারি উদ্যোগ ছাড়া শিক্ষার প্রসার (সর্বস্তরের) ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি বাস্তবায়িত হবে না। দেশ ও জাতি গঠন এই উদ্যোগ এর সঙ্গে জড়িত। সাংস্কৃতিক জগতে, বিশেষত বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র শিল্পে, এই সময় গভীর উন্নতি ঘটে, যা আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে তুলনীয়। ১৯৫০, ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশক বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস সৃষ্টির নিরিখে কালোত্তীর্ণ।

১৮.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। নেহেরুর বিজ্ঞান নীতির লক্ষ্য কী ছিল? জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা আলোচনা করুন।

২। স্বাধীন ভারতে শিক্ষার বিকাশে সরকার কী ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন?

৩। স্বাধীনতার পর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অগ্রগতির পরিচয় দিন।

১৮.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। Ashraf Siddiqi — *Bengali Folklore Collections and Studies 1800-1947*, Dacea, 1980.

২। Binoy Kumar Sarkar — *The Folk Elements in Hindu Culture,* Delhi, 1972.

৩। David Arnold — *Science, Technology and Medicine in Colonial India,* Cambridge, 2000.

৪। Mahendra R. Awode — *The History of Science, A Comparative Study of Western and Indian Science*, 2021.

৫। Suresh Chandra Ghosh — *The History of Education in Modern India, 1757-2012*, 4th Edition, 2013.

একক ১৯ ❑ নারী আন্দোলন ও সংস্কার আইন

গঠন

১৯.০ উদ্দেশ্য

১৯.১ ভূমিকা

১৯.২ নারী আন্দোলন

১৯.৩ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে নারী আন্দোলন : ভারত সরকার প্রণীত আইন

১৯.৪ নিম্নবর্গের নারীদের সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান

১৯.৫ উপসংহার

১৯.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে ভারতে নারী সমস্যাগুলির প্রতিকারকল্পে নারী আন্দোলন গড়ে ওঠে।
- স্বাধীনতার পর ভারত সরকার মহিলাদের জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করেছে। এগুলির মধ্যে ছিল হিন্দু বিবাহ ও বিচ্ছেদ আইন, মহিলাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন, মাতৃত্বকালীন ছুটি আইন, স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প প্রভৃতি।
- নারী মুক্তি আন্দোলনে নতুন গতিসঞ্চার করেছিল নারী পুরুষের সমান ভোটাধিকার।
- স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে নারী সচেতনতার প্রকাশ দেখা যায় কৃষক ও উপজাতি নারী এবং নারী শ্রমিকদের সংগঠিত আন্দোলনে।
- তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরেও পিতৃতন্ত্রের ও পরিবারতন্ত্রের অবসান না ঘটায় বা নারী-পুরুষ লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান না ঘটায় নারীকে শোষণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব হয়নি।

১৯.১ ভূমিকা

নারী সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতের জাতীয় পর্যায়ে কয়েকটি নারী সংগঠন গড়ে ওঠে যে সংগঠনগুলি মূলতঃ মহিলাদের শিক্ষা, সামাজিক উন্নতি ও মর্যাদা বৃদ্ধি এবং ভোটাধিকার নিয়ে তৎপর ছিল। ১৯৩০ ও ৪০-এর দশকের বামপন্থী রাজনীতির প্রভাবে নারী আন্দোলন ও নারীর আত্মশক্তি অর্জনের প্রক্রিয়া পৃথক মাত্রায় পৌঁছয়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে লিঙ্গ সমতা, নারী-পুরুষ বৈষম্যজনিত কারণে নারীর প্রতি অন্যায় ও অত্যাচারের পরিণতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় এবং সংগঠনগুলির উদ্যোগে ও তৎপরতায় নানাবিধ আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। সরকার স্বাধীনতার পর মহিলাদের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার এবং তাদের নানাবিধ সমস্যার প্রতিকারকল্পে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করে যা প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ছিল না। তবে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরে ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটলেও পিতৃতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্রের অবসান না ঘটায় বা নারী-পুরুষ লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান না ঘটায় নারীসমাজ সর্বতোভাবে শোষণ থেকে অব্যাহতি পায়নি।

১৯.২ নারী আন্দোলন

উনবিংশ শতকের সংস্কার আন্দোলনে এক দল সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেছিল যারা এক নতুন মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিংশ শতকের সূচনায় ভারতীয় নারীরা তাদের পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে এক অনুকূল পরিস্থিতি লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের জাতীয় তথা সামাজিক আন্দোলনের বিকাশ ঘটে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ২৬ ডিসেম্বর লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় আর্য মহিলা সম্মেলনে শ্রীমতি রূপমণি লক্ষ্মীপতি মন্তব্য করেন, 'এই যুগ হ'ল নারীর বিকাশ ও অগ্রগতির যুগ, কিছু বিশেষ প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যুগ। এই বিদ্রোহ হ'ল নারীর হৃত অবস্থা পুনরুদ্ধারের বিদ্রোহ'। নারীর রাজনৈতিক এবং আইনগত মুক্তি ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দীর নারীবাদী আদর্শের বিকাশের ফলশ্রুতি। মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারে ভারতীয় নারীর ভোটাধিকারের দাবি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা করলেও এ-বিষয়ে ভারতীয় নারী ও জাতীয়তাবাদীদের দৃঢ় মানসিকতাকে রুদ্ধ করতে পারেনি। মহিলা রাজনৈতিক নেত্রীগণের প্রচেষ্টা জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন নারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে নারীর ভোটাধিকার অর্জিত হয়।

১৯.৩ স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে নারী আন্দোলন : ভারত সরকার প্রণীত আইন

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে পুরুষদের উদ্যোগ সামাজিক সংস্কার আন্দোলন হয়েছিল এবং এই আন্দোলনে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, আর্যসমাজ বা ব্রাহ্মসমাজের মত সংগঠন, বেথুন স্কুল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সকলেই নারীর প্রতি ঐতিহ্যিক বিধি নিষেধগুলির সংস্কার করতে চেয়েছেন। স্বাধীনতা-উত্তর কালে

লিঙ্গ সমতা এবং নারী সমস্যার বিভিন্ন দিকগুলি যেমন নারী-পুরুষ বৈষম্য এবং এই বৈষম্যজনিত কারণে নারীর প্রতি অবিচার ও অত্যাচার যার পরিণতি হল ধর্ষণ, মদ্যপানজনিত গার্হস্থ্য নিগ্রহ, উপযুক্ত মজুরি, চাকুরীর নিরাপত্তা না পাওয়া ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশক ধরে নারী সংগঠনগুলি এইসব বিষয়গুলি নিয়ে তেমনভাবে সংগ্রাম গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলেও সত্তর থেকে নব্বই এর দশক ধরে এইসব বিষয় নিয়ে মহিলা সংগঠনগুলির উদ্যোগে ও তৎপরতায় নানাবিধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে এক অস্বাভাবিক এবং অনিশ্চিত জীবন অতিবাহিত করার পর দেশ স্বাধীন হলে বিশেষত নিম্নবর্গের খেটে খাওয়া মহিলারা যখন নতুনভাবে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন, তখন তাদের আশা আরও বেড়ে গেল যখন ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে সংসদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তাঁর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি ব্যাখ্যা করে বলেন 'আমাদের একটাই মাত্র নীতি অনুসরণ করতে হবে, তা হল এই ৩৬ কোটি মানুষের জন্যই আমাদের কাজ করতে হবে, দু-চার জনের জন্য নয়, কোনও গোষ্ঠীর জন্য নয়, তামাম জনসমষ্টির জন্য ; তাদের সমস্তরে তুলে আনাটাই আমাদের কাজ'।

ভারতীয় সংবিধানে নারী পুরুষের সমতার কথা বলা হয়। সংবিধানে ১৪নং থেকে ১৬নং অনুচ্ছেদে ভারতের সর্বত্র আইনের চোখে সকলের সমতা এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ভেদে কোন নাগরিককে বিশেষ সুযোগ না দেওয়া এবং চাকুরির সমান সুযোগের কথা বলা হয়। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারতে নারী প্রগতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। স্বাধীনতার আগে উনিশ শতকের নানা আন্দোলন সত্ত্বেও বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, পণ প্রথা, শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অনগ্রসরতা, সম্পত্তিতে নারীর অনধিকার ইত্যাদি অব্যাহত ছিল। স্বাধীনতার পরে মহিলাদের আইনগত, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ উভয় নারীজাতিকে উপকৃত করেছে। ধনী ও দরিদ্র নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারী সকলের জন্যেই সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তিত হয়েছে যা প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে নারীরা পায়নি। সরকার কর্তৃক মহিলাদের জন্য স্বাধীনতার পরে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যা প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ভারতে ছিল না।

স্বাধীনতার পর ভারত সরকার প্রণীত আইনগুলির মধ্যে ছিল—হিন্দু বিবাহ ও বিচ্ছেদ আইন, হিন্দু কোড বিল সংক্রান্ত মহিলাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন, সহবাস সম্মতি ও মহিলাদের বিবাহের বয়স বাড়ানো, এক বিবাহের অনুমোদন, পণ প্রথা নিরোধক আইন, মাতৃত্বকালীন ছুটি আইন, কর্মীদের জন্য জীবনবিমা, স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প, সবেতন আইন ইত্যাদি। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রগতিশীল পদক্ষেপ হল ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে সংসদে 'হিন্দু কোড বিল' নামক আইনের প্রস্তাব উত্থাপন। কংগ্রেস ও বামপন্থী মহিলা সাংসদরা এবং All India Women's Conference এর মতো প্রগতিশীল নারী সংগঠনগুলি এই প্রস্তাব আন্তরিকভাবে সমর্থন করে। এই আইনে মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়ানোর কথা বলা হয় এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয়। অসবর্ণ বিবাহ করতে গেলে বিশেষ বিবাহ আইনের পরিবর্তে হিন্দু বিবাহ আইন অনুসারেই তা করা যাবে এই প্রস্তাবও নেওয়া হয়। মেয়েদের বিবাহ বিচ্ছেদও পৈত্রিক সম্পত্তির উপর অধিকার দেওয়া হয়। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে

জেতার পর নেহেরু এই বিল কার্যকর করেন এবং চারটি স্বতন্ত্র আইন প্রণীত হয়। তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এই আইন কার্যকর করা যায়নি কারণ তাহলে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন পরিবর্তন করার প্রয়োজন ছিল কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় তা করতে সম্মত ছিল না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নেহেরু এই আইন তাদের উপর চাপিয়ে দিতে চাননি। উল্লেখ্য, নারী মুক্তি আন্দোলনে নতুন গতিসঞ্চার করেছিল নারী-পুরুষের সমান ভোটাধিকার। এর ফলে নারীরা তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সংসদীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে। মহিলাদের শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রেও উৎসাহী ও আশাপ্রদ পদক্ষেপগুলি বিভিন্ন সময়ে নেওয়া হয়েছে। নারী স্বাক্ষরতার হারও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে নারী সচেতনতার প্রকাশ দেখা যায় কৃষক ও উপজাতি নারী এবং নারী শ্রমিকদের সংগঠিত আন্দোলনে। ১৯৪০-এর দশকে বামপন্থী কৃষক আন্দোলনে মেয়েরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল তেভাগা ও তেলেঙ্গানা আন্দোলন। তেভাগা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কৃষকদের দাবির পাশাপাশি মেয়েদের উপর যে পারিবারিক শোষণ ও পীড়ন হয়, তার বিরুদ্ধেও তেভাগা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মেয়েরা প্রতিবাদ জানায়। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তেলেঙ্গানা আন্দোলনে কৃষক নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। নিজামশাহী শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের অসন্তোষকে সংগঠিত করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে সহায়তা করে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, নিখিল হায়দ্রাবাদ স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন এবং নারী সমিতিগুলি। মেয়েদের প্রতিবাদী রাজনৈতিক সচেতনতার কারণে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়, পুরুষতান্ত্রিক বিভিন্ন প্রথার বিরুদ্ধেও মেয়েরা প্রতিবাদ জানায়।

১৯৭০ ও ৮০-এর দশকে বিভিন্ন নারী সংগঠন আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। আমেদাবাদ বস্ত্র-শিল্প কারখানার সঙ্গে যুক্ত মহিলা শ্রমিকরা Self Employed Women's Association (SEWA) নামে একটি শ্রমিক সংঘ গঠন করে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। ইলা ভট্টের উদ্যোগে গঠিত এই সংগঠনটি অল্প মজুরি, নিম্নমানের কাজের পরিবেশ, মালিকদের অত্যাচার ও বঞ্চনা, তাদের শ্রমের স্বীকৃতি না পাওয়া প্রভৃতি নানা অসন্তোষ ব্যক্ত করে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। SEWA পরিচালিত আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং যন্ত্রপাতির সহায়তায় মহিলাদের উপযুক্ত করে তোলা এবং কাজের পরিবেশ উন্নত করা।

১৯৭০-এর দশকের সূচনায় মহারাষ্ট্রের গ্রামীণ এলাকায় অনাবৃষ্টি জনিত কারণে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয় যার ফলে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এর প্রভাব শহরাঞ্চলেও পড়ে। এর ফলে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে United Women's Anti-Price Rise Front গঠিত হয়। মহিলারা সংঘবদ্ধভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনে সামিল হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এই আন্দোলনে সাধারণ মানুষও যোগ দেয় এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস করার জন্য সরকারের নিকট দাবি জানায়। এই আন্দোলন গুজরাটেও ছড়িয়ে পড়ে যেখানে এটি নব-নির্মাণ আন্দোলন (Nav Nirman Movement) নামে পরিচিত

হয়। গুজরাটে এই আন্দোলনে মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি এবং কালোবাজারির বিরুদ্ধে শুরুতে ছাত্ররা মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায় যেখানে হাজার হাজার মহিলা যোগ দেয়।

১৯৭০-এর দশকে কৃষক ও উপজাতি নারীদের আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে মহিলা সংগঠনগুলির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। মহারাষ্ট্রের ভীল উপজাতির মহিলারা ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন ও স্ত্রী-অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ভারতবর্ষের উত্তরাখণ্ড অঞ্চলে বৃক্ষচ্ছেদনের বিরুদ্ধে চিপকো আন্দোলনে মহিলারা ব্যাপক সংখ্যায় অংশ নিয়েছিল। অরণ্য ধ্বংসের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের এই প্রতিবাদ একইসঙ্গে পরিবেশ ও অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথম চিপকো আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। উচ্চতর অলকানন্দ উপত্যকায় মণ্ডল গ্রামে শুরু হয়ে পরবর্তী পাঁচ বছরে উত্তরপ্রদেশের হিমালয় সংলগ্ন অনেকগুলি জেলায় এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনের আশু কারণ ছিল অলকানন্দ উপত্যকার কিছুটা বনাঞ্চল ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক কোম্পানিকে দেবার সরকারি সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তে গ্রামবাসীরা ক্রুদ্ধ হয় এবং দাসোলি গ্রামে স্বরাজ্য সংঘ নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে ঐ অঞ্চলের মহিলাগণ চণ্ডীপ্রসাদ ভাটের নেতৃত্বে অরণ্যে প্রবেশ করে এবং গাছগুলিকে ঘিরে দাঁড়ায় যাতে কোনো ব্যক্তি গাছগুলি কাটতে না পারে। আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল কোনো বহিরাগতকে বৃক্ষচ্ছেদনের কন্ট্রাক্ট বা বরাত না দেওয়া। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের পর অনেক মহিলা সমিতি পণ বিরোধী আন্দোলনে খুবই সক্রিয় ছিলেন। এর ফলে পণ নিরোধক আইনের (১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ) অনেক সংশোধনী গৃহীত হয় যদিও পণপ্রথা, পণমৃত্যু, বধূহত্যা ও গার্হস্থ্য নিগ্রহ বন্ধ করা সম্ভব হয়নি।

১৯.৪ নিম্নবর্গের নারীদের সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে গঠিত একটি কমিটি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে *Towards Equality—Report of the Committee on the Status of Women in India* নামক প্রতিবেদনটি জনসমক্ষে আনে। এই কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল, সাংবিধানিক, আইনগত এবং প্রশাসনিক যে সব শর্তাবলী নারীদের সামাজিক, শিক্ষা ও কাজের ব্যাপারে এই পর্যন্ত সরকারের পক্ষে গৃহীত হয়েছে, তার কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে তা পর্যালোচনা করা। রিপোর্টের রচয়িতারা অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত মহিলাদের সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে কোনো উন্নতি হয়নি, বরং অবনতি হয়েছে। অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্রে তাদের কাজ নিয়ে মহিলাদের অবদানকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় যান্ত্রিক পরিবর্তন আনার ফলে নিম্নবর্গের মহিলারা বেশি করে কাজ হারিয়েছে। অথচ একটা সময় ছিল যখন অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলির পেশাগুলিতে শুধু মহিলারা নিযুক্ত ছিল কিন্তু উৎপাদন আধুনিক

যন্ত্রের মাধ্যমে সংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতে সম্পন্ন হওয়ায় এই কারখানাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তাঁরা যোগ্য শ্রমিক হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে না কারণ এখানে প্রযুক্তিগত উৎপাদনের ফলে দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। প্রযুক্তি এবং যন্ত্রভিত্তিক আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমশক্তি হিসাবে তাদের উপস্থিতি মালিক পক্ষের কাম্য ছিল না। ১৯৬০-৭০-এর দশকে ভারতবর্ষে শ্রমিক, কৃষক সমস্যা এবং অত্যাচার, ছাঁটাই ছিল নিয়মিত ঘটনা। ফলে নারী শ্রমিকের সংখ্যা সংগঠিত শিল্প ক্ষেত্রে ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। আবার কৃষিতে যে সব রাজ্যে সুবজ বিপ্লব হয়েছে সেখানেও মহিলা খেতমজুরের অবস্থার অবনতি হয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে।

১৯.৫ উপসংহার

ভারতবর্ষে নারী সচেতনতা বা নারী আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছে ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে। প্রথম পর্বে নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য এগিয়ে আসেন উচ্চবিত্ত ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধিবর্গ। এই পর্যায়টি ছিল সমাজ সংস্কারমূলক। এর পর থেকে মেয়েরা নিজেরা সমাজ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের অভাব অভিযোগ উপস্থিত করে, জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে, তাদের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। নারী আন্দোলন ও নারীর আত্মশক্তি অর্জনের প্রক্রিয়া পৃথক মাত্রায় পৌঁছয় তেভাগা ও তেলেঙ্গানা আন্দোলনের এবং বামপন্থী রাজনীতির প্রভাবে।

নারী সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতের জাতীয় পর্যায়ে কয়েকটি নারী সংগঠন গড়ে ওঠে যেগুলির মধ্যে ছিল ভারতীয় নারী সংঘ, ভারতের জাতীয় মহিলা কাউন্সিল এবং ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে গড়ে উঠেছিল সর্বভারতীয় নারী সম্মেলন। এই সংগঠনগুলি মূলত মহিলাদের শিক্ষা, সামাজিক উন্নতি ও মর্যাদা বৃদ্ধি এবং ভোটাধিকার নিয়ে অধিকতর তৎপর ছিল। শহরের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মহিলাদের নিয়ে এবং তাদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সংগঠনগুলি উচ্চ ও মধ্য শ্রেণির স্বার্থের দিকে প্রথম থেকে নজর রেখেছিল। সংগঠনগুলির সদস্য চাঁদা দেওয়া নিম্নবর্গের দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সংগঠনগুলি সাংবিধানিক নিয়মকানুন মেনে আন্দোলন চালাত, নারী মুক্তির চেয়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলন তাদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছিল।

১৯৩০ ও ৪০-এর দশকে বামপন্থী সংগঠনগুলিতে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির মহিলাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আগমনের ফলে নারী সংগঠনগুলির শক্তিবৃদ্ধি ঘটে এবং এর ফলে শ্রমিক, কৃষক, আদিবাসী উপজাতি এবং গ্রাম্য মহিলারা আন্দোলনে অংশ নেয়। স্বাধীনতার পরে ভারতে কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক স্তরে বিভিন্ন নারী সংগঠনের অস্তিত্ব বজায় রয়েছে এবং উঁচু-নীচু নির্বিশেষে সমস্ত নারী সমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান এবং স্বয়ম্ভর অর্থনীতির জন্য দাবি জানিয়ে চলেছে। লিঙ্গ সমতা এবং নারী সমস্যার বিভিন্ন দিক যেমন নারী-পুরুষ বৈষম্য এবং এই বৈষম্যজনিত কারণে নারীর প্রতি অবিচার নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে নারী সংগঠনগুলি এইসব বিষয় নিয়ে তেমনভাবে সংগ্রাম গড়ে

তুলতে ব্যর্থ হলেও সত্তর থেকে নব্বই-এর দশক ধরে এইসব বিষয় নিয়ে মহিলা সংগঠনগুলির উদ্যোগ ও তৎপরতায় নানাবিধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। তবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরে ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটলেও পিতৃতন্ত্রেরও পরিবারতন্ত্রের অবসান না ঘটায় বা নারী-পুরুষ লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান না ঘটায় নারীকে শোষণ থেকে অব্যহতি দেওয়া সম্ভব হয়নি। কয়েকটি ক্ষেত্রে সরকার—প্রণীত আইন নারীদেরকে তাদের প্রতি অন্যায়-অবিচার রোধে ব্যর্থ হয়েছে। আইনগুলিকে অস্বীকার করে সমাজে অন্যায়-অবিচার হয়েই চলেছে।

১৯.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে ভারত সরকার কর্তৃক মহিলাদের জন্য প্রণীত আইনগুলির পরিচয় দিন।

২। স্বাধীনতার পর কৃষক ও উপজাতি এবং নারী শ্রমিকদের সংগঠিত আন্দোলন বর্ণনা করুন। আপনি কি মনে করেন এই অন্দোলনগুলিতে নারী সচেতনতার প্রকাশ ঘটেছিল?

৩। আপনি কি মনে করেন সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে নিম্নবর্গের নারী শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থার উন্নতি হয়েছিল?

১৯.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। Aparna Basu & Bharati Ray (ed.) — *Women's Struggle : A History of the All India Women's Conference 1927-1990.* New Delhi, 1990.

২। B. R. Nanda (ed.) — *Indian Women from Purdah to Modernity,* New Delhi, 1976.

৩। D. R. Gadgil — *Women in the Working Force in India,* Bombay, 1965.

৪। Debal Sinha Ray — *Women in Peasant Movements : Tebhaga, Naxalite and After*, New Delhi, 1992.

৫। Kiran Mishra — *Women in Tribal Community,* New Delhi, 1991.

একক ২০ ❑ পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান সম্বন্ধীয় সংকট এবং প্রান্তিক মানুষের প্রতিবাদ

গঠন

২০.০ উদ্দেশ্য
২০.১ ভূমিকা
২০.২ পরিবেশ এবং বাস্তুসংস্থান সম্বন্ধীয় সংকট
২০.৩ বিশ্ব উষ্ণায়ন ও বায়ু দূষণ জনিত সংকট
২০.৪ জীবকূল ও পরিবেশের সম্পর্কজনিত সংকট
২০.৫ প্রান্তিক মানুষের প্রতিবাদ
২০.৬ আপ্পিকো আন্দোলন
২০.৭ চিপকো আন্দোলন
২০.৮ উপসংহার
২০.৯ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী
২০.১০ গ্রন্থপঞ্জি

২০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- সমগ্র বিশ্বের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ভারত প্রতিনিয়ত পরিবেশগত এবং বাস্তুসংস্থান সম্বন্ধীয় সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে।
- ১৯৯০ এর দশকে ইতিহাসের একটি বিশেষ শাখা হিসাবে পরিবেশের ইতিহাস রচনার উদ্ভব ঘটে।
- পরিবেশ ইতিহাসের কতকগুলি মূল বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বনবাসীদের অধিকার হারানো, তাদের প্রতিরোধ এবং বন সংরক্ষণের প্রচেষ্টা।

২০.১ ভূমিকা

পরিবেশগত সমস্যা বিশ্বের একটি কঠিনতম সমস্যা। সমগ্র বিশ্বের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ভারত প্রতিনিয়ত পরিবেশগত সংকট এবং বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ আন্দোলনের প্রভাবে ১৯৯০-এর দশকে ইতিহাসের একটি বিশেষ শাখা হিসাবে পরিবেশের ইতিহাস রচনার উদ্ভব ঘটে। পরিবেশ

ইতিহাসের কতকগুলি মূল বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বনবাসীদের অধিকার হারানো, তাদের প্রতিরোধ এবং বনসংরক্ষণের প্রচেষ্টা। গ্রামের প্রান্তিক মানুষ যারা নিজেদের বাস্তব প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিজেদের অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। তাদের উদ্যোগে পরিবেশ সংরক্ষণের তাগিদে এর ধ্বংসের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রকাশ ঘটে ঔপনিবেশ-পরবর্তী যুগে।

২০.২ পরিবেশ এবং বাস্তুসংস্থান সম্বন্ধীয় সংকট

বর্তমান যুগে ঐতিহাসিক গবেষণার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরিবেশ বিষয়ক ইতিহাস। পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ আন্দোলনের প্রভাবে ১৯৯০-এর দশকে ইতিহাসের একটি বিশেষ শাখা হিসাবে পরিবেশের ইতিহাস রচনার উদ্ভব ঘটে। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে C. A. Bayly মন্তব্য করেছিলেন, 'Ecological change in India is the coming subject but no overview has appeared'. বেইলি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের পরের একশো বছর ভারতীয় উপমহাদেশে এক বিপুল পরিমাণ বৃক্ষশূন্যতার সূচনা হয়েছিল। নতুন প্রজন্মের পরিবেশ ইতিহাসবিদদের প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রামচন্দ্র গুহ-র *The Unquiet Woods : Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalaya*. হিমালয় অঞ্চলের বনসম্পদের বাণিজ্যিক গণ-শোষণের বিরুদ্ধে হিমালয়ের পাদদেশের মানুষের গণআন্দোলনের উত্থানের কথা এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় রামচন্দ্র গুহ ও মাধব গ্যাড্‌গিল এর লেখা *This Fissured Land : An Ecological History of India* গ্রন্থটি। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত Richard H. Grove-এর *Green Imperialism : Colonial Expansion, Tropical Island Edens, and the Origins of Environmentalism 1600-1860* এবং ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত Mahesh Rangarajan-এর *Fencing the Forest : Conservation and Ecological Change in India's Central Provinces 1860-1914* গ্রন্থে ঔপনিবেশিক নীতির ক্ষতিকারক পরিবেশগত ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পরিবেশ ইতিহাসের কতকগুলি মূল বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বনবাসীদের অধিকার হারানো, তাদের প্রতিরোধ এবং বনসংরক্ষণের জন্য প্রচেষ্টা।

২০.৩ বিশ্ব উষ্ণায়ন ও বায়ু দূষণ জনিত সংকট

সমগ্র বিশ্বের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ভারতবর্ষ প্রতিনিয়ত পরিবেশগত সংকট এবং বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে ভারতবর্ষে সমুদ্রোপকূলবর্তী ভূমি এবং সমুদ্রপৃষ্টের নিকটবর্তী দ্বীপসমূহের থেকে ভারতীয় হিমালয়ে হিমবাহের গলনের মধ্যে উঠানামা করে, যা ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ নদীসমূহের স্রোত ধারাকে প্রভাবিত করে। এছাড়া আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে ভারতের আবহাওয়া বিগত কয়েক দশক ধরে বর্ধিত হারে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সাইক্লোন এবং তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের ধরনের পরিবর্তন ভারতের উপর প্রভাব ফেলেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি সুন্দরবন অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের নিকটস্থ কিছু দ্বীপকে জলপ্লাবিত করার জন্য দায়ী।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের অগ্নিদগ্ধ জৈবিক উপাদান থেকে উদ্ভূত ঘন কুয়াশা ও ধোঁয়া এবং উত্তর ভারতের বৃহৎ শিল্পাঞ্চলগুলি থেকে উদ্ভূত বায়ুদূষণের দ্বারা গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল প্রভাবিত হয়। পূর্ব ভারতের তিব্বতি মালভূমির দক্ষিণ দিক ও বঙ্গোপসাগর বরাবর পশ্চিমাবায়ু জলীয় বাষ্প বহন করে আনে। ধূলো এবং কালো কার্বন যা হিমালয়ের দক্ষিণমুখী বাতাসের দ্বারা আরও উঠে যায় এবং তা তিব্বতি মালভূমির বায়ুকে উষ্ণ করে তোলে। জলীয় বাষ্প শোষণের মাধ্যমে তাপমাত্রার সামগ্রিক উষ্ণায়ন বায়ুকে উষ্ণ ও ঊর্দ্ধগামী করে তোলে যার ফলে বায়ু মণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তরের মাঝামাঝি আদ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং জলীয় বাষ্পের পুনরায় উষ্ণ হয়ে ওঠাকে ত্বরান্বিত করে।

২০.৪ জীবকূল ও পরিবেশের সম্পর্কজনিত সংকট

ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতে জাতীয়তাবাদী পণ্ডিতবর্গ, অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকবৃন্দ বা সাবঅলটার্ন গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকগণ জীবকূল ও পরিবেশের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেও ঔপনিবেশ থেকে অরণ্য সম্পদের নিষ্ক্রমণ নিয়ে কিছুই লেখেননি অথবা জীবকূল ও পরিবেশের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেননি। অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকগণ কৃষি জমির ওপর তাঁদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কীভাবে অরণ্য সম্পদের নিষ্ক্রমণ ঘটেছে তা উল্লেখ করেননি। রাজনৈতিক ইতিহাসের লেখকগণ উপজাতীয় মানুষের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেও জীবকূল ও পরিবেশের সম্পর্কের বিষয়টির উপর আলোকপাত করেননি। সাবঅলটার্ন গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকগণ উপজাতি ও কৃষকদের প্রতিবাদের বিষয়টি আলোচনা করলেও উৎপাদনের মালিকানার বিভিন্ন পদ্ধতির ওপর জীবকূলের সঙ্গে তাদের পরিবেশের সম্পর্ককে অবহেলা করেছেন।

ঔপনিবেশিক যুগের অরণ্য আধিকারিকগণ ভারতীয় অরণ্যের ওপর রচনার সূত্রপাত করেন। তাঁরা ভারতে ব্রিটিশ অরণ্য-নীতির ন্যায্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তাদের বক্তব্য ছিল ঔপনিবেশিক শাসকবৃন্দ দক্ষিণ এশিয়ার অরণ্য অঞ্চলকে দেশীয় অরণ্য ব্যবহারকারীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। প্রাক্-ঔপনিবেশিক এবং আদি ঔপনিবেশিক পর্যায়কে একটি ধ্বংসাত্মক যুগ হিসাবে দেখা হয়েছে। এদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকদের একটি বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। অপরদিকে রামচন্দ্র গুহ তাঁর গ্রন্থ ও প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদী লেখকদের যুক্তিকে খণ্ডন করে মন্তব্য করেন, উত্তরাখণ্ডের জনসাধারণ ব্রিটিশ নীতিকে মেনে নেয়নি এবং উত্তরাখণ্ড একটি প্রতিরোধের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। অরণ্য সম্পদ ছিল এই প্রতিরোধের কারণ। মাধব গ্যাডগিল মনে করেন, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত সময়কাল ছিল জনসাধারণ এবং প্রকৃতির মধ্যে একটা ভারসাম্যের যুগ। এরপর প্রত্যন্ত অরণ্যাঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসন প্রবেশ করলে এই ভারসাম্য ভেঙে পড়ে।

মালাবার অরণ্য অঞ্চলে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের পর ব্রিটিশ সরকার জাহাজ তৈরির জন্য কাঠ সংগ্রহ করতে শুরু করলে অরণ্য অঞ্চল ধ্বংস হতে শুরু হয় এবং জনসাধারণ ও প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য ভেঙে পড়তে থাকে। ১৮৪০ ও ৫০ এর দশকের পর রেলপথ বিস্তারের ফলে আরও বেশি কাঠের প্রয়োজন দেখা দেয়। ভারতীয় অরণ্য ও অরণ্য সম্পদের প্রকৃত সংকট লক্ষ্য করা যায় উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে।

২০.৫ প্রান্তিক মানুষের প্রতিবাদ

ভারতবর্ষের বাস্তুসংস্থান এবং ন্যায়নীতির উপর লেখা গ্যাডগিল এবং গুহ-র গ্রন্থে সেইসব মানুষের কথা আছে যারা নিজেদের বাস্তব প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিজেদের অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। ঔপনিবেশিক নীতি ও তার প্রভাব ঔপনিবেশ-পরবর্তী যুগে পরিবেশকর্মী, স্থানীয় জনগণ ও অন্যান্যদের এই বিস্ময়কর পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে এবং এর ফলে ভারতবর্ষে পরিবেশ সংরক্ষণের উপর ভিত্তি করে বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পরিবেশ সংক্রান্ত সক্রিয় কর্মপন্থার প্রতিফলন ঘটে। পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা এবং এর ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রকাশ ঘটে আপ্পিকো ও চিপকো আন্দোলনের মধ্যে।

২০.৬ আপ্পিকো আন্দোলন

দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক প্রদেশের উত্তর কানাড়া জেলার গ্রামীণ জনসাধারণ প্রকৃতি জমি ও অরণ্যাঞ্চল রক্ষার জন্য আপ্পিকো আন্দোলন গড়ে তোলে। কানাড়া ভাষা, 'আলিঙ্গন' শব্দটিকে বলা হয় 'আপ্পিকো'। সমগ্র দক্ষিণ ভারত জুড়ে পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আপ্পিকো আন্দোলন এক নতুন সচেতনতা সৃষ্টি করে।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ উত্তর কানাড়া জেলার ৮১ শতাংশ ছিল অরণ্য। সরকার এই অঞ্চলের উন্নয়নের প্রয়োজনে কাগজ ও প্লাইউড কারখানা এবং নদীর ওপর জলবিদ্যুৎ সংক্রান্ত অনেকগুলি বাঁধ নির্মাণ করে কিন্তু এই সমস্ত শিল্প কারখানাগুলি ব্যাপক অরণ্য ধ্বংস এবং বাঁধগুলি অরণ্য ও কৃষিক্ষেত্রকে জলপ্লাবিত করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্থানীয় জনগণ বাঁধ নির্মাণের ফলে স্থানচ্যুত হয়। এইভাবে উন্নয়নের জন্য কাগজ, প্লাইউড বা জলশক্তির বিকাশ দারিদ্রের কারণে পরিণত হয়।

আপ্পিকো আন্দোলন সমগ্র দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত হয়ে পশ্চিমঘাট অঞ্চলকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা নেয়। পশ্চিমঘাট অঞ্চলে এই প্রকার অরণ্য ধ্বংসের প্রক্রিয়া সমগ্র দক্ষিণ ভারতে সমস্যার সৃষ্টি করে। কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, কেরালা এবং তামিলনাড়ুর বারংবার খরা জনসম্পদের ঘাটতির কারণ হয়। ফলে শক্তি উৎপাদন, জল সরবরাহ এবং সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ ভারতের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পশ্চিমঘাট অঞ্চলের অরণ্য ও খনিজ সম্পদের শোষণ দরিদ্র জনগণকে তাদের নিজস্ব ভরণপোষণের উপায় থেকে বঞ্চিত করে। এই

অঞ্চলটি এতটাই সংবেদনশীল যে এখানে অরণ্য উচ্ছেদের ফলে মৃত্তিকা লাল অথবা হলুদে পরিণত হবে এবং এর পরিণতিতে এই অঞ্চল পাথুরে পার্বত্যাঞ্চলে রূপান্তরিত হবে। এই ধরনের চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে পৌঁছানোর পূর্বে তৃণমূল স্তরের বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে পশ্চিমঘাটের অবশিষ্ট অরণ্য অঞ্চলকে রক্ষা করার চেষ্টা করে আপ্পিকো আন্দোলন। গভীর অরণ্যে পদযাত্রা, লোকনৃত্য, পথনাটিকা ইত্যাদির পদ্ধতি অনুসরণ করে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। কর্ণাটকের চারটি পার্বত্য জেলায় এই আন্দোলনের প্রসার ঘটে এবং তামিলনাড়ুর পূর্বঘাট পার্বত্য অঞ্চল ও গোয়ায় এই আন্দোলন প্রসারের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

আপ্পিকো আন্দোলনের জনপ্রিয় বাণী হল 'সংরক্ষণ', 'বিকাশ' ও 'বিচক্ষণ ব্যবহার' যা কানাড়া ভাষায় 'উবসু', 'বেলেসু' এবং 'বালাসু' নামে পরিচিত। রিক্ত, রুক্ষ অঞ্চলে বনসৃজনের কাজে সহায়তা করা ছিল আপ্পিকো আন্দোলনের লক্ষ্য। ১৯৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দে সিরসি অঞ্চলের জনগণ ১.২ লক্ষ চারাগাছ রোপন করে সর্বকালের নজির সৃষ্টি করে। এই কাজে বন দপ্তর সহায়তা করে।

অরণ্যজাত সম্পদের উপর চাপ কমানোর জন্য বিকল্প শক্তির উৎস প্রচলন করার উদ্যোগ নেওয়া হয় যেটি জীব ও পরিবেশের উপাদানগুলিকে বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করা সম্ভব। এই জন্য আন্দোলনকারীগণ ঐ অঞ্চলে ২০০০ চুলা গঠন করে, যা চল্লিশ শতাংশ জ্বালানি কাঠের সাশ্রয় করে। সিরসি এবং অন্যান্য গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের চূড়া হোটেলগুলিতে বসানো হয়। এছাড়া অরণ্য সম্পদের ওপর চাপ কমানোর জন্য গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের প্রতিষ্ঠা করে। বহু সংখ্যক মানুষ এই ধরনের প্ল্যান্ট গঠন করে।

আপ্পিকো আন্দোলন গণআন্দোলনের এক গঠনমূলক পর্যায়কে উন্মোচিত করেছে যার দ্বারা নিঃশেষিত প্রাকৃতিক সম্পদের পুনর্গঠন সম্ভব। প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক অরণ্যাঞ্চলে জীবন্ত ও সবুজ বৃক্ষরাজি ধ্বংসের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাজারিকরণ এই আন্দোলনের অনেকখানি সাফল্যের উদাহরণ।

২০.৭ চিপকো আন্দোলন

চিপকো আন্দোলন হল ভারতবর্ষের উত্তরাখণ্ড অঞ্চলে ব্যবসার জন্য বৃক্ষচ্ছেদন বা অরণ্য ধ্বংস করার বিরুদ্ধে একদল গ্রামবাসীর প্রতিবাদ। এই আন্দোলনের নাম উদ্ভূত হয়েছে একটি হিন্দি শব্দ থেকে যার অর্থ আঠার মত আটকে থাকা, যেহেতু গ্রামবাসীগণ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে বা ঘিরে রেখে ঠিকাদারদের দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন। বৃক্ষচ্ছেদন প্রতিরোধের জন্য বৃক্ষকে বেষ্টন করে রাখার কৌশলের জন্য এই আন্দোলন বিশেষভাবে পরিচিত।

গ্রামবাসীদের এই প্রতিবাদ ছিল পরিবেশ এবং অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত। হিমালয়জাত ওক গাছের অরণ্য ধ্বংস করে চির, পাইন ইত্যাদির অরণ্য সৃষ্টির ফলে বড় গাছের নীচেকার লতা গুল্মের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং বন্যার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এই আন্দোলনের অর্থনৈতিক দাবিগুলির মধ্যে ছিল বহিরাগতকে বৃক্ষচ্ছেদনের বরাত না দেওয়া এবং স্থানীয় ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য স্বল্পমূল্যের উপাদানের ব্যবস্থা।

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে প্রথম চিপকো আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। আন্দোলনের আশু কারণ ছিল অলকানন্দ উপত্যকায় কিছুটা অরণ্য অঞ্চল ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক কোম্পানিকে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত গ্রামবাসীরা মেনে নিতে পারেনি কারণ পূর্বে কৃষি সরঞ্জাম প্রস্তুত করার জন্য কাঠের প্রয়োজনে তাদের একই দাবি সরকার মেনে নিতে অস্বীকার করেন। এই পরিস্থিতিতে দাসোলি গ্রামে স্বরাজ সংঘ গ্রামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে ঐ অঞ্চলের মহিলাগণ চণ্ডীপ্রসাদ ভাটের নেতৃত্বে অরণ্যে প্রবেশ করে গাছগুলিকে বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়ায় যাতে কোনো ব্যক্তি বৃক্ষগুলি কাটতে না পারে। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে চিপকো আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। উচ্চতর অলকানন্দ উপত্যকায় মণ্ডল গ্রামে শুরু হয়ে পরবর্তী পাঁচ বছরে উত্তরপ্রদেশের হিমালয় সংলগ্ন অনেকগুলি জেলায় এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

২০.৮ উপসংহার

বর্তমান বিশ্বের একটি কঠিন সমস্যা হল পরিবেশগত সমস্যা। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ব্যাপক হারে ভূমির অবক্ষয়, অরণ্য ধ্বংস, মিষ্টি জলের ঘাটতি, জল ও বায়ু দূষণ প্রকৃতির ভারসাম্য বিঘ্নিত করেছে। অনেক উদ্ভিজ ও প্রাণী প্রজাতি পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে চলেছে। শিল্প বিপ্লবের ফলে সারা বিশ্বের শিল্পায়ন বিপুল বৈষয়িক প্রাচুর্য নিয়ে এলেও ব্যাপক পরিবেশগত অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। প্রযুক্তির সঙ্গে এসেছে দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, জল দূষণ যার ফলে পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকট দেখা দিয়েছে। পরিবেশের এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ঐতিহাসিকরা পরিবেশের এই সংকটের কারণ, প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পর্কে তাঁরা অনুসন্ধান, বিচার ও বিশ্লেষণের কাজে নিজেদের যুক্ত করেছেন। ভারতবর্ষে পরিবেশের ইতিহাস বর্তমান কালের গবেষণার এক নতুন বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত পরিবেশবিদ পরিবেশ সংরক্ষণের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা এবং এর ধ্বংসের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষপাতী।

২০.৯ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। পরিবেশ এবং বাস্তুসংস্থান সম্বন্ধীয় সংকটের উপর একটি টীকা লিখুন।

২। ঔপনিবেশ-পরবর্তী যুগে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা এবং এর ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রান্তিক মানুষের প্রতিবাদ কিভাবে গড়ে উঠেছিল?

৩। টীকা লিখুন—(ক) আপ্পিকো আন্দোলন, (খ) চিপকো আন্দোলন।

২০.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১। Arun Bandopadhyay, 'Forest Land and Water in Colonial South Asia : Issues from Agrarian and Environmental History' in Ranjan Chakrabarty (ed.) *Situating Environmental History*, New Delhi, 2007.

২। Henry John Mccloskey — *Ecological Ethics and Politics*, 1983.

৩। Madhav Gadgil, Ramchandra Guha — *Ecology and Equity. The Use and Abuse of Nature in Contemporary India*, 1st edition, Routledge, 1995.

NOTES